শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দ্বাদশ সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক : সুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পঞ্চম মুদ্রণ

মুদ্রক : শ্রীসন্তোষকুমার রায়চৌধুরী
রায়চৌধুরী প্রিণ্টার্স
৩৪।এ, নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

শেষের পরিচয় ১

ছবি ২৭৩

বাল্যকালের গল্প ২৯৩

ক। বছর-পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী ২৯৫

খ। লালু ৩০৪

বিভিন্ন রচনাবলী ৩০৯

ক। রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা ৩১১

খ। রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র ... ৩১২

গ। রবীন্দ্রনাথ ৩১৩

ঘ। কবি অতুলপ্রসাদ ৩১৭

। লাহোরের অভিভাষণ ৩১৮

চ। ছাত্র সাহিত্য-সম্মিলনে বক্তৃতা ... ৩২১

ছ। জন্মদিনের ভাষণাবলী ৩২২

পত্র-সঙ্কলন ৩৪৩

গ্রন্থ-পরিচয় ৫৮৯

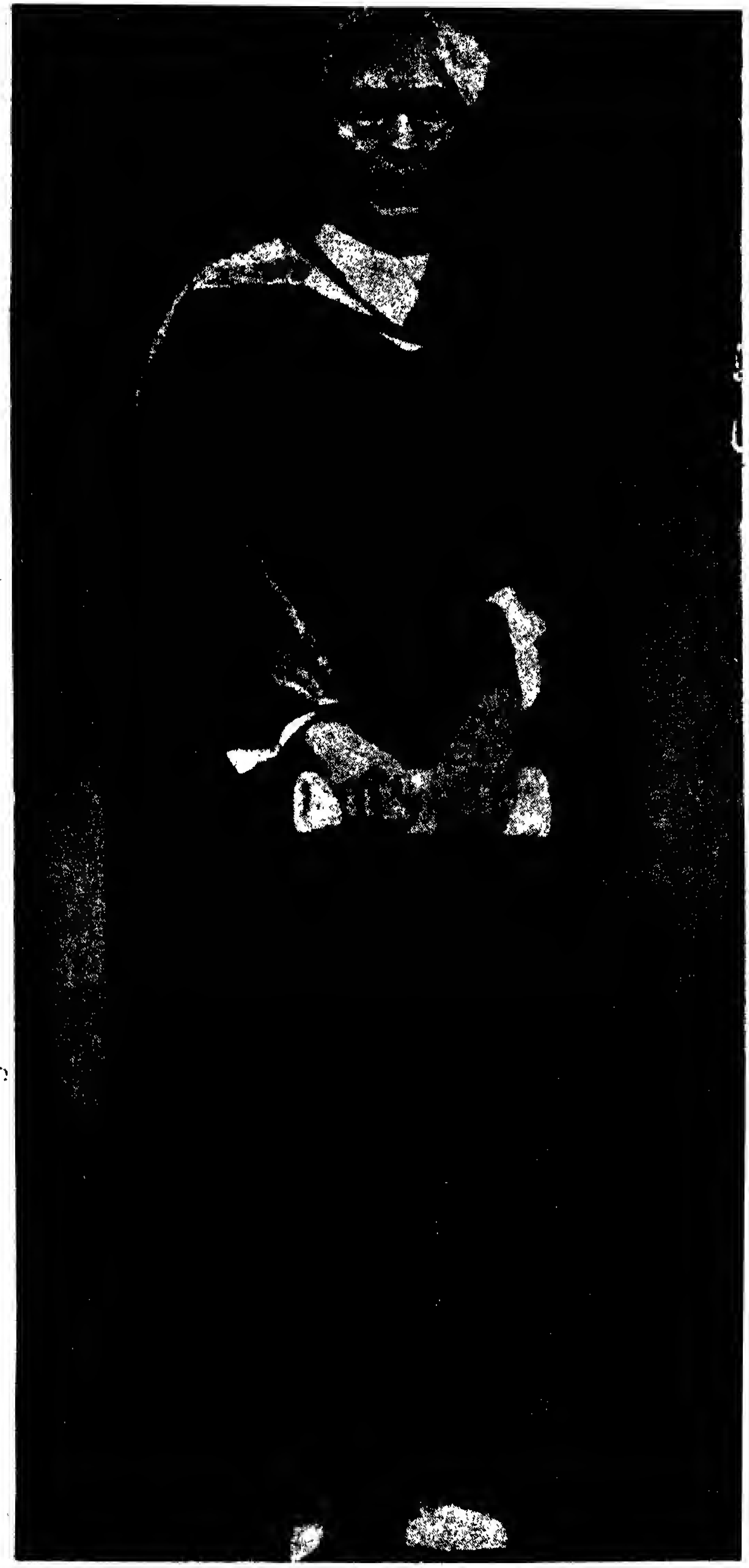

১২শ

শেষের পরিচয়

শেষের পরিচয়

১

রাখাল-রাজের নূতন বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস-তিনেকের, কিন্তু 'আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নীচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছাবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট করিতেছে—পরামর্শের জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলে নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা-মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদার্পণের: নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্ব্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলাবেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে; অর্থাৎ কি-না যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ। দাড়ি গোঁফ বার-দুই কামাইয়া বার-চারেক স্নো লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সুবিন্যস্ত গিলে করা পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নীচে সদ্য ক্রীম-মাখানো বার্নিশ-করা পাম্প, তে-পায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ বন্ধনী-সংবদ্ধ সোনার চৌকা রিস্টওয়াচ—মেয়েদের চিত্তহারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই, তখন দ্বারে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে, অথচ ওদিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্য্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপর চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে শুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্। আর না। মরুক্ গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধ ঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। যা হয়, কাল সকালে একবার তার মেসটা ঘুরিয়া আসা যাইবে—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী-মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে সে-ই শুধু বাকী। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানে না। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায় না। অধুনা পটলডাঙ্গায় তাহার বাসা। বাড়ি-আলা বলে দু'খানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতালা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। তবে হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। ঘর যাই হোক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল, চেয়ার, ভালো দুটি আলমারি—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা-পোষাকে পরিপূর্ণ। একটা দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেওয়াল ঘড়িটাও নেহাৎ কম মূল্যের নয়—এমন আরো কত কি সৌখীন ছোট-খাটো টুকি-টাকি জিনিস। একজন ঠিকা বুড়ি-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজ-সরঞ্জাম মাজিয়া-ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়, সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্ব্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকিটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকে অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকী সমস্তদিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে, সে সাহিত্যিক—রাজনীতির গণ্ডগোলে তাহাদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়—স্কুলের। তাও খুব নীচের ক্লাসের। পূর্ব্বে চাকুরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবপর তাহাও বুঝা যায় না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলে না। রাত্রে অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলো যে কি করে কাহাকেও বলে না। ইস্কুলে-কলেজে সে কি পাশ করিয়াছে কেহ জানে না, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে, সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্য্যন্ত যা-কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই। কথাবার্ত্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণচোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wire-

less পর্য্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনীর অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কন্টিনেন্টাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোনখানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর, এ-সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতই প্রকাশ করে। বুয়ার ওয়ারের সেনাপতি কে কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল, এ সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড স্টাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আসে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি, নিউটনের সহিত আইন্স্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধে না। শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কেহ-বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে, রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয় না।

বন্ধু-গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়ে না। যে সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল, এ তোমার ভারি অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কতকাল আর এমনভাবে কাটাবে—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙ্গুল দিয়া বলে, আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেন না। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটে না। যাহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামী সারে কি না যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই, রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাকে রাজি হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ-কথা রাখাল বোঝে। তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে; তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশিতে প্রলুব্ধ

হয় না। এক ধরণের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা-খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচান কাপড়টি পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরী পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো নাকি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো।

না, সে হবে না। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বোসো।

না হে না—তার জো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে পরামর্শ থাকল। কাল সকালে আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়বো! হয়তো আর কথনো—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইল না।

রাখাল ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েচি। বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নূতন ইস্কুলের হেড-মাস্টার।

প্রাইমারি?

না, হাই-ইস্কুল।

হাই-ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখেচে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোট-খাটো বাড়ি—থাকবার জন্যে অমনি দেবে!

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাসা করেচে। এ তো একশ' টাকার ওপরে গেল হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলে না?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কেউ যেতে চায়?

না, চায় না! একশো টাকায় যমের বাড়ি যেতে চায়, এ তো বর্দ্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না, পাগলামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে, দেখা যাবে কে লিখেচে, আর কি লিখেচে। এটা বুঝচো না যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—ছ্যাৎ! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। ছ্যাৎ! চললুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিথ্যে যাই হোক, রাত্রের গাড়িতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হোলো না বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিল না, কহিল, অথচ এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা হয় না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি, বড় দিনের ছুটিতে হয়তো আবার দেখা হবে। ততদিন—

তারক আঙুল হইতে একটা বহু-ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়ি টাকা ধারি—

কথাটা শেষ হইল না—এ কি তার বন্ধক না-কি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানলা দিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না, বন্ধক নয়—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবে না—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পোনর মিনিট হয়ে গেছে, এবার তোমার ছুটি নাও, পোশাক-টোষাক পরে নাও—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিশের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়ল। রাখাল বেঁটে, গোল-গাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের 'পরে একটি সহৃদয় সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায় না, কিন্তু তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রঙটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁসিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধ হয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন; কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ, রাখালের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বলচি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই-ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাশ করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েচে য়ুনিভারসিটির ছাপ-ছোপের বিবরণ। সে-সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেচি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার, কিন্তু পাশ করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বললে হয় না হে হয় না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বলচি। ছাপ-ছোপ আছে, কিন্তু পড়া-শুনা করিনি। তার সময় পেলাম কই? পড়া মুখস্থর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে—কাটলো বছর দু-তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে-পরতে পাচ্চি।

ছাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ আয়নায় দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্ত্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়তো যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু চোখেই পড়ে না। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্য্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরণে গরদের শাড়ি, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চারখানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধ-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, হঠাৎ রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহে না।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিনতে পারিনি মা।

না পারবারই তো কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙা আঁচলের পাড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ-দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলত এর খানিকটা কেটে নিয়ে প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বললেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বললেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেকে না। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্দ্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে—ইস্কুলের হেড-মাস্টারি জুটেচে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম. এ. পাশ করেচো যখন তখন মাস্টারির ভাবনা নেই, এখানে একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায় না। বলুন তো কি অন্যায়!

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যই চলে যাচ্ছেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হোলো। রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট একটুখানি রাজু, আর আমার অদৃষ্টে এসে জুটল এক উটকো বাবু? ভার সইবে না নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সকৃতজ্ঞ-চিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইল না, তাঁহার সস্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদলাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়িতে কি তুমি বড়-একটা যাও না?

যাই বই কি নতুম-মা! তবে নানা ঝঞ্ঝাটে দিন পনের-কুড়ি—

রেণুর বিয়ে—জান?

কই না! কে বললে?

হাঁ, তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল! এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন?

হওয়া অসম্ভব বলে। বরের পিতামহ পাগল হয়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু হলে ছিল ভাল। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো।

কি সর্ব্বনাশ! কর্ত্তা কি এ-সব খোঁজ করেননি?

রমণী কহিলেন, জানোই তো কর্ত্তাকে। ছেলেটি রূপবান, লেখাপড়া করেচে, তা ছাড়া ওদের অনেক টাকা। ঘটক সম্বন্ধ এনেচে, যা বলেচে তিনি বিশ্বাস

করেচেন। আর জানলেই বা কি? সমস্ত শুনেও হয়তো শেষ পর্য্যন্ত তিনি বুঝতেই পারবেন না। এতে ভয়ের কি আছে?"

রাখাল বিষণ্ণ-মুখে কহিল, তবেই তো!

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসুক কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তবেই তো মানে? বাধা দেবার চেষ্টা করবে না, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে? এতবড় ভীষণ অন্যায়?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই? আর কর্ত্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজি হবে কেন?

তারক বলিল, কেন হবে না? বরের বাড়ির মত মেয়ের বাড়িরও কি সবাই পাগল যে বললেও শুনবে না—বিয়ে দেবেই?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে! এটা ভুলচো কেন?

হলোই বা গায়ে-হলুদ? মেয়েকে তো জ্যান্তে চিতায় তুলে দেওয়া যায় না। বলিয়াই তাহার চোখে পড়িল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এঁরা কে, হয়তো কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনমতেই এ ঘটতে দেওয়া চলে না।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎ-মা তো? তাঁর আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তা হলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্ত্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে, যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারটার পর আসবো বাবা—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে রেণুর আর বিয়ে হবে না নতুন-মা। জানা-জানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিল না, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখাদেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেও না। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতে পারিল না। কিন্তু এ

জন্ত তিনি অপেক্ষাও করিলেন না, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়া গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দরওয়ানের মতো কে একজন অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

২

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না ?

না। কিন্তু তুমি ? যাচ্চো আজই বর্দ্ধমানে ?

না। তুমি কি করো দেখবো—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেট্‌লিটা একবার চড়িয়ে দিই—কি বলো ?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনিগে—কি বলো ?

রাজি।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয় না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে ?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচদিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন ; সবাই বললে, বাবুদের মেজ মেয়ে সবিতা বাপের বাড়িতে পুজো দেখতে এসেচে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তিনি পৈটের একধারে বসে কুলোয় করে তিল বাচছিলেন, সরকার বললে, মেজ-মা, ইটি বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেচে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে, এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তার চোখ ছল ছল করে এলো, বললেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই ? বললুম, মাসি আছে, কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে ? এটা

শুনেছিলুম, বললুম, পুরুতমশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি ফুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না! একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বাবা? বললুম, রাজু, ভালো নাম রাখাল-রাজ। বললেন, তুমি যাবে বাবা, আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হ'লো না, সরকার-মশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এতবড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে। ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা—মা দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চিরসুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

শুনিয়া তারকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃশ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পুজো দুই-ই শেষ হ'লো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামীগৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা স্বচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ির শুধু তো তিনি গৃহিণী ন'ন তিনিই গৃহকর্ত্রি। স্বামীর বয়স হয়েচে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেচে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন দেশে। জমি-জমা চাষ-বাসও ছিল, দু-একখানি ছোট-খাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়িতে, তখন দিনের অর্দ্ধেকটা কাটত তাঁর পুজোর ঘরে—দেব-সেবায়, পুজো-আহ্নিকে, জপ-তপে।

আমি স্কুলে ভর্ত্তি হোলাম। বই-খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাস্টার নিযুক্ত হ'লো, যেন আমি এ-বাড়িরই ছেলে—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ-কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবে না। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেমন যেন এক প্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন টিপ টিপ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তার পরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আই. এ. ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েচি, এমনি সময় হঠাৎ সমস্ত উল্টে-

পাল্টে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে-চুরতে কোথাও কিছু আর বাকী রইল না। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলি নি। আর বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কি-না জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

চাহিয়া দেখিল, তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিল না। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যিই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন-দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়তো তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্ব্বের কথা—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তার পরে থাকা না থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসত তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক সাজার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরওয়ান—আর নানারকমের কত যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্ব্বণ উপলক্ষে উপহারের তো পরিমাণ থাকতো না। তাঁর সঙ্গে ছিল এদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধ করি বা ধনের হিসেব থেকেও এ-বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ির মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগল। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, উল্টে করলেন রাগ। দূর সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হোলো তার শ্বশুরবাড়ি। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে—এই হ'লো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া, এইমাত্র তো ওঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলে, কর্ত্তার মতো সরলচিত্ত ভালো-মানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই কঠিন। আর সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে, ছিঃ!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহ-কোণে। যাদের সবচেয়ে বড় ক'রে আশ্রয় দিয়েছিলেন

একদিন নতুন-মাই নিজে—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন 'যাবে বাবা আমার কাছে ?' বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসি রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠেছিল তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপা-গলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে দেখি সুমুখের ঘরের কপাটে বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ-ছয় লণ্ঠন। বারান্দার একধারে বসে স্তব্ধ অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু—কর্ত্তার খুড়তুতো ছোট ভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁকচেন, রমণীবাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখব। বেরিয়ে আসুন বলচি।

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হোলো বাড়িতে এসে বসেচেন।

বাড়ির মেয়েরা বারান্দার আশে-পাশে দাঁড়িয়ে মনে হোলো চাকররা কাছাকাছি কোথাও যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলাম না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা আর হোলো না। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কেউ এর গায়ে হাত দিয়ো না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত হয়ে গেল। একি সত্য-সত্যই এ-বাড়ির নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়িসুদ্ধ সকলে লজ্জায় মরে গেল। যে যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্ত্তা তখন অকস্মাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইল যে? কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব!

নতুন-মা একটা কথাও বললেন না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের আজ বয়স হয়েচে তার ষোল। এই তেরো বছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক—নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেননি। এবং শুধু মেয়েই নয়, খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাই তো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেচ এমন ব্যাপার?

না শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরাজী উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেন না আর তার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপুত হইল না, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এর পরে দেশে থাকা আর চলল না। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন—সেই অবধি এইখানেই আছেন।

আর তুমি।

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসিমা তাড়াবার সুপারিশ করে বললেন, ব্রজ, সেই হতভাগীই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল, ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র বলে আমার 'পরে পিসিমা সদয় ছিলেন না।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তবে শান্তভাবেই বললেন, ওই তো তার রোগ ছিল পিসিমা। আপদ-বালাই তো আর একটি জুটোয়নি—কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসিমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরনো সে বোধ হয় আর মনে নেই। বললেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে না-কি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক্, ওর্ মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্ত্তি-কাহিনী শুনুক। নিজের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু একটুখানি হাসলেন, বললেন, ও ছেলেমানুষ; গুছিয়ে তেমন বলতে পারবে না, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসিমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা ভাল বোঝ কোরো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ-বাড়িতে পিসিমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী তো যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুণ যে কারবারের লোকসান, তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কই এমন মতি-বুদ্ধি তো নবীনের আগে হয়নি! পিসিমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এ-সব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে? হয়েচেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়িতেই কি তুমি থাকতে?

হাঁ, প্রায় বছর-দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হোল না।

তার বেশি আর বলতে চাও না।

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবে না একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথা ভাবচি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আসবেন না?

তাই তো মনে হয়। অন্ততঃ অতরাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতেই বলতেন না। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবার ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবে না।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তুমি একটা পা-ও বাড়াওনি, এ-কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? সে হবে না রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবে না তারক। আমার কথা ও-বাড়ির কেউ কানেও তুলবে না।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক মামা বিদ্যমান, ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়-কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে-মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ-মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসিমার অতবড় সুপারিশও আমাকে নড়াতে পারেনি, এঁর চোখের একটা ইসারার ধাক্কা সামলানো গেল না, পুঁটলি হাতে বিদায় নিতে হলো। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েচেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি

অতি নিরীহ মানুষ—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসৎ পেলে অবলা সবলা নির্ব্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি—বক্‌শিশের আশা করিনে—সে-সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজের কপালের দৌড় ভাল করেই জেনে রেখেচি—ওতে দুঃখ নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটে না, কিন্তু তাই বলে মল্লভূমি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সংবরণ করতে পারবো না।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েচে বলে মল্লযুদ্ধ বাধবে কেন?

রাখাল কহিল, তা হলে একটু খুলে বলতে হয়। মামামশায় আমাকে বাড়িটা ছাড়িয়েচেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেননি, কাজেই অল্প-সল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল, ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্ত্তি! সুতরাং এ-ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, এবং সম্ভবতঃ কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্ব্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার কাহিনী শোনাতেই হবে, এবং তার পরে ঘটনাটা মুখে মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবে না, এবং তাঁর অবশ্যম্ভাবী ফল ও মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবে না।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্য্যন্ত এমনই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ তো আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন?

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলো না একবার যাই, বাপটা একেবারেই মরেচে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকী আছে, দেখে আসি গে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা-বশে ভাঙচি দিতে এসেচো। তাতে কার্য্যসিদ্ধি তো হবেই না বরঞ্চ উল্টো ফল দাঁড়াবে।

তাই তো! তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশী খবর নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমায় সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখে আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষের হয়তো দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল।

রাখাল কহিল, বেশ ফর্সা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি তো বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গয়নায় প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রু-বর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়—ভালো বললেও অপরাধ হয় না। অল্প-সল্প ক্ষুদ্রতা, ছোট-খাটো উদারতা, একটু-আধটু—

তারক বাধা দিল—থামো থামো। এ-সব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বোলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই, দুটোই। শুধু তাৎপর্য্য-গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচিসাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতাম না। বরঞ্চ ভাবতাম যে—

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবো না।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাও তো শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুস্কিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ-বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এমনি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকে না। না তাঁদের বাইরের চেহারা, না অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এসেই সব চেহারা, লেপে-মুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যর প্রভেদ ঠাউরে পাইনে!

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয়-প্রতিবেশীর ঘরের

দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিওনে, জানিওনে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের এই তো জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড সহরের কত নূতন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা কোরো না তারক, আমি হদিশ বাৎলে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা করচো কিংবা মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো, তাঁদেরকেই সহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস-দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেইসঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্! ইংরেজী জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বলতে হয় না, গোটা-কুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে তো? তা হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল—তার পরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক্। এখন বুঝতে পারচি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটির যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, তোমার কিছুই যায় আসে না। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্ব্বিচারে মেলা-মেশাটা একটু কম করো—যা হারিয়েচো তা হয়তো একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এইজন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গিটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হোলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটার হয়তো কিছু সত্য আছে,—ওদের অনেকের অনেক-কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশী। এখন থেকে তোমার কথা শুনবো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বুই। তার মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকী রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায় না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্দ্ধমান যেতে পারচো না, সে তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলেঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহ্বরে, তার হেতু আমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ওঁর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিলে তারক, অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশী জানি, এটুকু দাবী করলে রাগ কোরো না রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই—এ থাক্। কিন্তু, তোমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা এর নাগাল পাবো না রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে

১২শ—২

বাকী ন'শ নিরানব্বুইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি, তাতেই আমাদের মতো সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিল না—জবাব দিল না। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে, যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বলবে?

মোটের উপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা!

অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবে না। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।

৩

পরদিন অপরাহ্নের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের জল তৈরী হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস করে মা-দুর্গাকে তুমি খামোকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হোলো—নইলে হতো না।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ি ছিলেন না, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে, সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং

ফিরিবার সময়ে অন্যের চোখের অন্তরালে রেণুও আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্মের অনুযোগ জানাইয়াছিল।

তোমার বাবাকে বলতে ভুলো না যে, আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

আচ্ছা। কিন্তু চাকরদের বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ-কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো একটুকরো কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হলো না, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো—ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে; কিন্তু এখনো তার মিনিট-কুড়ি বাকী। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েচে ঢালো। তাঁর আসবার আগে এ-সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেন না?

দেখো রাখাল, তর্ক কোরো না। মানুষে মানুষের অনেক কিছু জানে, তবু তার কাছেই অনেক কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া এ-গুলোই বা কি? এই বলিয়া সে অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ করে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই তারক, অপরাধী যে কে তিনি বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে বুঝাতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিল না, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট-দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শ নিরানব্বুইয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখচি ভাই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা-খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশ

করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই ; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার অবসর পাইল না।

রাজু, আসতে পারি বাবা ?

উভয়ে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সে-ও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সবদিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল ; কাকাবাবু বাড়ি নেই, মামাবাবু গুরুভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল ; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েচে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রাপণ্ড।

তারক ঘটনাটি খুলিয়া বলিল।

নতুন-মা হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করে না ?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম, আজ বোধ হয় কিছু হবে না।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন ; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হলো না ?

রাখাল কহিল, তা হয়েচে মা। বাড়ির গিন্নী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেচি কি না। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশ করলে, অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে বলতে ভুলুক, সে ভুলবে না।

তোমরা আজ আবার যাবে ?

হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে ?

তা আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েচে রাজু ?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের

স্বরে কহিল, প্রশ্নটা শুধু বাহুল্য নয় মা—হোলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রঙটা বোধহয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁসে গেছে—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলে না। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছল ছল করিয়া আসিল; দেওয়ালের ঘড়ির দিকে একমুহূর্ত্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না, এখনো ঘটা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই-একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গলময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিল না; কিন্তু এই যে রাখাল বর্ণনা করিল না, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ-দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিতে চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁত নাই তা নয়, সুমুখের দাঁত-দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত পায়ের গড়ন ননী-মাখনের সহিত কোনমতেই তুলনা করা চলে না। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব; কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধরে না? কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্য্যাদার এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। আর সবচেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্য্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক ভাঙিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা, এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে-কথা তো বলা যায় না মা!

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই করেচেন।

কর্ত্তা তবে কি করেন?

যা চিরদিন করতেন—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পান না। ঠাকুর-ঘর হতে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয়-আশয়, কারবার, ঘর-সংসার দেখে কে?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী! কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বোধ হয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি রাজুবাবুর ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজচি। এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো? বাঃ—এই তো হে। রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ-হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলুম বুঝি খুঁজেই পাবো না। বাঃ—দিব্যি ঘরটি তো!

হঠাৎ শেল্‌ফের ঈষৎ অন্তরালবর্ত্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হাঁটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিল না, তথাপি অজানা ভয়ে সে-ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্য্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তোমরা করছিলে কি? ষড়যন্ত্র? গুলির আড্ডায় কনেস্টবল ঢুকে পড়লেও ত তাঁরা এতো আঁৎকে ওঠেন না। হয়েছে কি? নতুন-বৌ তো?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বোসো, বোসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধহয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবে না, ভেঙে তচনচ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গিতে শুধু কেবল তারক ও রাখাল নয়, নতুন-মা পর্য্যন্ত মুখ

ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজবাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকো না নতুন-বৌ, বোসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখা-পড়া করেচে—আমাদের জানা ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা সহরেই খান-চারেক বাড়ি আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয় তো সকল দিকেই ভালো হোলো।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমাকে জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিল না নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়াজাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজাকে তো আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায় না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে-কর্ম্মাবেই বা কে। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো, কিন্তু দেখা হয়নি—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখন স্থির করলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবে না—যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুরবেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু'কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হোলো।

স্পষ্ট বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার-বিবাহ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্ব্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো তো?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়তো—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়া মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কি-না।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই; লোভটা সে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেননি নিশ্চয়?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কই না! অভ্যাস-মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়তো তাঁকেই ডেকে থাকব।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েচে, ও-নামটা করলে শুধু হাতে ফিরতে হোতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কল্যকার ঘটনা বিবৃতি করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য্য পণ্ড হয়। কালকে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়তো এ-রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্ব্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাম্ভীর্য্যে মুখখানা অতিশয় ভারি করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখাল-রাজ, হয়—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানে না। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু-মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল, রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে?

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোনো। ব্রজবিহারী বলে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। ভুগতামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুমা সাবধান করে বলতেন—

বলাই, কলাই খেয়ো না—
জানলা ভেঙে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না।

ভেবে দেখ দেখি, ছেলেবেলায় ফুট-কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্ব্বনাশ হোলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের, তেমনি নামেরও আছে বৈকি।

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ ফিরিয়া চাপা ভৎ র্সনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সামনে এ তুমি করচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্ছি। প্রাণ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বৌ, চিরদিন কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না। ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে—তা হোলো উল্টো।

নতুন-মা হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে—এবার তুমি থামো,—রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল।

নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে-জন্য কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য-কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারে না?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বললে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বললে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন?

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্যি!

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্ব্বাদ; গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাব কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্ত্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনবে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে—কেউ আমার তাই কথা শোনে না! তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি করে বলো দিকি।

হয়ত বিগত-দিনের কি একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন

ছিল, সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানে না। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেন না, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানে না, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল। অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেন না।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানে না, তাকে বুঝিয়েই বলো না মেজকর্ত্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই; তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেচে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠেকান যায় না এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের 'পরে ক্রোধ, করুণা না তাচ্ছিল্য, কিসের ছায়া যে দেখা দিল নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, যে অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল, যে নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামীগৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসের মুক্তাস্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, একমুহূর্ত্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পান খাননি? আমার মনে ছিল না মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—পান? পানের দরকার নেই বাবা।

নেই বই কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবচেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পান-আলার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো তো তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে নিয়ে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্য্যালোককে বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনির্ম্মুক্ত রবিকরে ঝাপ্সা কিছুই আর রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত, ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে, এই নিভৃত নির্জ্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্ব্বের হাস্য-

পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ-কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাকুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি!

পান আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়তো তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময় কথা কহিলেন নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্ত্তা, আমাকে তুমি মার্জ্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জ্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জ্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্ত্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয় না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জ্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছে মেজকর্ত্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো তো নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জ্জনা চেয়ো না নতুন-বৌ, সে আমি পারবো না। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবে না। তবু পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হলে আর আমি দুঃখ করবো না। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নির্ব্বোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায় না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করে না, তার দুর্দ্দশা এমন হবে না তো হবে কার! কিন্তু দুর্দ্দশা হয়েচে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মেনে নিতে হবে নতুন-বৌ? বলতে হবে, যা করেচি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েচে, আমাকে ঠকিয়েচে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, কর্ম্মচারী—ঠকিয়েচে অনেকেই। কিন্তু সব যখন যেতে বসেছিল, সেই দুর্দ্দিনে তোমাকে বিবাহ করে আমিই তো ঘরে আনি! তুমি এসে

একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো—এই তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনে বলে আমি হলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত করে, বাইরের লোক জড়ো করে, তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ির বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোংরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হোলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বল ত নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল বোধ হয় তাহা নিজেই জানিত না, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড়—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাকে কে কবে করেচে? এমন করে মঙ্গল কে কবে চেয়েচে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতেই জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েচি, বল তো সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি তো কখনো কিছু করো না—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়তো আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্ত্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বল? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না মেজকর্ত্তা, আমি তোমাকে চিঠি লিখবো না, মুখেও বলবো না।

তবে জানবো কি করে?

জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু এ যে হেয়ালি হলো।

তা হোক। আজ আশীর্ব্বাদ কর, এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, এক ডিবা পান সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরী করিয়ে এসেচি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েচি নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে করে দিলেও মুখে দিতে পারবো না।

সুতরাং পানের ডিবা তেমনিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেন না।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে-কারণেই হোক, সে দীর্ঘক্ষণ অনুপস্থিত থাকিতে চাহে না। তাহার অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভটচায্যি-মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময়ে দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দু'টি ছেলে-মেয়েও হয়েচে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পূজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল, সুদে-আসলে সেটা হাজার-পঞ্চাশ হয়েচে। কি করবে সেটা? তুলে তোমায় পাঠিয়ে দেব?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুক না।

না নতুন-বৌ, সাহস হয় না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে—থাকলেই হয়তো টান ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবে না।

ব্রজবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও ত বুড়ো হলাম গো, আর খাটবো কত কাল? ভাবচি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুর-ঘর থেকে বার হবে না, এই তো? না, সে হবে না।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধহয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখ নতুন-বৌ, সোনারপুরের কতকটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে কর?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাও না।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড়মেয়ে জয়-দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি

মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, এরা ভাগ্‌নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বল?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনারপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মত ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবে না।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ নতুন-বৌ, তোমার গহনাগুলো কি সিন্দুকেই পচবে? কেবল তৈরীই করালে, কখনো পরলে না। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তার পরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক্‌ থাক্‌, নতুন-বৌ, তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সান্ধ্য-আহ্নিক, গোবিন্দের সেবা—এইসকল নিত্যকর্ত্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলে না তাহা রাখাল জানিত। সে-ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়-কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ নতুন-বৌ তাহা জানিতেন না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হোল না মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাও না তখন ও-বাড়িতে হবে না।

নতুন বৌ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবে না। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড় ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারো না? এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবে না।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির কি মেজকর্ত্তা?

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয় না নতুন-বৌ। নির্দ্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে—দেশাচার অমান্য করতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিও! তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বই কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানো তো রাজু। সহজে ছাড়বে না।

রাখাল খুব জানিত—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন।

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু 'না' বলিলেন বটে, কিন্তু গলায় জোর নাই তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এবং যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা সহরে সুপাত্রের অভাব হবে না, কিন্তু সে কটা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্ব্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত, পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবে না। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্ত্তা?

ব্রজবাবু বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল। বলিল, এ হোল সহজ যুক্তি ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক-কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেচে, নইলে জুটতো না—ও নিশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অনুমতি দিচ্ছি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটে না, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্য্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্ত্তার?

হ্যাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পোনর-ষোলদিন কাকাবাবু উঠতে পারেননি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—তার পরেও ও-বাড়িতে আছে? খাচ্চে পরচে?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্য্যন্ত এনেছেন—কাকাবাবুর শাশুড়ী। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন।

শেকড় গেড়ে বসেচে মা, নড়ায় সাধ্য কার? আমাকে একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলো না, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন! নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ির কর্ত্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। দাবানলের মধ্যে এই শান্ত নিরীহ মানুষটাকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতেই ভয় ঘোচে না। অথচ পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে কূল-কিনারা পায় না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেন না, শুধু সম্মুখের টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছট-ফট করিয়া উঠিল। সংসারে এত বড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্ব্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ পাষাণ-মূর্ত্তি—কি কথা সে ভাবিতেছে।

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত—বাহির হইতে রুদ্ধ-দ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কপাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শীগ্‌গির চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন!

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্য্যতার সীমা রহিল না। ব্রজবাবু লজ্জায় আর এক-দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহে না, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল, উঠে পড়ুন মা, শীগগির চলুন। গাড়ি এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন?

চলুন না মা, পথেই বলবো।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চললাম মেজকর্ত্তা।

চললে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে, জোর করে রাগ করে, বলবো, এখন যাবার সময় নেই, তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো তো মেজকর্ত্তা, দেখো তো তাকে আজ চেনা যায় কি-না।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বৌ বলিলেন, মার্জ্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি—উপেক্ষা করে বললে, এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে, অভিমান হয়। কিন্তু আর যে যাই বলুক মেজকর্ত্তা, অমন কথা, তুমি কখনো আমাকে বোলো না। বলবে না বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহু দিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল—তখন রেণুর জন্মের পর নতুন-বৌ পীড়িত। কি-একটা জরুরী কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল—ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ফেলে রেখে পালাবে না বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিল না কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর মর হয়েচে তাই এসেছি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেল রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আটদিন খোঁজ নেই। শুনেচি অফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন। তোমার বাড়ি, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা, বৌটা হয়তো আর বাঁচবে না।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবে না বাবা, এসো। যাবার পূর্ব্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল।

৪

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখাল-রাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তেরো বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বিস্তর, কিন্তু তাহাকে না-চিনিবারও হেতু নাই, অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, হয়তো তিনি দোকানে যান নাই, হয়ত ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো বাড়িতে না থাকার অপরাধে তাহার সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন—তখন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন তো তাহা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনাক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নেমে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন—কেন বাবা; কোথাও কি জরুরী কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই, কিন্তু আমি বলি আজ থাক।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচান যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্যদিন তো হবে না।

বলা কঠিন। রাখাল সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন—ওঃ, তাই বটে। কিন্তু কে-একটা লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে? তা ছাড়া, শুনলে তো তিনি বাড়ি নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়তো দু-তিনদিন আর এ-মুখো হবেন না।

রাখাল আশ্বস্ত হইল না। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিল না, প্রতিবাদও করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া দ্বারে পৌছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। একজন প্রৌঢ়-গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন, দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গনিল।

তাঁহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে? শুনেচো তো জীবনের স্ত্রী কি সর্ব্বনাশ—

কথাটা সম্পূর্ণ হইল না, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন।

নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিনতে পারলে না?

তিনি একমুহূর্ত্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ, রাজু। আমাদের রাখাল! বেশ, চিনতে পারবো না? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্ব্বেকার প্রথা-মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ করলে মেয়েটা! পুলিশে এবার বাড়িসুদ্ধ সবাইকে হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখো না। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে!

রাখাল কহিল, একে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন নি কেন?

হাসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে আত্মহত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে তো জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেললেই তো হবে না। একটা পরামর্শ করা তো দরকার? পুলিশের ব্যাপার কি না?

নতুন-মা বলিলেন, তাহলে চলো; কোন ভালো এটর্নির অফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক্।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন—তামাসা করলেই তো হয় না নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতো না।

এ-সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয়, তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেন না, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো তো বাবা, দেখিগে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বোসো গে সেজোবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা পারি করি গে, কেবল এইটি কো'রো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলো না।

নীচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দুখানি করিয়া ঘর, বারান্দায় একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক-সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র কেরানী, ভাড়ার হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ-বাটীতে নাই—সকলেই প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করিয়া আছেন। শুধু জীবন চক্রবর্ত্তী ছিল নূতন, এ-বাড়িতে বোধ করি বছর-দুয়েকের বেশী নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বৌটির নিজের ছেলে-পুলে ছিল না বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়ের ভার ছিল তার 'পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা—এ-সব সে-ই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনের বৌকে—কারণ, সে ছিল 'ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুড়েমী ভাল নয়; বৌটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটেদের সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত! সে যাই হোক, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালবাসিত, সবাই স্নেহ করিত; কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সে-ও যে আজ সাত-আটদিন নিরুদ্দেশ এ-খবর ইহাদের কানে পৌঁছিল শুধু আজ—সে যখন মরিতে বসিয়াছে; কিন্তু কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে না—জীবনের বৌ যে আফিং খাইতে পারে এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিল না। বোধ করি পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি! দেওয়ালের কাছে দুখানি ছোট জল-চৌকি, একটির উপরে দুইখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্প মূল্যের একখানি তক্তাপোশের উপর জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বৌটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাওনি কেন। হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি করে বলো মা, কতটুকু আফিম খেয়েচো? কখন খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রী-লোকটি বলিল, পয়সা তো বেশী ছিল না মা, বোধ হয় সামান্য একটুখানিই খেয়েচে—আর খেয়েচে বোধ হয় বিকেলবেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ি দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধ হয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি গাড়ি ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বৌটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এভাবে মরে লাভ কি বলুন তো? আর আত্মহত্যার মতো পাপ নেই তা কি কখনো শোনেননি? যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল, বাড়িতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্যে ভাবনা নেই—একজনের জায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না নতুন-মা। আর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকে বাঁচানো যাবে, এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি।

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ি আমার দাঁড়িয়েই আছে, তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে রাজি হইল। নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্দ্ধসচেতন এই অপরিচিতা বধূটিকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথযাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক দেখিয়াছে। নানা বয়সের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—খ্যাংরা কাঠির ন্যায়, ঢ্যাঙা, বেঁটে—কালো, সাদা, হলদে, পাঁশুটে—চুল-বালা, চুল-ওঠা, পাশ-করা, ফেল-করা—গোল ও লম্বা মুখের—এমন কত। আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা তাহার পর্য্যাপ্তেরও অধিক। এদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্‌লে-পণা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এক কোণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথমে ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তের বৎসর পূর্ব্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে, নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোক জানেই না। আজ গাড়ির মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজসজ্জা আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্দ্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের 'পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চক্ষে মনে হইল, মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে স্বর্গের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা দেহের

অক্ষুণ্ণ সুষমায়, না অন্তরের নীরব মহিমায়, রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল না। হাসপাতালে সে তার যথাসাধ্য—সাধ্যের অধিক করিবে সঙ্কল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখ-সাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা, দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন, কত মহার্ঘ প্রসাধন—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষায় কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বরাবর চোখে দেখিয়াছে।

আর সমাজের আর একপ্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুন্ঠিতশ্রী, এই অদৃষ্টপূর্ব্ব মাধুর্য্য ইহাও কি অহঙ্কৃত আত্মম্ভরিতায় তাহারা উপবাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল, কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগ্য কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কি জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্ব্বাক্ মেয়েটি আজ ধৈর্য্য হারাইয়াছে, তথাপি সে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই, ভিক্ষাপাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুঁজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়তো সে-শক্তি আর নাই—সে-শক্তি নিঃশেষিত—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ-সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল হাসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। স্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনি যেতে পারবো, বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের 'পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল!

* * * *

এখানে বৌটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ-সকল বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হোলো, এখন বাড়ি চলুন?

মেয়েটি শান্ত কালো চোখ মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার

নাম হোলো মিসেস্ চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবো না! অথচ মুস্কিল এই যে, কিছু একটা বলে ডাকাও তো চাই?

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই তো। আমি বয়সে কত বড়। তা হলে যাবার প্রস্তাবটা আমার এইভাবে করতে হয়—সারদা, এবার তুমি বাড়ি চলো।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? নাম তো করা চলে না।

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল—রাখাল-রাজ। তাই ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাকতেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও একই কথা। আর গুরুজনেরা যা বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেব্‌তা। আমিও আপনাকে দেব্‌তা বলে ডাকবো।

ইঃ! বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কানা-কড়ির নেই সারদা!

নাই থাক্। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল আনাই আছে। আর ব্রাহ্মণের ভালো-মন্দর আমরা বিচার করিনে। করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরণটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। সারদা কোন পল্লীগ্রামের কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জ্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিল না। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামের শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহা প্রচলিত আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন ঠেকিল। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে তো সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ি চলো? এরা আর তোমাকে এখানে রাখবে না।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ি চলো!

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ি ভাড়া দেবো কি করে? তিন-চারমাসের বাকী পড়ে আছে, আমরা তাও তো দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাবনা নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

না থাকবার কারণ, বাড়ি-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায়

বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কিংবা হয়তো এসেছেন, আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

না, তিনি আসেননি।

না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেন না।

আসবেন না? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন—এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

না।

না? তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিল না। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে হয় তোমার শশুরবাড়ি, নয় তোমার বাপের বাড়িতে চলো। পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

রাখাল একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ি।

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে কি বাপের বাড়ি যেতে চাও?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল—এ তো বড় মুস্কিল! এখানকার বাসাতেও যাবে না, শ্বশুরবাড়িতেও যাবে না, বাপের ঘরেও যেতে চাও না—কিন্তু চিরকাল হাসপাতালে থাকবার তো ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে তো?

প্রশ্নটা শেষ করিয়া সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় তো কিছু বলিনি।

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে—আমাকে মরতেও কেউ দিলে না।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল—এ অভিযোগটা যে তাহাকেই। তথাপি কণ্ঠস্বর পূর্ব্বের মতই সংযত রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারে না। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আর ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক

সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ি ডেকে এনে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আরও তো অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কি না বুঝা গেল না, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবো না দেব্‌তা।

না পারো দিয়ো না।

আপনি কি মাকে বলে দেবেন?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমি একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলে জানো? যা প্রয়োজন, যা চাইলাম—সমস্ত। তারপর হাতে ধরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলেন—অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, বিদ্যে দান করে আমাকে এত বড় করলেন। আজ তাঁর কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জ্জি পেশ করতে? না, তা করব না। যা করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ করতে হবে না।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো তো এ-বাড়িতে দেখিনি?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ-বাড়িতে এসেছো?

প্রায় দু'বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোক চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ যোগাড় হতে পারে না?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার উপর উপদ্রব ঘটতে পারে; তোমাদের ঘরের ভাড়া কত?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ'টাকা, কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ি-আলাদের তো এ স্বভাব নয়।

সারদা বলিল, জানিনে। বোধ হয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলচি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চল। আচ্ছা তোমার খেতে-পরতে মাসে কত লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়া কহিল, বোধ হয় আরও তিন-চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধ হয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবে না। আচ্ছা, তুমি কি বাঙলা লেখা-পড়া জানো না?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশী হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে

আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো ; কিন্তু যত্ন করে লিখতে হবে, বেশ স্পষ্ট নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো ?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য্য রূপের যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য্য মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই এবার গাড়ি ডেকে আনিগে !

মেয়েটি বলিল, হাঁ আসুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধ হয় এইজন্যেই আমি যেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ি আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল, সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। একদিকে এই কটি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই মনে পড়িল না।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল নতুন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ি নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে, বাড়ির মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ি পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে ?

দাসী কহিল, কেউ না। দরওয়ানজিকে দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর রমণীবাবু।

দাসী কহিল, আমাদের বাবু ? তিনি তো রোজ আসেন না। এলেও রাত্রি নটা-দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেন না তার মানে ? না এলে থাকেন কোথায় ?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর বাড়ি-ঘর-দোর নেই নাকি ?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভীড়। আর শিশুর দল, যাহারা তখনও পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই, তাহাদের আনন্দ-কলরবে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল—যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি ?

সারদা কহিল, না !

আশ্চর্য্য !

না, আশ্চর্য্য এমন আর কি।

বলো কি সারদা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য্য আর কিছু আছে নাকি ?

সারদা ইহার জবাব দিল না। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি, আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসি গে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ি নেই।

সারদা কহিল, নেই ? কোথাও গেছেন বোধ করি। হয় কালীঘাটে, নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখুনি ফিরবেন। আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকী নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথাটা অভাবনীয় নয়, অবাক্ হইবার মতোও নয়—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প-শিক্ষিতাই হোক, তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্ত স্বাভাবিক; কিন্তু কথাটির জন্য ত নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল, এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা, আলো জ্বালো; কিন্তু আজ আমার কাজ আছে—কাল-পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্তপোষে বসিল, পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই তো ? প্রথমে হয়তো খারাপ হবে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই শিখে নেবো। দেখবেন আমার হাতের লেখা ? আনবো কালি-কলম ? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল—না না, এখন থাক্। আমি জানি তোমার হাতের লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়িতে কে কে আছে দেব্‌তা ?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ি নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

তাঁদের আনেন না কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে; ইহারও উত্তরে বলিল, সহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ-কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়তো তাহারও কোন পল্লী অঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়।

রাখাল বলিল, ঝি আছে!

রাঁধে কে? বামুনঠাকুর?

রাখাল সহাস্যে কহিল, তবেই হয়েচে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্যে একটা গোটা বামুনঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হোল।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

হাঁ, ঠিক তাই।

সে আর কি কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোন-কিছু ভাবতে হয় না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো ত? ঘরে জিনিস-পত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নেমন্তন্ন; কিন্তু আপনাকে গিয়ে রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবে না। যে করবার সে করে রেখেছে।

আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙে পড়ে না।

কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না, হতেও তো পারে—তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলেও ভাবনা নাই। আমার বাসার কাছে ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালবাসে, কষ্ট পেতে দেয় না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালবাসেন—

কে তোমাকে বললে?

আপনি নিজেই সেদিন হাসপাতালে বলেছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি, তৈরী করে আনবো? একটুখানি বসবেন?

কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল, রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয় না।

তবে কিছু খাবার আনিয়ে দিই—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খাননি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েচে।

কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার তো লোক নেই।

আছে। হারু আমার খুব কথা শোনে, তাঁকে বললেই ছুটে যাবে। বলিয়াই সে আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও রাখাল বারণ করিল।

সারদা জিদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার বিষণ্ন মুখের পানে চাহিয়া রাখালের সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতার ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেকদিন হইল ভুলিয়া আছে। তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন—একখানি খোড়ো ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়ে ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙা-পাড়ের কাপড়-পরা কে যেন রন্ধন করিতেছেন—হয়তো ইহার সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমনধারা করিয়া উঠিতে সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে করো না সারদা, আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, জল-খাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

এর মধ্যে একদিন দিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে ইতস্ততঃ করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়তো আমার ঢের ভুল হবে। আপনি কিন্তু রাগ করবেন না। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না সারদা, আমি রাগ করবো না। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়িতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না।

সে গরীব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই সহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপন-জন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিল না, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল—তার বেশি নয়। ছেলে টেলে পড়ায়, মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণ-লিপি ডাক-যোগে অনেক আসে। প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে নাম তার বাদ যায় না, এবং না গেলে সেদিন না হৌক, দু'দিন পরেও এ-কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়িতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ; জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাপ্লুত পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পরিতোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো হয়তো চাকুরির নিষ্ফল উমেদারীর দিনগুলো মাঝে মাঝে মনে পড়িত, কিন্তু সে এমনই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, আলাপ-আলোচনা, পড়া-শুনা, হাসি-কান্না এমন কত কি! ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়-কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ।

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায় —মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেব্‌তা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়তো সত্যই তাই। কিংবা—? হঠাৎ তাহার ভারি হাসি পাইল। নিজের মনেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

৫

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। এক খানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন, রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল এবং সংবাদটা নতুন-বৌকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবার বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিতভাবে মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্ত্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ যাহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাইপোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, সুতরাং বরকর্ত্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের কামাইয়ের জন্য তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই, ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সে যাই হোক্, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহ ব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। 'এখন স্থগিত' থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হলেও, পাগল বরের সহিত বিবাহটা চুকিয়া যে যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল! দ্বিতীয় দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীনদিনের স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন যে-সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া ঐ শান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিলেন তাহা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতেই এ বিয়ে বন্ধ করা যেত না।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমান সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতো না।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেন না, বলিলেন, যাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাকবো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুনবো।

আরও একটা কাজ হবে বাবা—আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ যথোচিত মর্য্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোষে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেব্‌তা, এতে আপনার কাজ চলবে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশী হইয়া বারবার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভাল সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখা-পড়া শেখ, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। হয়তো তুমিই কত লোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্চি, ফিরতে বোধ হয় দশ-বারো দিন দেরি হবে—এসে তোমার লেখা এনে দেবো—কি বলো? কিছু ভেবো না—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিল না দেব্‌তা—সে-ই এখনও খরচ হয়নি।

তা হোক্, তা হোক্—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয়, কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোরো না যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব-বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্ত্তা, গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ পক্ষের তুমিই কর্ত্তা, টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি, জিনিসপত্র, সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁসিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হবে না। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার এক-ঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখানে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজি করানো কঠিন হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাস্টারি

লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইল না। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবে না এমন হইতেই পারে না। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকী, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, না হয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে সৌখিন মানুষ, এ-কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যাবার পূর্ব্বে সে সকল ঠিক করিয়া ফেলা চাই। সাহেববাড়ি হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্ত্তার উপযুক্ত মর্য্যাদার জামা-কাপড় আলমারিতে কি কি আছে দেখা দরকার, না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরী করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারকতো নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেক দিনের সখ, কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন নাই। অফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন-দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিব-গৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোট-খাটো ভুল-চুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শনিবারের বিকেলটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়তো কিছুই করা যাইবে না। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোস্টাফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল, কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে তারকের কড়া নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতিক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোস্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশী তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা-কাপড় নাই, তা হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুস্কিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবে না। পোস্টাফিস হইতে একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল। লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল, সে বর্দ্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেডমাস্টারির খবর দিয়াছে এবং

আসিবার পূর্ব্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে, অনতিকাল মধ্যেই দিন-কয়েক ছুটি-লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধে স্বয়ং গিয়া ক্ষমা-ভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিশ্বাস ফেলিল, যাক্ ট্যাক্সি-ভাড়াটা বাঁচল।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন-দশেক দেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা ?

হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

ফিরতে দিন-আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয় ?

হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজলো রাজু ?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়তো বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক্ বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার তো আর কিছু নেই মা! তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই তো নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েচেন যে। আমি কেবলই ভাবি ঐ নিরীহ শান্ত মানুষ না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেচেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেচেন; কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে তো এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন; কিন্তু ঐ দুর্ব্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা কত-রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে ?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্ব্বল লোক বলে মনে হয় মা ?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্ব্বল-প্রকৃতির উনি তো চিরদিনই রাজু! তাতে আর সন্দেহ কি!

রাখাল বলিল, দুর্ব্বল লোক কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা ? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিইনি, শুনেচো নতুন-বৌ ?

হাঁ, শুনেচি। বোধ হয় খুব গোলমাল হোলো ?

সে তো হবেই নতুন-বৌ।

তুমি নির্ব্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি করে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায় না, এ-কথা সত্যি! কিন্তু তোমার মেয়ে, অথচ তোমারই বাধা দেবার হাত নেই, কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকে তা বইতে হোলো। সেইদিন আমার বার বার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনে হচ্ছিল আজ যদি তুমি বাড়ি থাকতে, সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝ্‌তে জুলুম করার সীমা আছে—সকলের ওপরেই সব-কিছু চালানো যায় না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইল না। রাখালও তেমনি নির্ব্বাক্ স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতে ইহার অধিক ভাঙিয়া বলিলেন না।

মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে!

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ-সাতদিন কারবারের কাগজপত্র নিয়ে ভারি খাটতে হয়েছে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো তো কাকাবাবু ?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,

তোমার সেই টাকাটা আমি বছর-খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম, ভেবে-ছিলাম, আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখচি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, না নিলে কি না হবার ভয় আছে?

আছে বই কি নতুন-বৌ—বলা তো যায় না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট-দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্ত্তা। টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় তো যাবে। কিন্তু আমারো তো আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বৌ, এ দুঃসাহস করা আমার চলে না। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্ত্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক্, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন—কোন জবাবই দিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা হলে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা কোরো না নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট-দশদিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু, নিজে করবে না?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশি নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞাসা কোরো, তিনি সায় দেবেন। চললাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন; তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময় ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিল-মোহর করা একটি টিনের বাক্স। সবিতা পূর্ব্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন, বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতরে তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বাহান্ন হাজার টাকার চেক্। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ-সব গয়না তোমার রেণু পরবে?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ি হয়ে সকলকে নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে কি না—

তবে আমি উঠি; কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা কোরো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ তো তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিত নয়—কেউ পেঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরওয়ান, নিজের মোটর, সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তাহলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্ত্তা?

যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ সবের প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখো না, যা কপালে লেখা ছিল ঘটেচে—গোবিন্দ মীমাংসা তার একরকম করে দিয়েচে,—আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস কোরো না নতুন-বৌ, আমি সত্য কথাই বল্‌চি।

সবিতা তেমনি অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়, অবিলম্বে গাড়ি ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্ত-সমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বৌ?

না মেজকর্ত্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

তবে কাঁদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্ত্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ-সাড়া পাওয়া গেল। সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করছিল, আর দেরি কতো? চলুন না ভারি বাক্সটা আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ওর আপদ বালাই।

রাখাল হাত জোড় করিয়া জবাব দিল, মায়ের মুখে ও নালিশ অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে মা—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালোমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাক্সটা তোমার গাড়িতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক,

আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

৬

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন-বারো পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, বরকর্ত্তার কর্ত্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই এবং কর্ত্তা-গিন্নী অর্থাৎ মনিব ও মনিবগৃহিণী তাহার কার্য্যকুশলতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লী প্রবাস কেবল এইটুকুমাত্র ঘটনাই নয়, তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখনো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়াপীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে। তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু যোগেশ। সে বরযাত্রীর দলে ভিড়িয়া নিখরচায় দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব মিনার ইত্যাদি এ যাবৎ লোক-মুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব বন্ধুকৃত্য বাকী রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ ষোল আনায় পরিশোধ করিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাখালবাবু আজও বিবাহ করেন নাই কেন? যোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর সখ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্যায়। কন্যাপক্ষীয় সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছে, উনি কলিকাতায় করেন কি? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছে, বিশেষ কিছুই নয়। তার পর মুচকি হাসিয়া কহিয়াছে, করার দরকারই বা কি!

এ কথার নানা অর্থ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে। বাড়ির মেয়েদের পর্য্যন্ত নাম জানা। নূতন ব্যারিস্টার, সদ্য পাশ করা আই.সি.এস.দের উল্লেখ সে ডাক নাম ধরিয়া করে। পচু বোস, ভম্বল সেন, পটল বাঁড়ুয্যে—শুনিয়া অত দূর প্রবাসের সামান্য চাকুরিজীবী বাঙালীরা অবাক্ হইয়া যায়, কিন্তু এতকাল বিবাহের

কথায় রাখাল শুধু যে মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তার ভয় আছে। কারণ, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। সে জানে এই কলিকাতা সহরে তাহার পরিচিত বন্ধু পরিধি যথেষ্ট সঙ্কুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত। যে পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে, সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও সে পরাম্মুখ। তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে। বসন্তে বিবাহোৎসবের বাঁশি মাঝে মাঝে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা হয়তো হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদপত্রে কোথায় কোন্ আত্মঘাতিনী অনূঢ়া কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়তো বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয়, সংসারে এত প্রাচুর্য্য, এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তরের মধ্যে শুধু সেই কি কাহারো চোখে পড়ে না? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই?

কিন্তু এ-সকল তাহার ক্ষণিকের। মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়—হাসে, আমোদ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্যালোচনায় যোগ দেয়—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে ছোটে, নব বর-বধুকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটে। এতদিনের এই মনোভাবের এবার একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবার সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহার বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কন্যা দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে সমাজ ও যে মেয়েদের সংস্পর্শে সে এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসের সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়তো অনেক বিষয়ে খাটো। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নাই। পরের মুখে শেখা এই আত্ম-অবিশ্বাস এতদিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্ব্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা—তাহাদের কতদিকে কতরকমে প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জ্জন—দাবীর অন্ত নাই! এ মিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা—অকূল সমুদ্র-মাঝে সে যেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও সেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে, তোমার ভয় নেই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাস-বান করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে, এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবল মনে হইয়াছে

সে অক্ষম নয় দুর্ব্বল নয়, সংসারে অনেকের মতো সেও অনেক কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমেই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল, সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে—রাত্তিরে আমাদের সকলের নেমতন্ন।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার, লোক-খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত, কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করিতেছেন এবং সারদা কোমড়ে কাপড় জড়াইয়া জিনিসপত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে। রমণীবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন—এই যে রাজু এসেছে! নতুন-বৌ?

সবিতা অন্যত্র ছিলেন, চীৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; রমণীবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছে। বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার।

সবিতা বলিলেন, সেও ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোও গে, আমরা নিস্তার পাই।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল, রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন?

কাল।

কাল? তবে কালকেই এলেন না যে বড়ো?

অনেক কাজ ছিল, সময় পাইনি।

সবিতা সহাস্যে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েচে বলে রাজুর ওপর মস্ত দাবী।

সারদা সন্দেশের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল।

রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধুমধাম কিসের নতুন-মা?

সবিতা স্মিত-মুখে কহিলেন, এমনিই।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে, সেই মেয়ে তুমি। পরে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিঙ্গাপুরের পার্টনার এসেচে কলিকাতায়—বি সি ঘোষাল নাম শুনেছো? শোনোনি—আচ্ছা আজ রাত্তিরে তাকে দেখতে পাবে, কোটি টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব উকিল-এটর্নী, মায় দুই-তিনজন ব্যারিস্টার পর্য্যন্ত। একটু গান-বাজনা হবে—খাসা গাইছে আজকাল মালতীমালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো। কিন্তু কপাল করেছিলে বটে! দেশে থাকতে কোন এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটেই হঠাৎ আদায় হয়ে গেল। ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি—এমন কখনো হয় না। নিতান্তই বরাতের জোর! ব্যাটা

ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেললে! কিন্তু তাতেই কি কুলালো? হাজার দশেক কম পড়ে যায়, আমাকে আবদার ধরলেন, সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বললুম, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত অরুচিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এইখানেই স্নান করে ভুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজি আছি, কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে ও-বাড়িতে একবার যেতে হবে।

কাল গেলে হয় না?

না।

তবে কখন আসবে বলো?

আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো মা?

তারক এখানে নেই বুঝি?

না, সে তার বর্দ্ধমানের মাস্টারিতে গিয়ে ভর্ত্তি হয়েছে। থাকলেও হয়তো আসতো না।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, ওঁর ওপর রাগ করোনা রাজু, ওঁদের কথাবার্ত্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না মা, রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্যে। বলিয়া চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার ঋণ মনে রাখা কঠিন।

যদিচ, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-মার তত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানে না, তথাপি সেই ধর্ম্মপ্রাণ সদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাষা সে ক্ষমা করিতে পারিল না। অথচ নতুন-মা আমলই দিলেন না, যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাঁহারই প্রতি লোকটার কদর্য্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইল না, বরঞ্চ উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হঠাৎ হাল্কা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিক হয়েচে। এই ওঁর প্রাপ্য। আমি মিথ্যে জ্বলে মরি।

বৌবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাধা লাগিয়াছে—সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তালা দেওয়া, উপরের জানালাগুলো সব বন্ধ—একটা নোটিশ ঝুলিতেছে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ নিজেকে

প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেকদিনের, এ-অঞ্চলের সকল ভদ্রগৃহেই সে মাল যোগায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ি ভাড়া কি-রকম?

নবদ্বীপ তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেন না রাখালবাবু?

না, আমি এখানে ছিলাম না।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্য বাবু বাড়িটা বিক্রী করে দিলেন যে।

বাড়ি বিক্রী করে দিলেন! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়?

গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ি। ব্রজবাবু রেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেচেন।

বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটার দুখানা বাড়ির পরেই সতেরো নম্বরের বাড়ি।

সতেরো নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজায় কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, ফটিকের মা, কাকাবাবু কোথায়?

ওপরে রান্না করচেন।

বামুন নেই?

না?

চাকর?

মধু আছে, সে গেছে ওষুধ আনতে।

ওষুধ কেন?

দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখ্‌চে।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই। কবে এখানে আনা হোলো?

দাসী বলিল, চারদিন। চার দিনই জ্বরে পড়ে।

ভিজা স্যাঁত-সেঁতে উঠানময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এককোণে লোহার উনুন জ্বালিয়া ব্রজবাবু গলদঘর্ম্ম। সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই ত্যাখো রাজু, ফটিকের মার কাণ্ড! উনুনে এত কয়লা ঢেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ফ্যানটা যেন—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে, না?

রাখাল কহিল, তা হোক। আপনি উঠুন তো কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে

গেছে—গোবিন্দর পূজাটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণ নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। রেণু কই? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিজের বিছানায় শুইয়া। রাজুদাকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, কান্নাটা কিসের? জ্বর কি কারো হয় না? ও দু'দিনে সেরে যাবে, আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে? উঠে বোসো। মুখ ধোয়া, কাপড়ছাড়া হয়েছে তো?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চেঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে যাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের মা, ওতে চলবে না। তুমি, আমি, মধু আর কাকাবাবু—চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফেলো, আমি নীচে থেকে চট করে স্নানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে তো?

আছে।

বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই—আমি আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারিনে।

রেলিঙের উপর কাচা কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নীচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেন না, শীগ্‌গির উঠুন। রেণু, নেয়ে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। মধু এসে পড়লে যে হয়—

বিষণ্ণ নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা চেঁচামেচির ঝড় বহিয়া গেল।

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেজেয় পড়িয়া মিনিট দুই-তিন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায়, অকস্মাৎ যেদিন বিসূচিকায় তাহার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তার পরে উঠিয়া বসিল, ঘটি-কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ মানুষ—কে বলিবে ঘরে কপাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো মাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁধা-বাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জন্য এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা, ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিল না। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া নীচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া, আবার যখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইতে বলিল, রাজুদা, তুমি আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বৌ হবে সে ভাগ্যবতী; কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবে না?

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে তো?

না, সে হবে না। বাবাকে ধরে এবার আমি নিশ্চয় তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দেবো।

তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ ডাক্তার আজ কি বললেন? জ্বরটা ছাড়চে না কেন?

ফটিকের মা দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ তো আসেননি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো! আর মিছামিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অসুখ সেরে যায় ফটিকের মা? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিল না, বুঝিল দুর্দ্দশায় পড়িয়া সামান্য গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহে না।

তুমি কি চলে যাচ্ছো রাজুদা?

আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

নিশ্চয় আসবে তো?

নিশ্চয় আসবো। আমি না আসা পর্য্যন্ত কাকাবাবুকে উনুনের কাছেও যেতে দিও না রেণু।

শুনিয়া রেণু কত যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার জ্বর না থাকে আমি রাঁধবো রাজুদা?

কিছুতেই না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিও না ফটিকের মা! এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ি—নীচের তলায় ডিসপেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল; রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর জ্বরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন—তখন দিন-দুই না গেলে ঠিক বলা যায় না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পর ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল, তখন ভাবনা নেই। আমি সকালেই যাবো।

নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডাকবার লোক নেই।

ডাকবার দরকার নেই রাখাল, আমি আপনিই যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত মহৎ ও সর্ব্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর, নানা কাজের মধ্যে এ-কথা কখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, নির্জ্জনে ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দু'চোখ বহিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে ইহার কূল এবং এই দুঃখের দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটি ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত, ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, চিকিৎসা করাইবার অর্থও হয়তো হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্ম্ম-বুদ্ধি, ভগবৎভক্তি, সাধুতা সকলের 'পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল, দিল্লী হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোস্টাফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার 'পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলে না, অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক্। তাহারই চিকিৎসায় তাহারই কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিয়া? যদি না থাকে। সে জানে, যে-বাটীতে সে ছেলে পড়ায় তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য, কিন্তু সেখানে আবেদন করা নিষ্ফল। অনেক 'বড়লোক' গোপনে তাহারই কাছে ঋণী, সে ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহারা ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে। কিন্তু দীপশিখা জ্বলিয়াই স্তিমিত হইয়া আসিল—সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবে কি করিয়া। এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা পথও তাহার চোখে পড়িল না; কিন্তু সে বলিলে তো চলিবে না, পথ তাহার চাই-ই—তাহাকে পাইতেই হইবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিয়া জানাইল তাহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সে-ও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল সৌখিন লোক, বেশ-ভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও সহ্য হয় না, কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িল না, যেমন ছিল তেমনই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-মার বাটিতে আসিয়া যখন পৌছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে খান কয়েক মোটর দাঁড়াইয়া, বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎদীপালোকে সমুজ্জ্বল,

দ্বিতলের বড় ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাঁধাবাঁধির শব্দ উঠিয়াছে, গৃহস্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না ঘটে—রাখালকে দেখিয়া এক-মুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, এতক্ষণে বুঝি আমাদের মনে পড়লো বাবা ?

এ-কয়দিন যে নতুন-মাকে সে দেখিয়াছে, এ যেন সে নয়, অভিনব ও বহুমূল্য বেশ-ভূষার পারিপাট্যে তাঁহার বয়সটাকে যেন দশবৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে, রাখাল কেমন একপ্রকার হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তিনি তখনই আবার বলিলেন, আজ একটু কাজ করে দিতে বলেছিলুম বলে বুঝি একেবারে রাত্তির করে এলে রাজু ?

রাখাল নম্রভাবে বলিল, কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল মা। তা ছাড়া আমার না-আসতে পারায় ক্ষতি তো কিছুই হয়নি।

না, ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তখন বলে গেলেই ভালো হোতো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির সুর মিশিল।

রাখাল বলিল, তখন নিজেও জানতাম না নতুন-মা। তারপরে আর সময় পেলাম না।

কে-একজন ডাকিতে সবিতা চলিয়া গেলেন, মিনিট-পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাখাল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, দাঁড়িয়ে কেন রাজু, ঘরে গিয়ে বোসো গে।

রাখাল কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাইতে পারে না, কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়, শেষে আস্তে আস্তে বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নতুন-মা, আমাকে আজ কিছু টাকা দিতে হবে।

সবিতা সবিস্ময়ে চাহিলেন, বলিতে বোধ হয় তাঁহারও বাধিল, কিন্তু বলিলেন, টাকা ? টাকা তো নেই রাজু—যা ছিল ওটা কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে, ও-বেলাই তো শুনে গেলে।

কিছুই নেই মা ?

না থাকার মধ্যেই। ঘর করতে সামান্য যদি কিছু থাকেও খুঁজে দেখতে হবে। সে অবসর তো নেই।

সারদা নানা কাজে আনাগোনা করিতেছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, আমার কাছে দশ টাকা আছে, এনে দেবো ?

রাখাল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি দেবে ? আচ্ছা, দাও ?

সারদা বলিল, মিনুর দিদিমার হাতে টাকা আছে, জিনিস রাখলে ধার দেয়।

তার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো সারদা ?

কেন পারবো না—তিনি তো বুড়োমানুষ। কিন্তু আমার তো জিনিস কিছু নেই—

তবু চলো না দেখি গে।

আসুন।

তাহাদের যাইবার সময় সবিতা বলিলেন, না বলে না খেয়ে নীচে থেকেই যেন চলে যেও না রাজু—

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ বড় অ-বেলায় খাওয়া হয়েছে নতুন-মা, ক্ষিদের লেশ নেই। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এই বলিয়া সে সারদার পিছনে নামিয়া গেল। সবিতা আর তাহাকে অনুরোধ করিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেলে, সারদা নিজের ঘরের দুই-একটা বাকী কাজ সারিয়া লইয়া পুনরায় উপরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, সবিতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, একটা পান দাও তো মা, খাই।

এ ভাগ্য কখনো সারদার হয় নাই, সে বর্ত্তিয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া ফেলিয়া পান সাজিতে বসিতেছে, তিনি বলিলেন, রাজু না খেয়ে রাগ করে চলে গেল?

এত কাজের মধ্যেও ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে বিঁধিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই।

সারদা মুখ তুলিয়া কহিল, না মা, রাগ করে তো নয়।

রাগ করে বই কি। ও সকাল থেকেই একটু রেগে ছিল, তাতে আবার টাকা দিতে পারিনি—তুমি বুঝি দশ টাকা তাকে দিলে?

না মা, আমার কাছে নিলেন না, মিনুর দিদিমার কাছ থেকে একশ টাকা এনে দিলুম।

এমনি? শুধু-হাতে সে দিল যে বড়ো?

সারদা বলিল, না, এমনি তো নয়। উনি হাতের সোনার ঘড়িটা আমাকে খুলে দিয়ে বললেন, এর দাম তিনশ টাকা, তিনি যা দেন নিয়ে এসো। ওঁর চা-বাগানের কিছু কাগজ আছে তাই বিক্রী করে এই মাসেই শোধ দেবেন বললেন।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ টাকার দরকার ওর হোলো কিসে?

সারদা কহিল, কে-একটি মেয়ে পীড়িত, তারই চিকিৎসার জন্যে।

মেয়েটি কে যে তার জন্যে রাতারাতি ওকে ঘড়ি বন্ধক দিতে হয়?

সে তো জানিনে মা! কিন্তু, বোধ হয় খুব শক্ত অসুখই হয়েচে। টাকার অভাবে পাছে মারা যায়, এই তাঁর ভয়। মেয়েটির বাপ নাকি ছেলেবেলায় ওঁকে মানুষ করেছিলেন।

সবিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিল বললে? এ

ওর বানানো গল্প। রাজুকে কে মানুষ করেচে আমি জানি। তাঁর মেয়ের চিকিৎসায় পরকে ঘড়ি বাঁধা দিতে হয় না।

সারদা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বানানো গল্প বলে তো মনে হয় না মা। বলতে গিয়ে চোখে জল এলো—বললেন, এদেরও বিত্ত-বিভব অনেক ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার জন্যে বাড়ি-ঘর পর্য্যন্ত বিক্রী করে দিতে হোলো, অথচ দিল্লী যাবার আগেও এমন দেখে যান নি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই—বুড়ো বাপ আপনি বসেচে রাঁধতে—কিন্তু জানে না কিছুই—হাত পুড়েচে, ভাত পুড়েচে, তরকারি পুড়ে গন্ধ উঠেচে—রাখালবাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হোলো, তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলেছিলেন, এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির তো মা নেই—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজি হয়ে বলেচি, যা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করব।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রহিল; জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজু বললে, হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে বাড়ি পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল? দিল্লী যাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

হাঁ, তাই তো বললেন।

অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই—মারা গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়, আর কি হতে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরণে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় মা?

রাজুর বাসায়।

এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলচি মা, তিনি দুঃখ একটু করেচেন, কিন্তু রাগ করে চলে যায়নি। তা ছাড়া, বাড়িতে কত কাজ, কত লোক এসেচে, সবাই খুঁজবে যে মা?

কেউ জানতে পারবে না সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দিগ্ধ-স্বরে কহিল, ভাল হবে না মা, হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

সবিতা কয়েক-মুহূর্ত্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির

যাবে, কাল সকাল যাবে, তারপরে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে যে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুঝিল না, কিন্তু আর আপত্তিও করিল না—নীরব হইয়া রহিল।

যে দরজায় ভাড়াটেরা যাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট-দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চোখে পড়িল ঠিক উপরেই—আলোকজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষটি তখন সঙ্গীতে হাস্যে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। একটি রুমালে বাঁধা বাণ্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখো তো মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়তো নেবে না— তুমি তাকে দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহির হইতে কপাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে বসিলেন এবং আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌবাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ি থামিল। নামিতে হইল না, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটীশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাঁহার মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িল না, গৃহে ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অনুমান করা সারদার কঠিন, কিন্তু সে এটা বুঝিল যে, রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি একটা ঘটিয়াছে।

ফিরিবার পথে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল, এ বাড়ি কার মা? এই বাড়িই বিক্রী হয়ে গেছে?

হাঁ।

এঁর মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল, কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা?

কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু যদি না আসে? আমার বাড়িতে আর যদি সে পা দিতে না চায়?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই; এইটুকু মাত্রকে উপলক্ষ করিয়া নতুন-মার এতবড় উৎকণ্ঠা আবেগ ও আত্মগ্লানিতে

তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল; তাহার সন্দেহ জন্মিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্ঠুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয় এ-কথা না জানার ভাণ করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সবাই জানিত এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—আচারে আচরণে বড়, হৃদয় বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড়, তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্য কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিল না, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের জন্য সবিতার মুখের 'পরে পড়িল; সারদা দেখিল, তাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল, অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা?

কেন মা?

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন সাড়া নাই—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সযত্নে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আমার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বার-কয়েক কাঁপিয়া উঠিল, পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বল্পকালের অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নীচে হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে ঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখন নেয়ে এলে? মাথা ঘুরছিল বোধ করি?

হাঁ।

তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়ো গে মা, সারাদিন যে খাটুনি হয়েচে।

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি মা, কোন ভাবনা নেই। দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো।

সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোনমতে চুকিল, অভ্যাগতেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রমণীবাবু প্রবেশ করিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, আচ্ছা খেলাই খেললে! বাড়িতে কোন-একটা কাজ হলে তোমার কোন-একটা ঢং করা চাই। এ তোমার স্বভাব। লোকেরা গেছে—এবার নাও, ছলা-কলা রেখে

একটু উঠে বসো—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ পরো বিমলবাবু দেখা করতে আসচেন।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয়। বস্তুতঃ এমনই কিছু-একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, ক্লান্তস্বরে বলিলেন, দেখা কিসের জন্যে?

কিসের জন্যে! কেন, তারা কি ভিখারী যে খেতে পায় না? বাড়িতে নেমতন্ন অথচ বাড়ির গিন্নীরই দেখা নেই। বেশ বটে!

সবিতা কহিলেন, নেমতন্ন হলেই কি বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি?

রমণীবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, প্রথা নাকি? প্রথা নয় জানি—স্ত্রী হলে আলাপ-পরিচয় করতে কেউ চায় না—কিন্তু তারা সব জানে।

সারদার সম্মুখে সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। সারদা নিজেও পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। এদিকে উত্তেজনা পাছে হাঁকাহাঁকিতে দাঁড়ায় এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশি, তাই নম্রভাবেই কহিলেন, আমি বড় অসুস্থ, তাঁকে বলো গে আজ দেখা হবে না।

কিন্তু ফল হইল উল্টা। এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চেঁচাইয়া উঠিলেন—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটীপতি লোক তা জানো? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটায় খবর রাখো? আমি বলচি—

দরজার বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড় কপাল পর্য্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিলেন। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েচেন, কিন্তু কালই বোধ হয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়তো আর ফিরতে পারবো না, অমনি বোম্বাই হয়ে জাহাজে সোজা কর্ম্মস্থলে রওনা হতে হবে। ভাবলুম, মিনিট-খানেকের জন্যে হলেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথ্যে আজ বড় তৃপ্তি লাভ করেচি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স বছর চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ; কহিলেন, খবর পেলুম রমণীবাবু আজকাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীর যে ভালো থাকে না সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার আর বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমন হয়েচে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইলেন, বলিলেন, আমার ফটো আপনি দেখেচেন নাকি?

দেখেচি বই কি? আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, ছবির মালিককে একবার চোখে দেখবো। সে সাধ আজ মিটলো! চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন-কয়েক সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি আছে, তার উপর-তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য্যোদয়-সূর্য্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজি হয়েচেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যেতে পারি তো জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে তো কথা দিয়েচি বিমলবাবু, আমি আসছে সপ্তাহে রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হোলো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়তো এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশ্যে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয়তো উদ্যোগ আয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়িটার কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে? কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন—কেন সুবিধে হবে না শুনি? লেখা-পড়া কাল-পরশু শেষ হয়ে যাবে, দরওয়ান চাকর বাড়িতে রইলো, ভাড়াটেরা রইলো, যাবার বাধাটা কি? না, সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখা-শোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিলেন, না। আমি যেতে পারবো না।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—না কেন? আমি বলচি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে?

হাঁ, দরকার হয় তো তাই।

তা হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না। কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল

কি না। বলিলেন, আচ্ছা আজ তা হলে উঠি—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু, যাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইল—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে—দেখি কতবার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন—নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু আমি চললুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণী-বাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়তো তাহা সত্য নয়।

৭

সারদা বলিল, মা, খাবেন না কিছু?

না।

এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো?

না, দরকার নেই।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবো?

তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে।

তথাপি উঠি উঠি করিয়াও তাহার দেরি হইতেছিল, রমণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল, আজকের মতো কোন-রকমে মান রক্ষেটা হোলো। ভদ্রলোক খাসা মানুষ, অতবড় দরের লোক তা দেমাক অহঙ্কার নেই, তোমার জন্যে তো ভাবনা, একশোবার অনুরোধ করে গেলো কাল সকালে যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়তো বা একটা মস্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়—বলা যায় না কিছু-ওদের তো আর আমাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ-বিশ হাজার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! রথমার কোম্পানি—ডিরেক্টারই বলো আর শোয়ার হোল্ডারই বলো, যা করে ঐ মিস্টার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে, লোকটা কোটি টাকার মালিক। কোটি টাকা! জারমানি, হল্যাণ্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দু-চারবার এমন য়ুরোপ ঘুরে আসতে হয়—জেনারেল ম্যানেজার শপ সাহেবই ওর মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক। জাভার চিনি চালানিতেই গেল বছরে—

মুনাফার রোমাঞ্চকর অঙ্কটা আর বলা হইল না—বাধা পড়িল। সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে—বাড়ি গেলে না?

কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাহার আনন্দবর্দ্ধন করিল না এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার 'মস্ত লোকের' বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ি? নাঃ—আজ আর যাবো না।

কেন?

নাঃ—আজ আর—

সবিতা একমুহূর্ত্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, মদের গন্ধ বেরুচ্চে—তুমি মদ খেয়েচো?

মদ? আমি? (ইসারায়) মাত্র একটি ফোঁটা—বুঝলে না—

কোথায় খেলে, এই বাড়িতে?

শোন কথা! বাড়িতে নয় তো কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলুম?

মদ আনতে কে বললে?

কে বললে! এমন কথা কখনও শুনিনি। বাড়িতে দু-দশজন ভদ্রলোককে আহ্বান করলে ও একটু না আনিয়ে রাখলে কি হয়? তাই—

সকলেই খেলে?

খেলে না? ভালো জিনিস অফার করলে কোন্ শালা না খায় শুনি? অবাক্ করলে যে তুমি?

বিমলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, না, আজ ও একটু চাল দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্ত্তি-কাহিনী জানতে বাকী নেই আমার। জানি সব!

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বই কি। আচ্ছা যাও এখন। রাত হয়েছে, ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বলার ধরণটা শুধু কর্কশ নয়, রূঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই সবিতার নীরস কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতা রমণীবাবুকে বিঁধিতেছিল, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন—আজ তোমার হয়েচে কি বলো ত? মেজাজ দেখি যে ভারি গরম। এতটা ভাল নয় নতুন-বৌ!

সারদার ভয় হইল, এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবিতা নীরবে চোখ বুজিয়া তেমনই রহিলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলেচি, সবাই জানে তুমি স্ত্রী নয়—তাতেই

লেগেচে যত আগুন। কিন্তু জানে না কে? সারদা জানে না, না বাড়ির লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কতদিন চাপা থাকে? এতে অপমানটা তোমার কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ ও কঠিন; কহিলেন, এ-কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনতেও লজ্জা পেতো কেবল পুরুষমানুষ বলেই, কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তোমার কথায় আমার অপমান হয়েচে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্য, কিন্তু মনে ভাবচো তো তাই।

সবিতা উত্তর দিলেন, না, মুখেও বলিনি, মনেও ভাবিনি! তোমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার মর্য্যাদা বাড়ে না সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষুলজ্জা বাঁচে, নইলে সত্যিকারের লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালি হয়ে ওঠে।

কেন? কেন শুনি?

কি হবে শুনে? এ কি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধূলোর যোগ্য নও।

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এত রাত্তিরে কি করচেন মা আপনারা? দোহাই মা, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিলেন না। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন, সত্যি? সত্যি নাকি?

সবিতা কহিলেন, সত্যি কি না তুমি নিজে জানো না, সমস্ত ভুলে গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া সংসারে কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই তো নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে করেছিলেন। নিজে কত বড় হলে এতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি সয়েচে, এটুকু সইবে না?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে কথাটি মুখে আসিল তাহাই কহিলেন, তবে বললে তুমি রাগ করতে যাও কিসের জন্যে?

সবিতা বলিলেন, শুধু আজই তো বলোনি, প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা কটু, তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে, কিন্তু অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে, এ লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধও নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অশিক্ষিত রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত রূঢ়

এবং অপমানকর। তাই সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছে পড়ে থাকা কিসের জন্যে ?

সবিতা কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, বলিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করচেন মা, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন ?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিলেন, না সারদা, আর আমি ঝগড়া করবো না। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা, কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট-দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দে বুঝা গেল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি মা ?

জানিনে সারদা। ও-কথা অনেকবার শুনেচি, কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু মিছামিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন তো।

সবিতা মৌন হইয়া রহিলেন।

সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হোলো, এবার আমি যাই মা।

যাও মা।

সেই মাত্র ভোর হইয়াছে, সারদার দরজায় ঘা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলো না সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা, ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরওয়ান খবর দিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক্ আজ তোমাকে নিয়ে যেতে সে আসবেই।

তাই তো বলেছিলেন।

আজই আসবে বলেছিল তো ?

না তা বলেননি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অসুখে তাঁকে সাহায্য করতে।

তুমি স্বীকার করেছিলে তো ?

করেছিলুম বই কি।

কোনরকম আপত্তি করোনি তো মা?

না মা, কোন আপত্তি করিনি।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজকর্ম্ম সারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল—রাখাল নিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয়। তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই-একখানি ভালো কাপড় ছিল তাহাও বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বেশি ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে, যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয়। দূর সম্পর্কের এক বোনের বড় অসুখ, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

বেলা দশটা বাজে, সবিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন—রাজু আসেনি সারদা?

না মা।

তুমি হয়ত যেতে পারবে না এমন সন্দেহ তার তো হয়নি?

হওয়া তো উচিত নয় মা। আমি একটুও অনিচ্ছে দেখাইনি, তখনি রাজি হয়েছিলুম।

তবে আসচে না কেন! সকালেই তো আসার কথা। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, দারওয়ানকে পাঠিয়ে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেচে কি না। বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কৌতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিল না, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাখালের দেখা নাই। আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেন না। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলো গে বাবু বাড়ি নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচেন, বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা, ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন একটু ময়লা দেখাচ্চে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দাসীর কথায় হুঁস হইল, পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ-পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ত্রুটি ধরিবার কিছুই নাই, সবুজ রঙের অনুজ্জ্বল আলোকে মুখের শুষ্কতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, হয়তো ব্যস্ত করলুম, কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম, আজ না এসে পারলুম না।

সবিতা কহিলেন, আমি ভাল আছি। আপনার কানপুর যাওয়া হয়নি?

না। এখান থেকে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

না, নিজের ঠিক নয়—বাবার খুড়তুতো ভাই—কিন্তু—

এক বাড়িতে আপনাদের সব একান্নবর্ত্তি পরিবার বুঝি?

না, তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়েই হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

না, ঠিক তা নয়—ভুগছেন অনেকদিন থেকে, তবে—

তা হলে কালকে হয়তো যেতে পারবেন না—খুব ক্ষতি হবে তো?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে, কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসায় লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও তো একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কি কিছুই করেন না?

সবিতা বলিলেন, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে, না আসাই সম্ভব।

না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

আজকে নয়, কাল রাত্তিরে আপনাদের যাবার পরই চলে গেছেন।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশি রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধ করি ও-রকম অকারণ জোর-জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্যায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার

অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারংবার অনুরোধ করা আমার ভারি অনুচিত হয়েচে। নইলে এ-সব কিছুই ঘটতো না। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড় অসুস্থ ছিলেন, আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েচেন, না একজনের 'পরে রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্চেন, বলুন তো সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দুজনার চোখাচোখি হইল, সবিতা চোখ নামাইয়া বলিলেন, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা তো শক্ত নয়, শক্ত হচ্চে অনুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

না, সে আপনি পাবেন না।

না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে তো জানাবেন না।

না, জানাবো না। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক-মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে ঢের বেশি অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি—চেষ্টা করেও লুকোতে পারেননি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিলেন, নিজের চোখকে অত নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভারি ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয় না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্যেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়—হাসির কথাও নয়—অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্য্যস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য্য এই যে, মুখে তাঁহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মানুষের সচরাচর চোখে পড়ে না—যখন পড়ে রক্তে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরা পাত্রে তৃষ্ণার্ত্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্ত্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনীর নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিল না। সবিতার অনতিকাল পূর্ব্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত ধারণা এইবার নিঃসংশয় প্রত্যয়ে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালি ঢালিয়া দিল। মনে পড়িল এই লোকটি জানে সে স্ত্রী নয়, সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা যতই জ্বালা করিয়া উঠুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহার সম্মুখে মর্য্যাদা-হানির অভিনয় করিতেও প্রবৃত্তি হইল না। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল। তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জ্জিত-রুচি,

অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়— উভয়ের বিস্তর প্রভেদ—এ হয়তো আপমানের পরিবর্তে একটা কথা বলিবে না, হয়তো শুধু অবজ্ঞার চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

মিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেন না আমার?

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার মনে নেই।

এমনি অন্যমনস্ক আজ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েচে জানতে পাইনে?

না।

আমাকে না বলুন ডাক্তারকে তো স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

না, তাও পারিনে।

এ কিন্তু আপনার বড় অন্যায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছে না দণ্ড, পাচ্ছে যে মানুষ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

এ অভিযোগের উত্তর আসিল না। বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি, আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশি খারাপ। হয়তো আবার জবাব দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েচে, হয়তো বলবেন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে, কিন্তু একটা কাজ আজ বলবো আপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েচে আমাকে, এ দুটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারের দেখতে হয়েচে, বিশেষ ভুল তাদের হয়নি—হলে মাঝ-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তো না। আমার সেই দুটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্ছে আপনি ভালো নেই—তবু কিছুই করতে পাবো না—মুখ বুজে চলে যাবো—এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবার দুজনের চোখে চোখে মিলিল এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিলেন না, শুধু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু। তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই– নিষেধ মানিতে চাহে না—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন্ একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাঁহার রোগশয্যায়। নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল। শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অনু-শোচনায়। কিছুতেই আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উদ্গত অশ্রু কোন মতে সংবরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িলেন, কহিলেন, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান-অভিমানের ব্যাপার—দু'দিন সময় লাগিবে।

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ি রাখিয়া দরওয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাড়ির দ্বারে দাঁড়াইলেন। ফটিকের মা বাড়িতে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি?

তুমি কে মা?

আমি ফটিকের মা। এ-বাড়ির অনেকদিনের ঝি।

কোথায় যাচ্চো ফটিকের মা?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ তেলটুকু পড়ে গেলো, তাই যাচ্চি আবার আনতে।

বামুন আসেনি বুঝি?

না মা, এখনো আসেনি। শুনচি নাকি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধচেন।

রাজু বাড়ি নেই বুঝি?

তাঁকে চেনেন? না মা, তিনি বাড়ি নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

আর রেণু কেমন আছে ফটিকের মা?

তেমনি, কি জানি কেন জ্বরটা ছাড়চে না মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েচে।

কে দেখচে?

আমাদের বিনোদ ডাক্তার। এখুনি আসবেন তিনি। আপনি কে মা?

আমি এঁদের গাঁয়ের বৌ ফটিকের মা, খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

তাঁকে খবর দিয়ে আসবো কি?

না, দরকার নেই ফটিকের মা, আমি নিজেই যাচ্চি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসো গে।

দরওয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিলেন, তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে মহাদেও, আমার সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, গাড়িটা যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহুৎ আচ্ছা মাইজি, বলিয়া মহাদেও চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দায় যে দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসৎ নাই, কহিলেন, তেল আনলে? জলটা ফুটে উঠেছে ফটিকের মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো, না পটোলটা আগে সেদ্ধ করে নোবো?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা, যা হোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ! কখন এলে? বোসো। না না,

মাটিতে না—মাটিতে না, বড় ধূলো। আমি আসন দিচ্চি, বলিয়া হাতের পাত্রটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিতেছিলেন, সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল—করচো কি? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে।

তা বটে। কিন্তু এখন আর দোষ নাই—দিই না ও-ঘর থেকে একটা এনে?

না।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, দোষ সেদিনও ছিল, আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্ত্তা। কিন্তু সে-কথা আজ থাক্। বামুন কি পাওয়া যাচ্চে না?

পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই তো হাতে খাওয়া যায় না। রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে।

কিন্তু এ লোকটা যে তোমার জেরায় টিকবে না মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য্য নয়, অন্তত সেই ভয়ই করি। কিন্তু উপায় কি!

সবিতা কহিলেন, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে—রাখবে মেজকর্ত্তা?

ব্রজবাবু বলিলেন, নিশ্চয় রাখবো।

জেরা করবে না?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না গো না, করবো না। এটুকু জানি, তোমার জেরায় পাশ করে তবে সে আসবে। সে আরও কঠিন। যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবে না তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে?

না, পারো না। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন, পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটা পুঁটুলি, একটায় তরকারি, অন্যটায় সাগু বার্লি মিছরী ফল-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য্য হইল, তার পরে হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল কাকাবাবু, এবার আপনি ঠাকুর-ঘরে যান, উদ্যোগ আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকী রান্নাটুকু সেরে ফেলি। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত রান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কড়ায় ওটা কি ফুটচে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটলের ঝোল।

আর ?

আর ? আর ভাতটা হবে বই ত নয় রাজু।

এতগুলো লোক কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু ? জল কই, কুটনো বাটনা কোথায়, রান্না কিছুই তো চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্য্যন্ত পড়েনি—ধুলো জমে রয়েচে, এত বেলা পর্য্যন্ত আপনারা করছিলেন কি ? ফটিকের মা গেল কোথায় ?

ব্রজবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কি না—সে গেছে দোকানে কিনতে—এলো বলে।

মধু ?

মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে, উঠতে পর্য্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ—সংসারের কাজ—একা ফটিকের মা—

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল এক কড়া ঘোলের প্রতি, জিজ্ঞাসা করিল, এত ঘোল কিনলে কে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, ঘোল নয় ছানার জল। ভাল কাটলো না কেন বলো ত ? রেণু খেতেই চাইলে না।

শুনিয়া রাখাল জ্বলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেচে যে খায়নি। সংসারের ভার তাহার 'পরে, রাত্রি জাগিয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া, ছুটাছুটি, পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া কহিল, আপনার কাজই এমনি। এইটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে খাওয়াবেন তাও পারেন না।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ৎ তাঁহার মুখে আসিল না; কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, যান আপনি ঠাকুর-ঘরে, যা করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুর-ঘরের কোন কাজই এখন পর্য্যন্ত হয় নাই—সমস্ত তাঁহাকেই করতে হইবে। আর একবার স্নানের জন্য নীচে যাইতেছিলেন—সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ কিন্তু পুজো-আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্ত্তা, দেরি করলে চলবে না।

কেন ?

কেনর উত্তর সবিতা দিলেন না; মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর জন্যে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও তো রাজু—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করেননি।

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল ; ব্রজবাবু বলিলেন, এ-কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বৌ ?

সবিতা কহিলেন, আশ্চর্য্যই তো! কিন্তু দেরি করতে পারবে না বলে দিচ্চি। নইলে গোবিন্দর দোর-গোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা শুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্য্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। যাও, শান্ত হয়ে পূজো করো গে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফটিকের মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল স্টোভ জালিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের মা ?

না বাবু, কর্ত্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেচেন।

তা হলে উপায় কি হবে ? রেণু খাবে কি ?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা, তাতে ভয় পাবার আছে কি ? এ-বেলাটা বার্লিতে চলে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্ত্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলো না।

না মা, আমি অতো বে-হিসেবি নয়। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয় না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। খানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চেনা গেল, খুঁজিতে হইল না। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতেছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন, মেজকর্ত্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ তো, বেশ তো, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিলেন, না, বাইরের লোকে দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আজ আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়ো-সড়োভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা নতুন-বৌ ?

সবিতা কহিলেন, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আমার ?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে ?

সবিতা বলিলেন, যদি না যাই তোমার সুমুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমার ?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার মাথা-মুণ্ড নেই। যাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্চে।

সবিতা উত্তর দিলেন, আমি ঠাট্টা করিনি মেজকর্তা, সত্যিই বলচি, কিছুতে দোর খুলবো না যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয়তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে?

জবাব না থাকে তো থাকো পাগলের সঙ্গে একঘরে বন্ধ। দোর খুলবো না।

লোকে বলবে কি?

তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ! জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেচে কখনো দুনিয়ায়? তা হলে তো আইন-কানুন বিচার-আচার থাকে না, জোর করে যার যা খুশি তাই করতে পারে সংসারে?

সবিতা কহিলেন, পারেই তো। তুমি কি করবে বলো না?

এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না?

না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।

এখানে থাকবে কোথায়?

নীচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও- তোমার মিথ্যে বলাও হবে না।

তুমি ক্ষেপেচো নতুন-বৌ, এ কখনো পারি?

এ পারবে না, কিন্তু ঢের বেশি শক্ত কাজ আমাকে দূর করা। সে পারবে কি করে? আমি কিছুতে যাবো না মেজকর্তা, তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

পাগল! পাগল!

পাগল কিসে? জোর করচি বলে? তোমার ওপর করবো না তো সংসারে জোর করবো কার ওপর? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

কেন পারবো না?

কি করে পারবে? তোমার তো আর টাকা-কড়ি নেই—গরীব হয়েচো—মামলা করবে কি দিয়ে?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আজ তিন দিন হইল তিনি সর্ব্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দ্দেশ শূন্য-পথে অনুক্ষণ ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছেন, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত্ত সময় পান নাই। তাহার অসংযত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির 'পরে

নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্যেই ভাবনা নতুন-বৌ। আচ্ছা দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিলেন না, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চোখ জলে ভাসিতেছে, কহিলেন, না মেজকর্তা, মেয়ের জন্য আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুমি? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাঁহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, বাহিরে ডাক পড়িল, রাখালবাবু?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

৮

ঠাকুর-ঘরের ভিতর ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্ত দ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাঁহার নিজের, তিনি না করিলে স্বামীর পছন্দ হইত না। তখন সময়াভাবে অন্যান্য বহু সাংসারিক কর্ত্তব্য তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাঁহার ত্রুটি ধরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ মিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজ-কর্ম্ম কি জানে না? পূজা-অর্চ্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বৌয়ের বাপের-বাড়ির একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ-সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিতেন না। কখনো বাধ্য হইয়া এ-ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত, সারাদিন তাঁহার মন কেমন করিতে থাকিত, চুপি চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাহিয়া বলিতেন, গোবিন্দ, অযত্ন হচ্ছে বাবা জানি, কিন্তু উপায় যে নেই!

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিদ্র অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাঁহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল-মূর্ত্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও-দুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই! একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাঁহার অভাবের দাগ কি কোথাও পড়িল না, তাঁহার এতদিনের এত সেবা শুষ্ক জল-রেখার ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

বিবাহের পরেই তাঁহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, এত ছোট বয়সে এটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন, বয়সে ছোট হলেও ও-ই বাড়ির গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার নেবে বলেই ওকে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজনও ছিল না। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও তিনি ভুলেন নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে; সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাঁহার নাই, দূরে বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্ব্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন-মা? বাড়িতে পা দিয়েচেন দেখেই জানি আর ভয় নেই, রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল, জ্বর নেই, একদম নরম্যাল! বিনোদবাবু নিজেই ভারি খুশি, বলিলেন, ও-বেলায় যদি বা একটু হয়, কাল আর জ্বর হবে না। আর ভাবনা নেই, দিন-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্ব্বাদের ফল, নইলে এমন হয় না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমানো যাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যিই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশঃ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্যই সকলে যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সুসংবাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু, চিরজীবী হও বাবা—সুখে থাকো।

রাখালের আনন্দ ধরে না, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল, মা, আগেকার দিনে রাজা-রাণীরা গলার হার খুলে পুরস্কার দিতেন।

শুনিয়া সবিতা হাসিলেন, বলিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বৌমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ-জন্মে সে গলা তো খুঁজে পাওয়া যাবে না মা, মাঝে থেকে আমিই বঞ্চিত হলুম। জানেন তো, আমার অদৃষ্টে মুখের অন্ন ধুলোয় পড়ে—ভোগে আসে না।

সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করিল। রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ করবার দাবী কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু সেও অন্যদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্নাঘরের দিকে। এ ক'দিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেচে কেউ গ্রাহ্য করিনি, আজ কিন্তু তাতে চলবে না, ভালো করে খাওয়া চাই। আসুন তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখালকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আজ আহারাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই, কিন্তু খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিল না, কেবল ফকিরের মা নূতন লোক বলিয়া এবং না জানার জন্যই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাখাল চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি-খুশী ভাব, যেন হঠাৎ কোন যাদু-মন্ত্রে এ-বাটীর উপর হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে আরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধুর সাড়া-শব্দ নাই, সম্ভবতঃ তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খন্ খন্ ঝন্ ঝন্ আওয়াজ আসিতেছে, বোধ হয় ফটিকের মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলা আজ বেলা-বেলি মাজিয়া লইতেছে, সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল —ওগো, জেগে আছো?

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিলেন, কই আমার জবাব দিলে না?

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবটা জেনে নেবার সময় পেলাম না।

কার কাছে জেনে নেবে—আমার কাছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য্য হোচ্চো কেন নতুন-বৌ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই তো হয়ে এসেছে। সেদিন তো রাখালের ঘরে অনেকদিনের মুলতুবি সমস্যার সমাধান করে নিলুম তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্যথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছেন দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক, জবাব দিয়ে এসেচ তুমি—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুই-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির থালাটি গেল আমার হারিয়ে, তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের 'পরে, দিয়েও এসেচি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চো নতুন-বৌ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিলেন, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন, মেজকর্ত্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন তো সহজ নয়। এর মধ্যে আছে সংসার, সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্য্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলো তো? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি! কি করা উচিত আমি তো জানিনে নতুন-বৌ, তুমি বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিলেন, তার পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মেজকর্ত্তা, তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে?

হাঁ সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি টাকাটা বের করে না নিলে কি হো'তো?

তাতেও বাঁচতো না—শুধু ডুবতে হয়তো বছরখানেক দেরি ঘট্‌তো।

তোমার হাতে টাকাকড়ি এখন কি আছে?

কিছুই না। আমার সেই হীরের আংটিটা বিক্রী করে পাঁচশ টাকা পেয়েচি, তাতেই চলচে।

কোন্ আংটিটা? আমার ব্রত উদযাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে যেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম—সেইটে? তুমি তাকে বিক্রী করেচো?

সে ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না, তা তো জানো নতুন-বৌ।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, যে দুটো তালুক ছিল তাও কি গেছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, যায় নি, কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েচে, উদ্ধার করতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিলেন, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর নামে পটলডাঙ্গার দুখানা বাড়ি খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গয়না, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে—কষ্ট হবে না।

রেণুর কি আছে মেজকর্ত্তা?

কিছু না। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল, তাও বোধ হয় ভুল করে তাঁরা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভালো হলে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি, গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে বাকী দিন কটা আমার কেটে যাবে—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা মুস্কিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে, তাকে রাজি করাতে পারিনি। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু সে হয়েচে তোমার মত অভিমানী, সহজে কিছু বলে না, কিন্তু যখন বলে তার আর অন্যথা করানো যায় না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে, চলো বাবা আমার দেশে চলে যাই ; কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি চেষ্টা কোরো না, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বললাম, আমি তো বুড়ো হয়েছি মা, কটা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু তখন তোর কি হবে বল্ দিকি ? ও বললে, বাবা, তুমি তো আমার অদৃষ্ট বদলাতে পারবে না। ছেলেবেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, যার বিয়ের দিনে অজানা বাধায় সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজ্য-সম্পদ যার ভোজবাজির মতো বাতাসে উড়ে যায়, তাকে সুখ-ভোগের জন্যে ভগবান সংসারে পাঠান না, তার দুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়ো না। বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারি হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয়, দুঃখের ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয় ; ও জানে ওর ভাগ্যে এ-সব ঘটবেই। ওর মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে—কিন্তু যা মুখে এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবেচিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়তো ওকে সহজে টলানো যাবে না। তবু ভাবি নতুন-বৌ, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে, রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনে মনেও একবার সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিলেন, মেজকর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো, কিন্তু কিছু করতে পাবো না ?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বৌ, রেণু তো কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না ! আর আমি—

সবিতার জিহ্বা শাসন মানিল না, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, রেণু কি জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা ?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাঁহার কতদিকে কতভাবে তাঁহার রাত্রির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে, এ সংবাদ তিনি ছাড়া কে জানে ? পাংশু-মুখে

চাহিয়া উত্তরের জন্ম তাঁহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

জানে আমি বেঁচে আছি?

জানে। সে জানে তুমি কলকাতায় আছ—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্য্যে সুখে আছো!

সবিতা মনে মনে বলিলেন, ধরণী দ্বিধা হও।

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবে না, আর আমি—গোবিন্দর শেষের ডাক আমি কানে শুনতে পেয়েচি নতুন-বৌ, আমার গোনা দিন ফুরিয়ে এলো; তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্ম্মের অনুশাসন—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিলেন তাহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নত-মুখে বসিয়া তাঁহার সকালের কথাগুলা মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল, তখন স্বামীর স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি না যাই কি করতে পারো আমার? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিলেন, এই তো আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কন্যা, আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার?

কিন্তু এখন বুঝিলেন কথাগুলো তাঁহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব! কত হাস্যকর তাঁহার জোর করার দাবী! তাঁহার ভিত্তিহীন শূন্য-গর্ভ আস্ফালনের আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী ও অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্বামী, তাঁহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়, মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম্ম, আছে নীতি, আছে সমাজ-বন্ধনের অসংখ্য বিধিবিধান। কেবলমাত্র অশ্রুজলে ধুইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবেন তিনি কি করিয়া? আর কথা কহিলেন না, স্বামীর উদ্দেশে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাখালের ঘুম ভাঙিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন-মা চলে গেছেন।

না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে?

ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্চে।

মেজকর্ত্তা, আমি যাই এখন?

এসো।

রাখাল কহিল, মা, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন তো?

আসবো বই কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পিছনে চলিল রাখাল।

পথে আসিতে গাড়ির মধ্যে সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহার তেরো বৎসর পূর্ব্বেকার জীবন যা-কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল, আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাঁহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্যা, রাখাল-রাজ এবং কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউ। গৃহত্যাগের পর হইতে অনুক্ষণ আত্ম-গোপন করিয়াই তাঁহার এতকাল কাটিয়াছে, কখনো তীর্থে বাহির হন নাই, কোন দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, কখনো গঙ্গাস্নানে যান নাই কত পর্ব্বদিন, কত শুভক্ষণ, কত স্নানের যোগ বহিয়া গেছে—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্য্যন্ত দাঁড়ান নাই, পাছে পরিচিত কাহারো তিনি চোখে পড়েন। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে—আজ সকলের কাছেই তাঁহার ভয় ভাঙিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে নাই, কিন্তু শুনিতে তাহার বাকী থাকিবে না। তখন সে হয়তো এমনি নীরবে ক্ষমা করিবে। তাঁহার 'পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই; ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে তিনি যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছেন ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে আসন দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে বসিবার আসন—যেন অতিথির পরিচর্য্যায় কোথাও না ক্রটি হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকী কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-সৌভাগ্যের আশা নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দ্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্য্যে স্বীকার করিয়াছে। সঙ্কল্প করিয়াছে, ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গে করিয়া সে তাহাদের নিভৃত পল্লীগৃহে ফিরিয়া যাইবে—তাহার সেবা করিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছেন, রেণু জানে তাহার মা বাঁচিয়া আছে—মা তাহার অগাধ ঐশ্বর্য্যে সুখে আছে। স্বামীর এই কথাটা যতবার তাহার মনে পড়িল, ততবারই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়—কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে তিনি দেখেন নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছেন, —শুনিয়াছেন সে নাকি তাহার মায়ের মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে-ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিলেন, স্পষ্ট তেমন হইল না, তবুও রোগ-তপ্ত তাঁহার আপন মুখই যেন তাঁহার মানস-পটে বার বার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দ্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্ত্তিই যে তাঁহার কল্পনায় আসিতে যাইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই, এবং সমস্তই যেন সেই একটিমাত্র পাণ্ডুর, রুগ্ন

মুখখানিকেই সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না—সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দ্দিনে সান্ত্বনা দিবার বন্ধু নাই, বিপদে ভরসা দিবার আত্মীয় নাই—সেখানে দিনের পর দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অসুখে পড়ে—তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ পিতার পরলোকের ডাক আসে—সেদিন? কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! তাঁহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাঁহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাঁহার কাহারা হত্যা করিতেছে।

সবিতার চৈতন্য হইল যখন গাড়ি আসিয়া তাঁহার দরজায় দাঁড়াইল। উপরে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, বাবু বড় রাগ করচেন।

কখন এলেন তিনি?

অনেকক্ষণ। বড় ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

তিনি কখন এলেন?

একটু আগে। এখন হঠাৎ সে-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা ভ্রূকুটি করিলেন, কহিলেন, তুমি নিজের কাজ করো গে!

তিনি স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিলেন। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি দুপুরের পূর্ব্বেই বেরিয়েছিলেন—আজ আপনার খাওয়া পর্য্যন্ত হয়নি।

সবিতা কহিলেন, না তার সময় পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল আজ?

সবিতা কহিলেন, আমার কাজ ছিল।

কাজ সমস্ত দিন?

নইলে সমস্ত দিন থাকতে যাবো কেন? আগেই তো ফিরতে পারতুম।

রমণীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ি থাকো না— কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে?

সবিতা কহিলেন, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হোলো না?

বিমলবাবু বলিলেন, না, হোলো না। জ্যাঠামশাই একটু না সারলে বোধ করি যেতে পারবো না।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, তুমি তো তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্রেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন, তাই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না-থাকি সে আমি বুঝবো, কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া এক-পা বার হবে না আজ স্পষ্ট বলে দিলুম। শুনতে পেলে?

শুনিতে সকলে পাইলেন; বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু, আজ আমি উঠি—কাজ আছে।

না না, আপনি বসুন। কিন্তু এই সব বেলাল্লা-পনা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিলেন, বেলাল্লা-পনা তুমি কাকে বল?

বলি, তুমি যা করে বেড়াচ্চো তাকে। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে!

কাজ থাকলেও যাবো না?

না। আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ। অন্য কাজ নেই।

তাই তো এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয়?

অবিশ্বাস তাঁহার প্রতি কোনদিন হয় না, তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয়। তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পারে না? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারো না।

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইহাদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলে না, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে। আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো। আর তুমি আমার বাড়িতে এসো না।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে, কিন্তু সমস্তই এক-তরফা। হাঙ্গামা, চেঁচামেচির ভয়ে চিরদিন সবিতা চুপ করিয়া গেছে, পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে

যায়। সেই নতুন-বৌয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে। মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ি এ? তোমার? বলতে একটু লজ্জা হলো না?

সবিতা তাঁহার প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপরে আস্তে আস্তে বলিলেন, হাঁ, আমার লজ্জা পাওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি কথা বলেচো না, এ-বাড়ি আমার নয় তোমার—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে। তেরো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটি কপর্দ্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙিল, হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম?

হাঁ, আমি চলে যাবো!

চলে যাবো বললেই যেতে দেবো তোমাকে?

আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা কোরো না সেজবাবু, আমার সমস্ত শেষ হয়ে গেছে—এ আর ফিরবে না।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হুঁস হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল; ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেচি নতুন-বৌ এ-বাড়ি তোমার নয়, আমার রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায় না?

সবিতা কহিলেন, রাগের জন্য নয়। রাগ পড়ে যাবে—হয়তো দেরি হবে—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ি দান করার ক্ষতি তোমার সইবে না, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই ফুটবে যে, আমাদের দুজনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই ঠকেচো। দাঁড়ি-পাল্লায় একটা দিক যখন শূন্য দেখবে তখন অন্যদিকে বাটখারার ভার তোমার বুকে যাঁতার মতো চেপে বসবে—সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি; কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু, আর বোধ করি দেখা হবার আমাদের অবকাশ থাকবে না—আমি কালকেই চলে যাবো।

কোথায় যাবেন?

সে এখনো জানিনে।

কিন্তু যাবার আগে দেখা হবেই। আমি আবার আসবো।

সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চললুম। এই বলিয়া সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিমলবাবু কহিলেন, রমণীবাবু, আমারও নমস্কার নিন—চললুম।

৯

এতবড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকী রহিল না, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটের সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্ত্তা গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্য্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিল না। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে, সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। সহরে এত অল্পমূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবে না, তয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের কত ভাড়া বাকী পড়িয়া আছে এবং কতভাবেই না এই গৃহস্বামীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলা-বলি করচে মা ?

কি কথা সারদা ?

ওরা বলচে আজই এ-বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন।

ওরা সত্যি কথাই বলেচে সারদা।

সত্যি কথা ! সত্যিই চলে যাবেন আপনি ?

সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন ?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখানো স্থির করিনি, শুধু যেতে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচে না মা, ভাবচে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে। আমি ভাবতেও পারিনে মা, বিনা মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে কোথায় ভেসে যাবো। তবু ওরা যা জানে না আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ-বাড়ি আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেচে যে, সে আর সইচে না, কিন্তু যাবো বললেই তো যাওয়া হতে পারে না ?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারে না সারদা ? এ-বাড়ি আমার তেতো হয় উঠেচে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েচি ; কিন্তু বারো বছর

ভুল করেছি বলে আরো বারো বছর ভুল করতে হবে, এ আমি আর মানবো না—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার তো কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক্ আবার তোমার কাছে তাকে আসতেই হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে তো তোমাকে সহজে খুঁজে পাবে না মা।

সারদা নত-মুখে কহিল, না মা, তিনি আর আসবেন না।

এমন কখনো হয় না সারদা—সে আসবেই।

না মা, আসবেন না। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু অতি-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল, যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—কোথাও একলা চলে না, সঙ্গে দাসী একজন চাই—আমি আপনার সেই দাসী মা।

কি করে জানলে সারদা আমি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ-কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ-কথা আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ-কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, এ-কথা লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন—এমন কত ঘরেই তো হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হোলো না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্চেন। বড় ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারো থাকে মা?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারে না, সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়। সে হ'লে এ ছলনা কোনদিন-না-কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারে না, শুধু এইজন্যই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো, সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলেই করি। তাই কল্পনা করা দূরে থাক, ও কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জ্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

উপায় যদি না থাকে, আমাদেরও সঙ্গে না নিয়ে উপায় নেই। আর, আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড় ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা, তুমিও তেমন ঘর থেকে আসো নি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমি দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তা হলে দাসীর কাজ করবো না, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন, তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবে না মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহে না, কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পান না। তাহার পর সুদীর্ঘ বারো বছর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাহাকে ধীরে ধীরে অনেক কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে-সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে ঘুচিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্কবাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্ব্বিঘ্নে আশ্রয়-ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়তো আজ তাঁহার নাই! পুণ্যময় স্বামী-গৃহবাসের বহু স্মৃতি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নারীর অশুচি জীবন-যাত্রার ঘূর্ণাবর্ত্তে পাক খাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবে না। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হোক, সে-আশ্রয় বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য-হাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্ব্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে; খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত

অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে—তাহার লালসা-লিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যা-পার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা হতচেতন হইয়া রহিলেন।

মা ?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা ?

সত্যি-সত্যিই আজ চলে যাবেন না তো ?

আজ না হলেও একদিন তো যেতে হবে।

কেন যেতে হবে ? এ-বাড়ি তো আপনার।

না, আমার নয়, রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেন না, যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল, কারণ হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই, এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা তো সবাই জানি এ-বাড়ি তিনি আপনাকে দিয়াছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের একটুকু স্বত্ব আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক। লেখা-পড়া হয়নি ? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা ?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করচেন, এখন রাগের উপর যদি অস্বীকার করেন ?

সবিতা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবো না। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক-মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়িটাও যেতে বসেচে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয় না ? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন, একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিল না বলেই তো বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে এতবড় পাপের কাজে তো আমার সাহস হোতো না, কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়—কিছুই গ্রাহ্য

করেন না—এমনি কি ক'রে সম্ভব হয় মা! বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড নই মা; কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি নিজে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হোলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাতে তো গোলযোগ ঘটবে না মা?

সবিতা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর সারদা—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগ ঘটায় সাধ্য কার?

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিল না। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে তিনি সংবরণ করিলেন, তখন কি তিনি বলিলেন, কি তিনি করিলেন এইসকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

সারদার বিস্ময়ের সীমা নাই—নতুন-মার এতখানি আত্মবিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজী!

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন, কে মহাদেব?

দরওয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ি আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজবাবু আছেন, তিনি কখনো রাগ করবেন না।

কেহ সঙ্গে যায়, এ ইচ্ছা সবিতার ছিল না, বলিলেন, রাগ হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা?

সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ, আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার বেশী সাধ হয়েচে আমার রেণুর বাপকে দেখার—প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি-রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি-রকম মনে হয় সারদা? জমকালো ধরনের মস্ত মানুষ—না?

সারদা বলিল, না মা, তা মনে হয় না। কিন্তু তখন থেকেই তো ভাবছি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্চে না।

কেন হচ্চে না সারদা?

হচ্চে না বোধ হয় এইজন্য মা, তিনি তো কেবল রেণুর বাপ নন, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে মনে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচিনে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয়—একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে আসচে, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্ণ—এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

না মা, হয় না। আপনার হয়?

না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ-অপছন্দের জিনিস নয়, তাঁকে নির্ব্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হোলো শাস্ত্রের বিধি, মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই ক'রে যারা সত্যি ক'রে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জেলে জীবনের পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার-যাত্রায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দুদিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, বুঝিল, এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জ্জনা ভিক্ষা। ইচ্ছা হইল না প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বেদনা বাড়ায়, কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, বলিল, একটা কথা ভারি জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাও না—এই তো? আর লজ্জা বাড়বে না সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচে না। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়তো জানতেও চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেক দিন অনেকরকম ভেবে দেখচি, কিন্তু আমার গত জীবনের কর্ম্মফল ছাড়া এ-প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্ম্মফল মানে, তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক-জন্মের অজানা কর্ম্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ-জন্মের

ভাঙা বেড়ায় ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্ছি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলোক-ধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেচে বলো তো? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম, আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?

এবার সারদা কথা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেননি মা?

না মা, সেদিনও না—কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হোলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্‌কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম, আজ হয়তো সর্ব্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দু'চোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাইনি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি, নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের 'পরে! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এম্‌নিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিল না, মাথা নাড়িয়া বাঁধা-রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তর অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিল না এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা?

সবিতা উত্তর দিলেন না, আর তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাইরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ি কালকের মত অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ির সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল, পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

এই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারংবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন

ইহা লজ্জাকর, হয়তো এ-অশ্রুর কোন মর্য্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইল না, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া রহিলেন।

১০

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আপ্রান্ত আলোড়িত সাগর-জল কিছুতেই যেন শেষ হইতে চাহে না। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না, দুর্ব্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারে না, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল; কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে তাই বোধহয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল—বোধ হয় যা মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

ভাল আছি।

জ্বর আর হয়নি?

না, আমি তো টের পাইনি।

ডাক্তার এখনো আসেননি?

না, তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কই রাখালবাবুকে তো দেখচিনে? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, তিনি পড়াতে গেছেন।

তোমার বাবা?

তিনি সকালে বেরিয়েচেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল, এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেক সঙ্কোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেচো রেণু?

চিনবো কি করে, আমার তো মুখ মনে নেই।

বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচিনে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, আমার নাম সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনও বলেননি?

না। এ-সব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা তো উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো কথা সে খুঁজিয়া পাইল না। মিনিট-খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল, কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোয়ার জল এনেছি—উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র। তার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট-কয়েক পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং সুমুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের জায়গা করে রেখেছি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোণ দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন, আপনি চার-পাঁচদিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধূলোয়-জলে লুটোপুটি করে একাকার হয়েচে, সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদাদিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু আমার এ রকম শক্ত হোলো কেন মা? ছেলেবেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়া-গাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়েকদিনের জ্বরে তাহার এলোমেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠে চাপা রহিল। কথা বাহির না হোক, কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাঁহার অজানা নয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন, মেয়ে তাঁহাকে নীচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধি গে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো, না খেয়ে নিস্তার পাবেন না।

নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্ব্বল, এখনো পথ্যিই করোনি।

রেণু বলিল, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি, আজ আর কিছু খাবো না। একটু দুর্ব্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোক খেতে পাবে না যে। তা ছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্ছো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধে-ছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ-কথার উত্তর আসিল না; সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে তো রেণু!

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোধ হয় হবে না—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদাদিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে তো? আমাদের করবার তো আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত-আটদিনের উপবাসে একান্ত দুর্ব্বল। মেয়েটা মরিয়া মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ-জীবনে পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধ করি সবিতার আর কিছুতে মিলিত না যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পুজো-আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদাদিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন, এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন উপবাস করে থাকলেই আর দোষ হয় না। সত্যিই নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ-কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায়

তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মার বেলা সইতো না, খেতে একটু দেরি হলেই তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, দেশের বাড়িতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হোতো না, উপোস করে কাটাতে হোতো তার সংখ্যা নাই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেননি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন'বচ্ছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে—পারবে তো মা? বললুম, পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পূজো না হওয়া পর্য্যন্ত আমি বাড়িতে না-খেয়ে থাকি; কিন্তু আজ থাকতুম না মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিল না ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্ম্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়ম-পালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকুই বা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্যক্ত-চিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার-তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই তো! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়তো বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনায় বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটিই হয়তো তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝে নাই, তাহার কতদিনের কত মুখভার, চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তিহীন দিন, কত বেদনা বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা হীনা, কোপনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্যে ও শাসনে এই দুটি প্রাণী স্ব—

তাহার স্বামী ও কন্যার দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দ্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জন্য? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাঁহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে, সে দোষ কি তাহাকে দিবার? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার? অধর্ম্মের মার যে এমন নির্দ্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্ত্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্ব্বে এমন করিয়া আর তিনি উপলব্ধি করেন নাই! গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথাপি প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইহার প্রতিকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী তো কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর? কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না!

মা, বাবা এসেচেন!

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি সমস্ত বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এত দেরি করলে যে? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে। দেখো তো বেলার দিকে চেয়ে?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভভাবে বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন; সবিতা বলিলেন, কিন্তু আর বেলা করতে পারবে না। ঠাকুর-পুজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি!

তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দে তো মা আমার গামছাটা, চট্ করে নেয়ে আসি।

না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েচে, আমি তামাক সেজে দিই!

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের উপর এত দরদ আর কারও হয় না! নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠকলে! এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিলেন, ঠকতে আপত্তি নেই মেজকর্ত্তা, কিন্তু এই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগে না, মাও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত-বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া

তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস্ দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে ?

হাঁ।

মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনি তো ?

না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরীবের ঘর, কিছুই নেই। হয়তো তোমার কষ্ট হোলো নতুন-বৌ।

সবিতা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, সে হবে না মেজকর্তা, তুমি আমাকে কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে তো শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবুর মুখ দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বলছিলুম, আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে !

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকতো। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধ হয় তিনিই টেনে এনেচেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেননি। বলিতে বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জ্জনা করেন না মেজকর্তা ?

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

কিন্তু কি করে জানতে পারবো ?

তা জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধ করি তিনিই দেন !

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

দিলেন ?

কি জানো –

সে শুনতে চাইনে, দিলেন কি-না বলো ?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের তো জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্ম্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েচে যে, মানুষ ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠে না। তাছাড়া নন্দ সা

এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েচে ভাইপোদের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

সে আমি জানি। কেন-না ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবো না। নন্দ সাকে আমি ভুলিনি।

কি করবে—নালিশ?

হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই?

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখচি এক তিলও বদলায়নি।

কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেচে নাকি? দুঃসময় কার বেশি তোমার চেয়ে। কিন্তু কাকে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দ্দক দিয়ে শোধ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটা পর্য্যন্ত আদায় দিয়ে তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

রাগ তো নয়, আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মচারী, স্ত্রী পর্য্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লে না। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনে না, কিন্তু তারা চেনে!

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙায় তুলিয়াছিল। বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেচে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাব্‌বে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়তো গয়ায় পিণ্ডি দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিলেন, তারা যা ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু তুমি পিণ্ডি দিতে না ছুটলেই হোলো—ঐখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবে না তো সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

উত্তর দিলে না যে?

ব্রজবাবু আরও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। অপরাহ্ণ সূর্য্যের কতকটা আলো জানালা দিয়ে মেঝের উপর রাঙা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি সবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এর মতোই আমার বেলা পড়ে এলো নতুন-বৌ, পাওনা বুঝে নেবার আর সময় নেই। কিন্তু তুমি ছাড়া সংসারে বোধ হয় আর কেউ নেই যে বোঝে আমি কত ক্লান্ত। ছুটির দরখাস্ত পেশ করে বসে আছি, মঞ্জুরি এলো বলে। যা নিয়েচি, যা দিয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ হয়ে গেছে। হিসেব ভালো হয়নি জানি, গোঁজামিল অনেক রয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার জের টানতে আর আমি পারবো না। তোমার এ অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।

সবিতা একদৃষ্টে চাহিয়া শুনিতেছিলেন স্বামীর কথাগুলি, শেষ হইলে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি আর পারবে না মেজকর্ত্তা? সত্যিই কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচো?

সত্যিই বড় ক্লান্ত নতুন-বৌ, সত্যিই আর পারবো না। কত যে ক্লান্ত সে তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না ; তারা বলবে আলস্য, বলবে জড়তা, ভাববে আমার নিরাশার হা-হুতাশ। তারা তর্ক করবে, যুক্তি দেবে, মেরে মেরে এখনো ছোটাতে চাইবে—তারা এই কথাটাই কেবল জেনে রেখেচে যে, কলে দম দিলেই চলে! কিন্তু তারও যে শেষ আছে এ তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করলে তুমি খুশী হবে?

খুশী হবো কি না জানিনে, কিন্তু শান্তি পাবো।

কি এখন করবে?

রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাব। সেখানে সব গিয়েও যা বাকী থাকবে তাতে কোনমতে আমাদের দিনপাত হবে। আর যারা আমাদের ত্যাগ করে কলকাতায় রইলো তাদের ভাবনা নেই, সে তো তুমি আগেই শুনেচো।

রেণুর ভার কাকে দিয়ে যাবে মেজকর্ত্তা?

দিয়ে যাবো ভগবানকে। তাঁর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই, সে আমি জেনেচি।

সবিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। ভগবানে তাঁহার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অতবড় নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হইতেও পারেন না। শঙ্কায় বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিয়া উঠিল; কিন্তু ইহার উত্তর যে কি তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না। শুধু যে-কথাটা তাঁহার মনের মধ্যে অহরহ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল তাহাই মুখে আসিয়া পড়িল, বলিলেন, মেজকর্ত্তা, আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে কি আমার অপরাধের দণ্ড দিতে? প্রতিশোধের আর কি কোন পথ খুঁজে পেলে না?

ব্রজবাবু কহিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও? আমাদের রতন খুড়ো ও রতন খুড়ির কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজি আছ? এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিলেন, সলজ্জে কহিলেন, ছি ছি, কি কথা তুমি বলো।

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলামাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিলেন, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা?

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল একটুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমোট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে, সেদিনই আমি স্থির করেছিলাম, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার যা-কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেন না উভয়ের দেখা হয়—সকল সম্বন্ধ যেন এই-খানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিলেন, আমি বুঝেচি মেজকর্তা। ইহ-পরকালে আর যেন না তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়—এই তো?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে-আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল, সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্র-গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর তিনি চাহিয়া দেখিতে পারিলেন না, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কবে বাড়ি যাবে মেজকর্তা?

যত শীঘ্র পারি।

এখন যাই তবে?

এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝিলেন সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পনের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ-স্তূপ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্দ্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, আজিকার পূর্ব্বে এ-কথা তিনি কবে ভাবিয়াছিলেন।

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াই সবিতা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, মুক্তি পাবে না মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেচো, কিন্তু আমাকে পারলে না। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়তো তা জানতে পারবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময় রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এই নীরবতার মন্ত্র সেও হয়তো তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়িতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা, একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমরা বাড়ি চলো।

১১

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়িতে আপনি তো যাবেন না—আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধুলো দেন।

কেন রাজু?

কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজি হয়েচেন আসতে।

কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেচেন?

তিনি না ডাকুন আমি তো ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেচেন গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন ব্রজবাবু কোথাও কিছু খান না, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে—বোধ হয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনে দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র-চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা, আমি যাবো না। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে, ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়ি-ভাড়ার আয়ে দিন ভালোই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি তো রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, বারো বৎসরব্যাপি প্রতিদিনের সম্বন্ধ, অথচ কত শীঘ্র কত সহজেই না ঘুচিয়া যায়। তাঁহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙে সেদিন সকালেও তিনি জানিতেন না, রাত্রিটাও কাটিবে না, সমস্ত ছাড়িয়া তাঁহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সবিতা কি কল্পনা করিতে পারিতেন এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু সহিল তো? আবার সহিল তাঁহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল আজও তিনি তেমনি বাঁচিয়া আছেন—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল, কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিল না।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল আজও তাহার কারণ নিজে জানেন না। যতই ভাবিয়াছেন, আত্মধিক্কারে জ্বলিয়া-পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছেন

ততবারই মনে হইতেছে ইহার অর্থ নাই—হেতু নাই, ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিংবা, হয়তো এমনই জগৎ—অঘটন অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোতে আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে, নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাস মিলে না।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করেন না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবেন, নিষেধ করামাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল! নিরবিচ্ছিন্ন একত্র-বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল!

হয়ত এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই। কেবল ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাঁহার মেয়ের মতো, মায়ের মতো। বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চেনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে! সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল, কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এই-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙিয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে।

আরও একজন আসিয়াছেন, তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই—দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্য্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করেন। ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্ত্তের মিনতি, নাই উন্মাদের ব্যাভিচার—শঙ্কা শুধু তাঁর এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এইমতো—

পূবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলেন, ভালই তো আছি।

কিন্তু ভালো তো দেখাচ্চে না? কেমন শুকনো শুকনো।

কই না।

না বললে শুনবো কেন? খাওয়া-দাওয়ার কখনো যত্ন নিচ্ছেন না। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন—দুদিনেই ভেঙে পড়বে যে।

না ভাঙবে না, শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বালাই হয়ে উঠেচে। এটাকে ভেঙে ফেলাই এখন দরকার—না? সত্যি কি—না বলুন তো?

সবিতা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

বিমলবাবু বলেন, গাড়িটা পড়ে রয়েচে, মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন, বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যান না কেন?

বেড়াতে আমি তো কোনকালেই যাইনে বিমলবাবু!

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন, তা বটে! বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

না।

কালও আসেননি তো?

না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়তো কোন বাজে কাজে ব্যস্ত আছে।

বাজে কাজে? ঐ তার স্বভাব, না?

হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কই, আজ আমাকে জল দিলে না মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে তৃপ্তি হয় না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, আজ তা হলে আসি!

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ান, নমস্কার করিয়া বলেন, আসুন।

দিন-তিনেক পরে এমনিধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিলেন, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখুনি যেতে পাবেন না, বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিলেন, কেউ বলেনি, এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ—মিছে সময় নষ্ট হয়তো?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে; কিন্তু এইজন্যই কি কখনো বসতে বলেন না? সত্যি বলুন তো?

এ-কথা সত্য নয়, কিন্তু এই বলিয়া সবিতা বাদাহুবাদ করিলেন না, বলিলেন, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয় ?

হাঁ, প্রায়ই হয়।

তিনি আর এখানে আসেন না—আপনি জানেন ?

জানি বই কি।

আর তিনি এ-বাড়িতে আসবেন না ?

সে-কথা জানিনে। বোধ হয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আজ সকালের ডাকে একটা দলিল এসে পৌঁছেচে। এই বাড়ি রমণীবাবু আমাকে বিক্রী কবলায় রেজেস্ট্রী করে দিয়েচেন। আপনি জানেন ?

জানি।

কিন্তু দেবার ইচ্ছাই যদি ছিল, সোজা দান-পত্র না করে বিক্রী করার ছলনা কেন ? দাম আমি দিইনি।

কিন্তু দান-পত্র জিনিসটা ভালো না।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানি বিমলবাবু! আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিন আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দিলে এমন সব কথা লিখতে হতো যে, যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ভালো।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলেন নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন ? সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইল না তিনি খুশী হইলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটিই আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েচেন, কিন্তু কেন দিলেন ? তাঁর দান নেওয়ায় তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন ?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু!

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েচি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়িটা আপনার কিনে রেখেচি।

টাকা তিনি নিলেন?

হাঁ, ভেতরে ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেন না।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ-ক'টা টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকী রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন, কিন্তু আমি নেবো কি বলে?—না, সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবো না। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয় না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে, কিন্তু সে কথা যাক! এখানে আর কেউ নেই, শুধু আপনি আর আমি। আমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্য? এই কি আপনার মনের কথা?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন? জানিয়ে লাভ নেই।

লাভ নেই তাও জানেন?

হাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাঁহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সম্বরণ করিয়া কহিলেন, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু?

না, জানিনে। শুধু যা ঘটেচে—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশি নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিলেন—যা ঘটেচে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু—ও দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন তো সত্যি করে?

তাঁহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসঙ্কোচে বলিলেন হাঁ, ও দুটো এক নয় নতুন-বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেচি ও দুটো এক নয়।

ইহার অর্থ-টা যদিচ স্পষ্ট হইল না, তথাপি কথাটা সবিতার অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিলেন, শুনেচেন তো

আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম—আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি তো ভালো মেয়ে নই—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি, এ-কথা কি আপনার মনে আসে না?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদি-বা আসতে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হোলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেচে, অতএব ওর এ-ই করা চাই, এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশি পড়েছি নতুন-বৌ।

পড়ালে কে?

সে তো একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাস্টার বদল হয়েচে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাস্টার যিনি, আড়াল থেকে এ দের যিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে তো দেখিনি, কি করে আপনার কাছে তাঁর নাম করবো বলুন?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, আপনি বোধ হয় খুব ধার্ম্মিক লোক, না বিমলবাবু?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্ম্মিক লোক আপনি কাকে বলেন? আপনার স্বামীর মতো?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তাঁকে কি চেনেন? তাঁর সঙ্গে জানা-শুনো আছে নাকি?

বিমলবাবু তাঁহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতুহল দমন করতে পারলুম না, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্ত্তাও অনেক হোলো—না নতুন-বৌ, ধর্ম্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েচেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেচেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধার্ম্মিক লোক আমি নই।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ-কথা বুঝিতে তাঁর বাকী নাই, সমস্ত কৌতুহলের মূল কারণ তিনি নিজে। থামিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, ওখানে মিল না থাক্, কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবো না, দেবার এখনো সময় আসেনি।

অন্ততঃ বলুন এ-কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি করে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি তো? কিন্তু ছেড়ে চলে তো আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

এ-ও শুনেচেন ?

শুনেচি বইকি।

সমস্তই ?

সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভাসিল, কহিলেন, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। একটু পরে বলিলেন, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসেন কি ক'রে বলুন তো ?

ভালোবাসি এ-কথা তো আজো বলিনি নতুন-বৌ।

না, বলেননি বলেই তো এ-কথা এমন সত্যি করে জানতে পেয়েচি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে ? বয়স হয়েচে, রূপ আর নেই—বাকী যেটুকু আছে তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষ কি ভাববে ?

বিমলবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়তো সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েচে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়তো পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ-যৌবনের লোভে নয়, এ-কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ, এ-কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে ? কি করবেন আমাকে নিয়ে ?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল।

সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমায় ?

জবাব নেই নতুন-বৌ! শুধু জানি আপনাকে আমি পাবো না—পাবার পথ নেই আমার।

কেন নেই ? কি করে বুঝলেন সে-কথা ?

বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্য্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিল তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে। একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে-পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন, শুধুই ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেননি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বই কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো— তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকী নেই, ভালোবাসার ধনকে ছোট করে রাখা যায় না —তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকে তো এমনি হারতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিলেন, এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ—এখন এই আমার ব্রত, এ থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেছি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেছি। কি করে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকী কিছু নেই, এর পর আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ। জানি ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবো না, আবার তার চেয়েও বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই তো বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়িটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়!

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন, কত কথাই যে তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দ্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিলেন, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমলবাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দু'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন— বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছল ছল করিতে লাগিল, কহিলেন, আপনার পরিচয় পেতে আর বাকী নেই বিমলবাবু, চোখের এ দৃষ্টি আর ইহজীবনে বদলাবে না। শুধু আশীর্ব্বাদ করুন, যে দুঃখ নিজে ডেকে এনেছি তা যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে আমি বসবো না, শুধু প্রার্থনা করবো, যেমন করেই এসে থাকো এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

কিন্তু চিরস্থায়ীই তো হয়ে রইলো।

তা জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকী আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্ব্বাদ যদি তোমাকে করতেই হয়, এই আশীর্ব্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিলেন না, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন তিনি তুলিলেন তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাঁহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে ; মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তারক বর্দ্ধমানের কোন একটা গ্রামে মাস্টারি করে, সে আমাকে ডেকেচে। যাবো দিনকতক তার কাছে ?

যাও।

তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে ?

থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আফিস খুলেচি, তার অনেক কাজ বাকী।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, টাকা তো অনেক জমালে—আর কি করবে ?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবু হাসিলেন, বলিলেন, জমাইনি, এগুলো আপনি জমে উঠেচে নতুন-বৌ—ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি সময় হলে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন, বলিলেন,—এ-বাড়িটায় আর আমার দরকার ছিল না—ভেবেছিলুম ভালোই হোলো যে গেলো। একটা ঝঞ্ঝাট মিটলো ; কিন্তু তুমি হোতে দিলে না। ভাড়াটেরা রইলো, এদের দেখো।

দেখবো।

আর একটি অনুরোধ করবো, রাখবে ?

কি অনুরোধ নতুন-বৌ ?

আমার মেয়ে আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন, কিছু বলিলেন না। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিলেন না, কিন্তু বুকের মধ্যে আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইলেন, সে স্বামীর উদ্দেশে, না বিমলবাবুকে, বোধ করি নিজেও জানিলেন না। একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো—

সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়িতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো তো?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েচেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি করেই বোধ করি সে-বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বার-কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা? উঠতে হবে?

সারদা ভারি অপ্রতিভ হইয়া বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না, কখ্খনো না! দেরি হয়ে গেছে আপনার—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবো না মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চললুম।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিলেন না।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

১২

রমণীবাবু আর আসেন না, হয়তো ছাড়াছাড়ি হইল। দুজনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায় না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ—পূর্ব্বের তুলনায় কত না প্রভেদ। জ্যৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়, তৃণ-শস্পে, গাছে গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতায়, তেমনি জলে-স্থলে গগনে পবনে সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায় আচরণে উগ্রতা ছিল না তাঁর কোনদিনই, তথাপি কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ির মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো, কাহারো ভালোতেও না, মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার কলঙ্কিত পথে নতুন-মার সকল কালি যদি এত-দিনে ধুইয়া যায় তো শোকের পরিবর্তে তাহারা উল্লাস বোধই করিবে। এ যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্ম্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না থাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায়। আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসিমা, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হোলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো—তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবে না, মা বলে দিলেন।

তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেন না সারদা?

যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ি ছেড়ে বেশিদিন কোথাও থাকবেন না বললেন।

আনন্দে পিসিমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলবাবু বিদায় লইবার পর সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশী সময় লাগিত না, কিন্তু এখন লাগে দু-তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে, কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তার পরে কুণ্ঠিত-স্বরে কহিল, না-জানি কত ভুল-চুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুল-চুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটা তো কিছুই এগোয়নি দেখচি।

না। সময় পাইনি যে।

পাও না কেন?

কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

নতুন-মার দাসী-চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলো না কেন তোমারো সময়ের দরকার, তোমারো কাজ আছে! এ কিন্তু ভারি অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেব্‌তা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ

পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটে না। এত রোগা দেখচি কেন বলুন তো?

রাখাল বলিল, রোগা নই, বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয় তো কি! হোলো জ্বর, তাও ঢাকতে হোলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

কাজে লাগবে না। তুমি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে, এ-সব কিছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। এক ছত্রও আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না তো আমার ধার শোধ দেবে কি করে?

ধার শোধ দেবো না—ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো; কিন্তু সাহস করিল না। বরঞ্চ একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারো না ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হয়রাণ করার আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা এখান-সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রা-দলের বক্তৃতা। এ-সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশি হইল বিপদাপন্ন, বস্তুতঃ লেখাগুলো তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারী-দের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করে না, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায় না যে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সঙ্কুলান হয় না। তাহার ইচ্ছা নয় যে, উপার্জ্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারি লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল, নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল হয়তো তাহা সত্য নয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়তো বা তাহার চেয়েও—রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা—যতটা জানে আইন-স্টিনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সকোল্লিজের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় পাছে গর্ত্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই-জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল, আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমনি দুষ্টু হয়ে উঠলে কি ক'রে?

সারদা হাসিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি?

ওঠোনি? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি?

বলচি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেননি কেন?

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশী। এ-কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন, সে-ও ছিল শয্যাগত। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েচে সাগু-বার্লি তৈরী। শুনি আপনার বন্ধু-বান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন?

প্রশ্নটা রাখালের নতুন নয়—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল—এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সংসারে বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত, দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব?

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা যাবেন আমার সেই পচা এঁদো-পড়া বাসায় সেবা করতে? তুমি কি যে বলো সারদা, তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুস্থতার সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলে না। শুনে নতুন-মা বললেন, রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন যুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা করে, নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টার জল কল থেকে আনতে, উনুন জ্বেলে আপনি করলে ক্ষিধের পথ্যি তৈরী, ও ওষুধ পেলে না আপনার লোক নেই বলে। কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন মা—আমাকে তার বিশ্বাস তো নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম করে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে—তাকে দিইনি তো। বলিতে বলিতে সারাদার চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেব্‌তা? কেরানীগিরি করে আজও টাকা শোধ দিইনি, সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো করেই তুলচো। জ্বর কি কারো হয় না? দুদিনেই তো সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারি খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেন না,

হাসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে তো এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তাও আপনার সইলো না। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেন না? কি করেছিলুম আপনার? এ-জন্মের তো দোষ দেখিনে, একি গত জন্মের দণ্ড নাকি?

রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক্ হইয়া ভাবিল এই মুখ-চোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্‌ভা করিয়া দিল কিসে।

সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জ্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না। বলিতে লাগিল, জানেন দেবতা, জানি আমি, কেন আপনি আজো বিয়ে করেননি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারি ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেচেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতির নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার হোলো কি বলো তো?

সত্যি আজ আমার ভারি রাগ হয়েচে।

কেন?

কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন?

দিলেই বা কি হোতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না তো কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

ফিরে আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি। আপনি বলবেন তুমি জানলে কি করে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না তো সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ-ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হোতো আমার দোষের, কিন্তু এ-বাড়িতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন—যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন তো?

এ কি তামাসা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কথনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে

সে লজ্জা বাড়িবে বই কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোনমতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে তো অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে ?

সারদা কহিল, বলার তখন তো দরকার হোতো না, কিন্তু আজ এলে তাঁকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো সে যে কত সয়েচে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেচে। নিজের নয়—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার 'পরে আর কারো দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেব্‌তা, হাসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞাসা করেচেন, তুমি কোথায় যেতে চাও, উত্তরে আমি বার বার কেঁদে বলেচি, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেইখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝ পথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে চোখে দেখিনি, শুধু বাড়ির লোকের মুখে তাঁর নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নন ? সবই মিথ্যে ?

হাঁ, সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নন।

তবে কি তুমি বিধবা ?

হাঁ, আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো ?

রাখাল কহিল, না সারদা, আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জায় সঙ্গে চুপ করিল। তখনই বুঝিল এ অনধিকার-চর্চ্চা, এ তাহার আপন অপমান। একি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল!

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হাঁ, তিনি আমার মা-ই তো। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কি-না বলতে চাও না, অন্তত তাঁদের কাছে যে যাবে না এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কি এখন করবে ?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা ?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি তো নয়—মায়ের সেবা। অন্ততঃ বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকী, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সেই-সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সারদা বলিল, যত টাকার দরকার হোক, আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে তো ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিয়া বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবে না—ঘুষ দিয়ে লোকে বলে না—আমার লজ্জা কিসের ?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয় ; কিন্তু আবার সাহসে বাধিল—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

মার আহ্নিক কি শেষ হয়েচে ?

হাঁ, হয়েচে ; বলিয়া ঝি চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে ?

রাখাল কহিল, তুমি যাও, আমি পরে যাবো।

পরে কেন ? চলুন না দুজনে একসঙ্গে যাই। বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি সে রসে, মাধুর্য্যে নিবিড় হইয়া উঠিল, সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন ? বক্ষের নিগূঢ় অন্ত-স্তলে এ কে কথা কয় ? কি বলে ? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন ? কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্য্যে গল্পে-গানে হাসিতে কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই —মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে বিস্ময় আজ মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায়

তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই? এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে সে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন বৃহত্তরের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক-প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু-সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপালে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়—গাড়ির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তার পরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখে সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে যে তাহার হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ। সেই দু'চোখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবো না দেব্‌তা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল—অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু, মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেঠা উল্টাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধূলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না আসার কথা, তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেন না, শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধ-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা আমাকে মার্জ্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেচি তত আপনার রেণুও না। তার পরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদ্‌লে—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর তো সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেচেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরওয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখোনি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস তো নেই, দুঃখের দিনে মনেই পড়ে না মা, ত্রিসংসারে আমার কোথায় কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেন না—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়াল হইতে বোধ হয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেব্‌তাকে খেয়ে যেতে বলুন না মা, সেই তো বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বললেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই তো বলতে পারো মা। তার পর স্মিত-হাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রাঁধাতে হয় এ যেন ও সইতে পারে না—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন এ কথা সারদা একটি দিন ভোলে না।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন স্ত্রীকে যে কি করে তার স্বামী ফেলে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন! এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেন না।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চারদিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন, ওর না আছে বাড়ি-ঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জ্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম, কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু'বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেন না।

সারদা বলিল, কিন্তু দিলে?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরী হইয়াছে। রাখাল বুঝিল এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরি করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেচে দিন-কয়েক গিয়ে তার ওখানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেছে নাকি!

চিঠিতে নয়, দিন-দুয়ের ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে। যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায়? কই আমি তো জানিনে!

সবিতা বলিলেন, জানো না? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দুটো দিনের ছুটি কি না?

রাখাল আর কিছু বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তার মনে পড়িল অসুখের পূর্ব্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বলিয়াছে, ইদানিং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়িতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

১৩

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে আসিয়াছিল, ভারি অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেব্‌তা?

থাবো বই কি। যেদিন বলবে।

তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ তো খাওয়ায় মধ্যে নেই দেব্‌তা, দোষ আছে চুপি চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনে।

সত্যি পারো না, না, বলতে হয় তাই বলচো?

অত জোরের জবাব আমি দিতে পারবো না, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠল, বলিল, বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশী নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে কেহই লক্ষ্য করিল না। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি ভেবেছিলুম হয়তো আপনার রাত হবে, কিংবা হয়তো ভুলেই যাবেন, আসবেন না।

ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসি-মুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহুল্য কিছুতেই নাই। রাখাল খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এমনই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আর পাঁচজনের মতো যত্ন দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে! কত জিনিস হয়তো ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করোনি।

সারদা কহিল, জিনিস তো আমার নয় দেবতা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হোতো না, হয়তো করতুমও—নষ্টও হোতো।

ভালো বুদ্ধি তোমার!

ভালোই তো! নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অন্যায় তো কম নয়। দেনা শোধ করে না, আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, টাকার দাবী আমি ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করিতে হবে না, ভাবতেও হবে না। কেবল খাতাটা দাও, আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তা হলে ছাড়া-রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেন না, আমিও না। অভাবে যদি মরি তবুও না। কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারি দুষ্টু সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলে না?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেব্‌তা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে, কেউ চিনতেই পারে না।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক্, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যই আমাকে তিনি চিনতে পারেননি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিল না।

রাখাল কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল?

উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা, আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

বললে ভার নিতে?

নিতুম বই কি। ভেবেছেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষে, মেয়েরা পারে না? পারে। আর দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়!

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো তো আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এইজন্যে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুম না তো—আজও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, দেব্‌তা, আপনি বিয়ে করেননি কেন? সত্যি বলুন না?

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে। সেদিনও জিজ্ঞেস করেছিলুম, আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবো না, আপনাকে বলতেই হবে।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজে বিয়ে করে। আমার হয়নি দেবার লোক ছিল না বলে। আর নিজে সাহস করিনি গরীব বলে। জানো তো, সংসারে আপনার বলতে আমার কিছু নেই।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্যায় কথা দেব্‌তা। গরীব বলে কি মানুষের বিয়ে হবে না? তার সে অধিকার নেই জগতে, তারা এমনি আসবে আর যাবে, কোথাও বাসা বাঁধবে না? কিন্তু সে তো নয়, আসলে আপনি ভারি ভীতু লোক—কিছু সাহস নেই।

রাখাল তাঁহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, হয়তো তোমার কথাই সত্যি, হয়তো সত্যিই আমি ভীতু মানুষ—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই।

কিন্তু ভাগ্য তো চিরকালই অনিশ্চিত দেব্‌তা, সে ছোট-বড় বিচার করে না, আপন নিয়মে আপনি চলে যায়।

তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা—তাই! নিজেকে তো বদলাতে পারবো না সারদা!

না-ই বা পারলেন। যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে যে সে—নইলে কিসের স্ত্রী? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে।

করতেই হবে নাকি?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে, নইলে কিছুতেই আমি ছাড়বো না; এখুনি বলছিলেন কেউ ছিল না বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিনে আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরীবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও যা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়। কাঙালের মতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্যেই ভগবান গরীবের সৃষ্টি করেননি এ বিদ্যে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিদ্যে শিখতে যদি সে না পারে—শিখতে না যদি চায়, তখন আমার দুঃখের ভার নেবে কে সারদা? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো?

সারদা অবাক্ হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ-কথা সে বুঝবে না, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমন হতেই পারে না দেব্‌তা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবো না।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিল না যে, মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায় না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহারে মন দিয়াছে দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, কিছুই তো বললেন না দেব্‌তা?

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে? ভাবতে সময় লাগে যে!

সময় তো লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি?

সে-কথা আজই বলবো কি করে সারদা? যেদিন নিজে পাবো, উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল। ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে, আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা ঘন নিশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি?

সারদা সলজ্জে মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু না তো! একটু পরে বলিল, পরশু বোধ হয় আমরা হরিণপুরে যাচ্চি দেব্‌তা।

পরশু? তারকের ওখানে?

হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়িতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যাওয়া স্থির হোলো কি ক'রে?

কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

তারক এসেছিল কলকাতায়? কই আমার সঙ্গে তো দেখা করেনি।

একদিন বই তো ছুটি নয়—দুপুরবেলায় এলেন, আবার সন্ধ্যার গাড়িতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেব্‌তা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দে িইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর। বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারি বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেন না দেব্‌তা।

রাখাল স্বীকার করিল, না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্ব্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেননি। তারকবাবু বলছিলেন, চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ-কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন? তার জবাবটা হয়তো আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ, জিজ্ঞেসা করবো; কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের -আসলে সত্যিও নয়, তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ওপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? ও সন্দেহ তোমার হোলো কি করে?

কি জানি কি করে হোলো, কিন্তু হয়েচে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিল না।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট জায়গায় ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েচে সঙ্কুচিত, বুদ্ধি রয়েচে মাথা হেঁট করে, তাই সহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার, না তার সারদা?

না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। যাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

শুনে নতুন-মা কি বললেন ?

শুনে মা খুশীই হলেন। বললেন, তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

করবেন কি করে ?

সারদা বলিল, শক্ত নয় তো দেব্‌তা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন তো কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য্য কি ?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানে না। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন, আমি বলচি।

মিনিট-কয়েক পরে হাত-মুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তার পরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন ?

চলে গেছেন ? কই না ! কোথায় গেছেন ?

কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন, কিন্তু এখানে আর আসেন না। যেতে তাঁকে হোতোই –এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিল না—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল করে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছ থেকে জীবনবাবুও যাননি। এই বলিয়া সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই, কিন্তু উপলক্ষ হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন, আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায় মাকে ভেঙে পড়লো, এ ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই-ই, নইলে বাঁচবো না। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তার পরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ি, কিন্তু সব খালি, সব শূন্য। নোটিশ ঝুলছে বাড়ি ভাড়া দেবার। জানা গেল না কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলেচে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম—এ-ছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি ?

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে – বললেন, চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটীপতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না, সে হবে না। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে-কথা মা না জানতেন তা নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ দেখানো ছিল বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হোলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, কথাগুলি মৃদু, বললেন, অনধিকার-প্রবেশে অন্যায় হোলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলাম না। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন, ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছুকাল আগে ছবি আপনার দেখেচি, আর আজ দেখচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমি বুঝি। এ চলতে পারে না, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে আমার। হাওয়ার শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্ব্বের দেহ আবার ফিরে আসবে—চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেন না?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় তো নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যেতে পারবো না।

তার পরে শুরু হোলো অপমান আর কটু কথার ঝড়! সে-যে কত কটু আমি বলতে পারবো না দেবতা। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে যেখানে যত ছিল নোঙরামির আবর্জ্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলো না যে, মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সতীর মুখোস পরে ছদ্মবেশে রয়েচে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম, পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এতবড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেবতা!

রাখাল নিষ্পলক-চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্ত্তি! রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কিনা বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কণ্ঠস্বর পূর্ব্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙেচে। আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে, আর যেন না আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ি কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ি আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো; কিন্তু এ-জবাব রমণীবাবু আশা করেননি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হোলো—ভয় পেয়ে নানাভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েচে, কিছুতেই সে আর ফিরবে না।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল!

রাখাল কহিল, তারপর?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেবৃতা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মার অপমান তাঁর কি যে লাগলো—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ি কিনে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হোতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুশী করিতে পারিল না, তাহার মন যেন দমিয়া গেল; বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়তো তাঁর কাছে কিছুই নয়—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া তো তাঁর প্রকৃতি নয়।

সারদা বলিল, হয়তো তিনি পর নয়, হয়তো নেওয়ার চেয়ে না নেওয়ার অন্যায় হোতো ঢের বেশি।

রাখাল বলিল, এ ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হোলো, আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়তো দেখা হবে।

সারদা তড়িৎবেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন করে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবো না।

তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হোলো যে—যাবো না?

যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেন না?

আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার সর্ত্তও তো ছিল না। চুপি চুপি এসে তেমনি চুপি চুপি চলে যাবো এইতো ছিল কথা।

সারদা বলিল, না, সে সর্ত্ত আর আমি মানবো না। দেখা করার প্রয়োজন নেই বল্‌চেন? মার নিজের না থাক্, আপনারও কি নেই?

রাখাল বলিল, যে প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে—সে কখনো ঘুচবে না—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি দেবৃতা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক্ আপনার মনে যেন না থাকে। দেবৃতা বলে ডাকি, দেবৃতা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে তাঁর যাওয়া হবে না।

আমি না বললে যাওয়া হবে না? তার মানে?

মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললে, ছেলে বড় হলে তার মত নিতে হয় মা। জানি, রাজু বারণ করবে না, কিন্তু হুকুম না দিলে যেতেও পারবো না সারদা।

এ-কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিল না, তথাপি দু'চোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বোলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধুলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না।

১৪

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে যাইবে জন-দুই দাসী-চাকর এবং

সারদা। তাহার হরিণপুরের বাসাটা তারক সাধ্যমতো সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে, এদিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্য্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়াগাঁয়েই জন্মেচি, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নাই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায় না মা, যে কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ্য হয় আপনারও তা সইবে। ভয় হয় মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর ভেঙে যাবে।

ভাঙবে না তারক, ভাঙবে না। আমি ভালোই থাকবো।

তাই হোক মা। কিন্তু দেহ যদি ভাঙে আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না তা বলে রাখচি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই তো সব নয়। গোটা-দুই জোর আলো চাই, রাত্রে চলা-ফেরায় উঠানের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পারে। একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসনগুলার কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক। জানালার পর্দাগুলা কাচাইয়া রাখিয়াছে বটে, তবু নতুন গোটা-কয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খান না সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কষ-লাগা কানা-ভাঙা পাত্রগুলা কি কাজে আসিবে? এক-সেট নূতন চাই। আহ্নিকের সাজসজ্জা তো কিনিতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগাঁয়ে মেলে না—সে ভুলিলে চলিবে না। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধা-ছাঁদা চলিতেছে, কালকের জন্য ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রত্যহ যেমন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন বৌ, কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিলেন, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশী নয়।

কিন্তু এ-কথা কেউ শুনলে যে তার অন্য মানে করবে নতুন-বৌ!

অর্থাৎ নতুন-বৌয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে, এই তোমার ভয় না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিলেন।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, ভয় তো আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবো না বলেই তো জানি, আর সেই তো আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে, আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিল, তুমি হয়ত ভাবচো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি! সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ি হোলো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হোলো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সে-দিন পর্য্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ একসময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, যৌবন গেছে, রূপ তো নেই! তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন তো সে সত্যি। সত্যি কখনো বঞ্চনা করে না—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয়, সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবে না—তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারি, এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বৌ?

হাঁ করি। নইলে তো তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন তো হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বৌ।

শুনিয়া সবিতাও হাসিলেন, বলিলেন, আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! এ-ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য্য নয় নতুন-বৌ! এই তো সেদিন এমন ক'রে ঠকলে, এতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি করে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি!

সবিতা কহিলেন, আঘাত পেয়েচি সত্য, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে যাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো। হয়ত এমনিই চিরদিনই বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদির জীবন যেমন কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের 'পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু, হাত বাড়িয়ে দিলে। একে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো তো?

আমার নামটা বুঝি বলতে চাও না?

না, মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে; কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশি বাধবে নতুন-বৌ।

কি বলো তো, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ার তারা ডাকতো আমায় দয়াময় বলে।

সবিতা বলিলেন, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারি পছন্দ হয়েচে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকো। কিন্তু যা জিজ্ঞেস করেছিলুম সে তো বললে না?

কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, ভালোবাসি এ কথা তো বলিনি। বলেচি তুমি বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেচি, যে ভালো-বাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসে না।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিত-স্বরে কহিলেন, কিন্তু, আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললে না তো?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই নেই নতুন-বৌ—তুমি ঠিক কথাই বলচো। ভালোবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারে না। তার নিজের দুঃখ যতই হোক না, সইতে তাকে হবেই।

সবিতা কহিলেন, কেবল সইতে পারাই তো নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, পাওয়া উচিত নয় নতুন-বৌ। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশি।

এ-কথা তো তোমার পক্ষে খাটে দয়াময়?

না, খাটে না। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্ত্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা নয়। হতেও পারিনে। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে, জানি নানা কারণে এমনই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ত্রুটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হোতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হোতো নানা-দিকে—আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

কিন্তু আমি দাঁড়াবো কোন্‌খানে?

তুমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে? বিমলবাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বৌ;—তুমি হয়ে যাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয়, তার থেকে তুমি অনেক দূরে—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়েও যে-লোক মিথ্যা বলিতে পারিল না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ, আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অকল্যাণ—এমন বিপরীত ঘটনা কি ক'রে সত্য হয়? কি এর উত্তর?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বৌ। আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তখন কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে, এর উত্তর পাবে—তার আগে নয়।

সবিতা কহিলেন, উত্তর যদি কখনো না পাই, সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উল্টো মুখেই বয়, তবু তুমি আমার ভার বয়ে বেড়াবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উল্টো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য যদি কখনো ক্লান্তির বোঝা হয়ে দেখা দেয়, সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইবো। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর মতোই বিদায় নিয়ে যাবো—কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র রেখে যাবো না, তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। মিনিট দুই-তিন পরে বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছো বলো তো?

ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? একের ভালবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না কেন?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজা সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েচে।

পথের সন্ধান পেয়েছিলে?

হাঁ। প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিল না, সেখানে পেয়েছিলাম।

তার মানে?

মানে এই যে, যে-কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্ব্বলতা নেই, তাকে না-মঞ্জুর করার শক্তি

কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বৌ।

সবিতা কহিলেন, আমি যাই কেন না করি দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে তো ছলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হোলো?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বৌ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েচি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে-বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা-বশে, দুর্ব্বলতা-বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিলেন। যা অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। দয়াময়ের কাছে নীচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কই?

সারদা আসিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেচেন মা।

রাজু? কই সে?

এইতো মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝেয় পাতা গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেচে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমরা তার হরিণ-পুরের বাড়িতে। শুনেচো রাজু?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েচি মা।

হঠাৎ তো নয় বাবা। ওকে যে তোমার মত নিতে বলেছিলুম।

আমার মত কি আপনাকে জানিয়েচে সারদা?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোমার বন্ধু, তার কাছে যেতে তোমার আপত্তি হবে না।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আমার মতামতের প্রয়োজন নেই মা। আমার চেয়েও আপনার সে ঢের বড় বন্ধু।

এ-কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে মুখে বলতে নেই মা, মুখের ভাষায় তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবো না, কিন্তু আমার মতামতের 'পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া আপনাদের হবে না। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক্ হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু! আমার কথা পেয়ে তারক জিনিসপত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের জন্যেই তার পল্লীগ্রামের

বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেচে—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা ?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার মত নিয়ে আপনি কর্ত্তব্য স্থির করবেন সে উচিত নয়, প্রয়োজন নয়। কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেচেন ছেলে বড় হলে তার মত নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ-কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু যে-ছেলে শুধু পরের বেগার খেটেই চিরকাল কাটালো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন ; রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেন না নতুন-মা, মানুষের অবজ্ঞার নীচে মানুষের ভার বয়ে বেড়ানোই আমার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবো না।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সহসা সে যেন আর সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল আপনি অনেকের অনেক কিছু করেন, কিন্তু এমন করে মাকে খোঁটা দেওয়া আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা, বলে বলুক রাজু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবে না।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি তো সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেচি, ওরা কড়া কথার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনা শোধ হোলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটিই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েচে রাজু ?

না মা, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায়নি সে ?

কোনদিন না। সারদা বলে যে, আমার বাসাতে যাবার সে সময় পায় না। কিন্তু আর না, আমার যাবার সময় হোলো, আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলবাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে না নতুন-বৌ ? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো ?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওঁর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমি নিজেই তো এখনো জানিনে।

যখন জানতে পারবে দেবে?

দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছু নেই। আমার সব দোষ-গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখন কেউ আমার আপনার রইলো না, তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা বলেই জানি। চিরদিনই মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন-মার পায়ের ধূলা লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ওখানে তোমার নতুন-মা যেতে চান কিছুদিনের জন্যে, এখানে ভালো লাগচে না বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো, তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

সত্যি বলো রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবে না। আমি নিষেধ করবো।

আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

অন্ততঃ নিজের কাছে নতুন-বৌ এই প্রতিজ্ঞাই করচেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেচি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্ত্ত কালের জন্য রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্ব্বেই নীচে নামিয়ে গেল।

নীচে পথের একধারে দাঁড়াইয়াছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেব্‌তা।

কেন?

সারদাদের অনেক দেখেচেন বললেন। আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

কি হবে নিয়ে?

মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান, কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিল না, সংসারে কেবল একটিই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা—যেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক্ কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

১৫

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধূলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধূলো তো পড়লো, এবার উঠি?

এতই তাড়া? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না?

সে-দুটো কথা তো অনেকবার বলেচো সারদা। তুমি বলবে দেবৃতা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেচেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল দিয়েচেন, নতুন-মাকে বলে বাকী বাড়ি-ভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েচেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না; এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্ব্বে আর একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চট্-পট্ করো, আমার বেশী সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারি মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরোনো হয় না—ঠিক না দেবৃতা?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শোনায়, অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে?

হাঁ।

তারপর খেয়ে শুতে হবে?

হাঁ।

তার পরে চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পড়ে সারা-রাত ছট-ফট করতে হবে—না দেবৃতা?

এ তোমাকে কে বললে?

কে বললে জানেন? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই—সেই।

রাখাল বলিল. তা হলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেচে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে, দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছট-ফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

সারদা কহিল, বেশ আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো, কিন্তু আমিই বা কোন্ অপরাধ করেচি যার জন্যে ঘুমোতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই?

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

সময় নেই—না? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা দেবৃতা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলচেন না, সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামোকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্যে?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই তো সবচেয়ে বড় কারণ দেবৃতা।

না, কোন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা, হরিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্যায় অধিকার আমি কারো 'পরে খাটাইনে।

রাগ করে বলচেন না তো?

না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়—কোনমতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেবতা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, আমার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেবতা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবো না। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার; কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের পরে। যে-লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষিণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

এ তুমি কাকে বলচো? আমাকে?

হাঁ, আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো; কিন্তু জিজ্ঞেস করি তোমাকে বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয়তো এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে, এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করে না?

জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়তো কিছুই হবে না। হয়তো আমারও সময় এসেচে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেবতা, অকারণে নির্মম হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি; কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও আমার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষ-কণ্ঠে কহিল, দেখো সারদা, হাসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে, সেদিনকার কথা মনে পড়ে কিছু? তুমি ছলনা করে জানালে তুমি অল্পশিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্র-ঘরের বৌ। বললে, আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধ্যে যেটুকু ছিল অস্বীকারও করিনি; কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেছেন বিমলবাবু—ঐশ্বর্যের সীমা নেই যাঁর—এসেচে তারক, এসেচেন নতুন-মা। সেদিনের কিছুই বাকী নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বল তো?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে ছিল, কিন্তু ছলনা ছিল না দেবতা। সে মিথ্যেও শুধু

মেয়েমানুষ বলে। তার লজ্জা ঢাকৃতে। একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনিও ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবো না। কাল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েচেন জিনিস-পত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরীব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমাল বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গনিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তা হলে এই নিন। কিন্তু টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় এত নির্ব্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অন্যায় আর একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিছুতে পরিত্রাণ পাবেন না বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে?

না।

তা হলে যাই। রাত হয়েচে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে নিজের চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে-সকল মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়া আসিল কিসের জন্য! কিসের জন্য এই-সব রাগারাগি? কি করিয়াছে সারদা? তাহার অপরাধ নির্দ্দেশ করাও যেমন কঠিন, তাহার নিজের জ্বালা যে কোন্‌খানে, অঙ্গুলি সঙ্কেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী, সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না। সারদা তাহার কাছে যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহু প্রকারে জানাইতে বাকী রাখে নাই। পায়ের পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ত্রুটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাসে জানায়, হয়তো তাহার অর্থ শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়তো সে আরও গভীর আরও বড়। হয়তো সে ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল! বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে, সে আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে

গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই তো কাঙাল-বৃত্তি নিতে পারিনে। অন্নাভাব হয়েচে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ হয় না—এ যে অসম্ভব!

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বার বার বলে, বাহিরের ঘটনা এম্‌নিই বটে; কিন্তু যে-অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে-মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সারদাকে আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল!

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যিই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্ব্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরি-ভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েচো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দ্দশা হবে বল তো? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদাবাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই তো। বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেচি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দু'দিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘর-বাড়ি নেই, বাপ-মা, আপনার লোক নেই, মোটা-মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস্‌! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা যেন দিলে; কিন্তু বৌ এসে খাবে কি বলো তো? খাবি খাবে নাকি!

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা; গেরস্থ-ঘরে সবাই যা যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। সৌখিন মানুষ—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন-চারটা পাত্রে নানাবিধ তরকারি ও মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ-কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে – বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্যি দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে, তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল বলিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরীর প্রায় ঘণ্টা-দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল. কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকী নাই! এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার। মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না, ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকেও বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকারণ লাঞ্ছনা। অথচ ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যে তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক্ আমার রান্না—এই রাত্রে ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে-সব সত্যি নয়, একেবারে মিথ্যে।

কুকারের খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরে আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এ-বাটীতে পৌঁছিতে বেশি বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে, সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখ পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল তো আর সময় পাওয়া যাবে না।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্য কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ-কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্য্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন আমার ফর্দ্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বৌ? ও যার যা আলাদা। তবেই মন খুশী হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিল না, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে তো তার ঘরে দেখলাম না নতুন-মা?

সবিতা বলিলেন, আজ কি তার ঘরে থাকবার জো আছে বাবা! তারক খাবে, বামুন-ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক-রকম রাঁধতে লেগেচে। কত কি যে তৈরী করেচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাকেও যে খেতে বলেচে নতুন-বৌ!

তোমারও নেমন্তন্ন নাকি?

হাঁ, তুমি তো কখনো খেতে বললে না, কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

আজ তাই বুঝি বসে আছো এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বৌ। ভারি পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাস্য-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু?

না মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তাহলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলোনি সারদা?

না মা বলিনি।

কেন বলোনি? মনে ছিল না বুঝি?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিল না রাজু; কিন্তু এ ভুলও অন্যায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অন্যায় বলা চলে না। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপর খেতে হবে? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলবার কথা ওঁর মনেই এলো না মা; কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা, এ মনে না-থাকা ন্যায়-অন্যায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরস হাস্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সারদা তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অন্যায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশী দাঁড়াইয়াছে, তবু থামিতে পারিল না। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করে না। সারদা বলে তাঁর সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় করে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু থামিয়া বলিল, সারদার হয়তো সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করে না, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগে না। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার সুখ-সুবিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক। সবিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি, কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অসুবিধে কারো ঘটাতে চাইনে, যার যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার ঘরে আমার কাছে বসে আজ তুমি খাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না, সে হয় না। কহিল, আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক্, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড় ঘরের বহু-রকমের খাওয়ার আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্য বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি চলে যাও, দুঃখের আমার সীমা থাকবে না। এ তোমাকে বললুম।

অপরাধ ঢের বেশি বাড়িয়া গেল, রাখাল নির্মম হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না নতুন-মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলিতে হয় তাই বলা। কে আমি, যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না? কারো জন্যেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিস্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলো কি রাজু?

কেউ বলে না বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার বিচার-বুদ্ধির তুলনা নেই। আর্ত্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি ন'ন। দুঃখবোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্বর্য্য, অন্তরের ধন নয়। তাই যেমন সহজেই গ্রহণ করেন, তেমন অবহেলায় ত্যাগ করেন। আপনার বাধে না।

বিমলবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেচেন নতুন-মা, সে আমি চিরদিন মনে রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধ করি আমার দেখা হবে না। হয় এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন—অজানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ করিলেন না, বরং গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন, তাই হোক্ রাজু, ভগবান যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু কি হয়েচে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেচে। তুমি ত নিষ্ঠুর নও—কটু কথা বলা তোমার স্বভাব নয়!

প্রত্যুত্তরে রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, আর কিছু বলিল না।

চলিতে উদ্যত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাখু, বিশেষ পরিচয় নেই দু'জনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। কালকের মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেব্‌তা ?

কি চাও তুমি ?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়তো আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

১৬

পরদিন সকালবেলায় হরিণপুর যাত্রার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, সবিতা সারদাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার বাক্স-বিছানা এইবেলা উপরে পাঠিয়ে দাও সারদা, সমস্ত মাল-পত্র তারক লিস্ট করে নিচ্ছে।

সারদা কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমার বাক্স-বিছানা যাবে না মা।

একটি নীচু টুলে বসিয়া তারক নোটবুকের পৃষ্ঠায় দ্রুতহস্তে মালপত্র ফর্দ লিখিয়া লইতেছিল। সারদার উত্তর তাহার কানে পৌঁছিল। অনবত মুখ উঁচু করিয়া তারক বিস্মিত-স্বরে বলিল, বাক্স-বিছানা যাবে না কি-রকম !

সবিতাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। নিম্নস্বরে বলিলেন, নেয়ার মত বাক্স-বিছানা কি তোমার নেই সারদা ? তা হলে আগে বললে না কেন, বন্দোবস্ত করতাম।

ম্লান হাসিয়া সারদা বলিল, বিছানা আমার পুরানো এবং ছেঁড়াও বটে, তা হলেও সেগুলো সঙ্গে নিতে লজ্জা ছিল না, হরিণপুরে আমার যাওয়া হবে না মা।

তারক ও সবিতা প্রায় এক-সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, সে কি ?

সারদা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই। নইলে মাকে সেবা করার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এই শূন্যপুরীতে একলা পড়ে থাকার দণ্ড আমি ভোগ করতাম না।

নির্ব্বাক্ সবিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারদার মুখের পানে তাকাইয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন।

তারক উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি রকম! কালও নতুন-মার সঙ্গে আপনি হরিণপুরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, আর আজ সকালেই এ-বাড়ি ছেড়ে নড়বার উপায় নেই স্থির করে ফেললেন! না, ও-সব বাজে ওজর চলবে না, কোনও মেয়েছেলে সঙ্গে না গেলে সেই পাড়াগাঁয়ে একলাটি নতুন-মা—না, না, সে হতেই পারে না।

সারদা বিষণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, আমি সত্যি বলচি তারকবাবু, আমার যাবার উপায় নেই। এ বাজে ওজর নয়।

অবিশ্বাসপূর্ণ-কণ্ঠে তারক কহিল, কেন শুনি? এখানে আপনার কি কাজ?

সারদা স্থির-নেত্রে পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও জবাব দিল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া তারক কহিল, জবাব দিচ্ছেন না যে?

সারদা তথাপি নিরুত্তর রহিল।

তারক হতাশভাবে হাতের নোটবুকখানি ঘরের মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, তা হলে আর কি করে দুপুরের ট্রেনে আপনার যাওয়া হবে নতুন-মা? মেয়েছেলে কেউ সঙ্গে না থাকলে সেই পাড়াগাঁয়ে নির্ব্বান্ধব স্থানে একলাটি টিকতে পারবেন কেন?

সবিতা এতক্ষণ কথা কহেন নাই। মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তারক, গাঁয়ে আমার জন্ম, জীবনের বেশির ভাগ গাঁয়েই কেটেছে, সেখানে আমার কষ্ট হবে না।

রুক্ষচোখে সারদার পানে তাকাইয়া তারক বিদ্রূপ-স্বরে বলিল, কে সে মাতব্বর লোকটি জানতে পারি কি, যাঁর বিনা হুকুমে আপনি নতুন-মার সঙ্গেও এ-বাড়ি ছেড়ে যেতে পারেন না? রাখালবাবু নিশ্চয়ই নয়?

তারকের অসংযত উক্তিতে সারদার মুখ অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল। অন্য দিক পানে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, যিনি আমাকে এই বাড়িতে রেখে গেছেন তাঁর বিনা হুকুমে অন্যত্র যাওয়া আমার সম্ভব নয় তারকবাবু। আপনি অকারণ রাগ করচেন।

সারদার উত্তরে সবিতা চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তারক কণ্ঠস্বর অনেকখানিই নিম্নগ্রামে নামাইয়া বিস্ময়বিমিশ্র সুরে কহিল, কিন্তু তিনি তো বহুদিন নিরুদ্দেশ।

সারদা তারকের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সবিতার সামনে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আর সকলে আমাকে ভুল বুঝুক, আপনি ভুল বুঝবেন না নিশ্চয় জানি।

সবিতা গভীর স্নেহে সারদার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া আঙুল কয়টি আপন ওষ্ঠাধরে ঠেকাইলেন। অত্যন্ত গাঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন, সোনাকে পিতল বলে

চিরদিন কেউ ভুল করতে পারে না সারদা। আজ না বুঝুক মা, একদিন সকলেই তোমাকে বুঝতে পারবে।

সারদার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। অবনত-মুখে প্রবল চেষ্টায় নিঃশব্দে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিল।

সবিতা সারদাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোমাকে কিছু বলতে হবে না সারদা। আমার সঙ্গে না যেতে পারা তোমার যে কতবড় দুঃখ, আমি তা জানি।

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা-দেড়েক পূর্ব্বে তারক স্টেশনে সবিতাকে লইয়া উপস্থিত হইল। মালপত্র গনিয়া, কুলি ঠিক করিয়া, পুরাতন দরওয়ান মহাদেবের হেফাজতে দেওয়া হইয়াছে। ব্রেকভ্যানের মালগুলি ওজনান্তে রেলওয়ে কোম্পানীর দায়িত্বে অর্পণ করিয়া রসিদখানি সযত্নে পকেটে পুরিয়া তারক নিশ্চিন্ত-চিত্তে সেকেণ্ড ক্লাশ লেডিস্ ওয়েটিং রুমের সামনে আসিয়া ডাকিল, নতুন-মা—

সবিতা ঘরের ভিতর হইতে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

তারক রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, মালপত্র ওজন করে ব্রেকে দিয়ে রসিদ নিয়ে এলাম। এধারের ঝামেলা চুকলো। এখন ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুকলেই হয়। আপনাকে বিছানা পেতে বসিয়ে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, নতুন-মার পাছে হরিণপুরে যাওয়া না হয়, এজন্যে তোমার ভয় আর ভাবনার অন্ত নেই, না তারক?

স্মিতমুখে তারক জবাব দিল, নিশ্চয়ই। যে পর্য্যন্ত না ছেলের কুঁড়ে ঘরে মায়ের পায়ের ধূলো পড়চে, ততক্ষণ নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করিনে মা।

ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্ব্বে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্মের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যতিব্যস্তভাবে তারক ওয়েটিং-রুমের দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, নতুন-মা, বেরিয়ে আসুন ট্রেন এসে গেছে।

মহাদেব দরওয়ান ওয়েটিং রুমের বাহিরে কতকগুলি বাক্স-বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া খৈনি টিপিতেছিল। তাড়াতাড়ি খৈনি মুখে ফেলিয়া পাগড়ী ঠিক করিতে করিতে শশব্যস্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

আপাদমস্তক সিল্কের চাদর-মণ্ডিতা সবিতা শিবুর মা ঝি-সহ ট্রেন অভিমুখে তারকের অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন, আমাকে তুমি ইণ্টার ক্লাশে মেয়েদের কামরায় তুলে দিও তারক। শিবুর মাও আমার সঙ্গে থাকবে।

তারক থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আপনার জন্যে সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট

কিনেচি নতুন-মা ; ইণ্টার ক্লাশে অপরিষ্কার জেনানা কম্পার্টমেণ্টের দুর্গন্ধের মধ্যে টিকতে পারবেন কেন ?

সবিতা বলিলেন, কিন্তু মেয়ে-কামরায় যাতায়াত করাই আমার অভ্যাস ছিল বাবা।

তারক বারংবার জিদ করিয়া একাধিক অসুবিধা ও কষ্টের অজুহাত দেখাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে সবিতাকে উঠাইয়া দিল।

ছোট কামরা। তখনও পর্য্যন্ত অন্য কোনও আরোহী উঠে নাই। তারক ব্যস্তভাবে গাড়ির মধ্যে উঠিয়া নিজের ধুতির কোঁচা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের দিকের বেঞ্চখানির ধুলা ঝাড়িয়া সযত্নে পরিষ্কার বিছানা বিছাইয়া দিল। হাওড়া স্টেশন হইতে যাওয়া হইবে মাত্র বর্দ্ধমান। কিন্তু তারক যাত্রাপথের আয়োজন করিয়াছে দিল্লী বা লাহোর পর্য্যন্ত যাইতে হইলে যেমন করা উচিত।

সবিতা অন্যমনস্ক-চিত্তে বিছানার উপর গিয়া বসিলেন। তারক হয়তো মনে মনে আশা করিতেছিল নতুন-মা তাহার এই সতর্ক যত্ন সেবা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সস্নেহ অনুযোগ করিবেন। কিন্তু ধোপদস্ত ফর্সা ধুতির কোঁচা বেঞ্চির ধুলিলিপ্ত হইয়া মলিন বর্ণ ধারণ করা সত্ত্বেও নতুন-মা একটিও কথা কহিলেন না। ইহাতে তারকের মন অনেকখানিই ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িল। তথাপি মহা উৎসাহে সে উপরের বাঙ্কে ট্রাঙ্ক, হাতবাক্স, সুটকেশ প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিল। বেঞ্চির নীচে ফলের টুকরি ও অন্যান্য দ্রব্য সাবধানে সুরক্ষিত করিল। কুলিদের বিদায় দিয়া তারক সবিতার সামনে আসিয়া ক্লান্ত-কণ্ঠে কহিল, আপনি একটু বসুন নতুন-মা। আমি এক গ্লাস লেমনেড বরফ দিয়ে নিয়ে আসি আপনার জন্যে। কিংবা এক প্লেট আইসক্রিম নিয়ে আসি— কি বলেন ?

সবিতা এতক্ষণ বাহিরে জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম্মের পানে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া ছিলেন। তারকের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। ব্যস্তস্বরে বলিলেন, না তারক, কিছুই আনতে হবে না। তেষ্টা আমার পায় নি।

তারক সে নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, বাঃ, তা কি হয় ? তেষ্টা পায়নি বললে শুনবো কেন নতুন-মা ? মুখ আপনার কি রকম শুকিয়ে উঠেচে সে দেখতেই পাচ্ছি—

সবিতা মৃদু হাসিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, লেমনেড সোডা বা আইসক্রিম ও-সব আমি কখনও খাইনে। ট্রেনে জলস্পর্শ করাও জীবনে কোনও দিন ঘটেনি। তুমি ব্যস্ত হয়ে অনর্থক ও-সব কিনো এনো না বাবা।

সকল বিষয়ে প্রতিবাদ করা এবং নিজের ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তর্ক-যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই তারকের প্রকৃতি। কিন্তু নতুন-মার এই

কণ্ঠস্বর তাহাকে কোনোটাতেই প্রবৃত্ত হইতে ভরসা দিল না। সুতরাং সে মনে মনে দুঃখ অপেক্ষা অস্বস্তিই অনুভব করিতে লাগিল বেশী।

প্ল্যাটফর্মের কর্মব্যস্ত জনতায় নিবদ্ধদৃষ্টি সবিতার চক্ষু'র অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দূরে বিমলবাবুকে আসিতে দেখা গেল। প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, পদক্ষেপ ঈষৎ দ্রুত। ট্রেনের কামরাগুলির মধ্যে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সবিতার মুখ-চোখ আনন্দের স্নিগ্ধ কিরণে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া

বিমলবাবু প্রসন্ন-হাস্তে সবিতার কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারক তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে লাফাইয়া পড়িয়া পুলকিত-কণ্ঠে কহিল, এই যে আপনি স্টেশনে এসেচেন দেখচি। আমরা আশা করেছিলাম বাড়িতেই দেখা করতে আসবেন। ট্রেন-টাইম পর্য্যন্ত এলেন না দেখে কিন্তু ভাবনা হয়েছিল।

বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া শান্তকণ্ঠে তারককে প্রশ্ন করিলেন,—তোমরা মানে?

বিমলবাবুর প্রশ্নে তারক সবিতার দিকে চাহিয়া হঠাৎ লজ্জায় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কথাটা বহুবচনে না বলিলেই বোধ হয় শোভন হইত। ছিঃ, নতুন-মা হয়তো কি মনে করিলেন!

কিন্তু তারকের এ লজ্জা হইতে পরিত্রাণ করিলেন নতুন-মাই! স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিলেন, তারক ঠিকই বলেচে। আজ সকালবেলায় আমার ওখানে তোমার আসা সম্ভব মনে করেছিলাম। সারদাও বলছিল তোমার কথা।

বিমলবাবু সবিতার কামরার মধ্যে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, সারদা কোথায়?

সবিতার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তারক রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, তিনি নাকি সহরের কলের জল ইলেকট্রিক আলো ছেড়ে পচা পাড়াগাঁয়ে বাস করতে যাবেন? তবে সেটা দয়া করে গোড়াতে বললেই ভাল করতেন, আমরা এতটা অসুবিধায় পড়তাম না।

বিমলবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সারদা কি তোমার সঙ্গে হরিণপুরে যাচ্চে না?

সবিতা উদাস হাসিয়া নীরবে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, সারদা আসিতে পারে নাই।

বিমলবাবু ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বাম হাতখানি উল্টাইয়া মণিবন্ধে বাঁধা সোনার রিস্টওয়াচের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ব্যস্ত-স্বরে বলিলেন, যথেষ্ট সময় আছে। এখনি মোটর নিয়ে গিয়ে সারদাকে তুলে আনি নতুন-বৌ। আমি গিয়ে বললে সে 'না' বলতে পারবে না।

সবিতা বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি অনুরোধ করলেও সে আসতে পারবে না। শুধু তার দুঃখ বাড়বে মাত্র।

বিমলবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিলেন, আর একদিন শুনো।

বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া থমকিয়া বলিলেন, ব্যাপারটা কি নতুন-বৌ?

সবিতা বলিলেন, তার আসার উপায় নেই দয়াময়। নইলে আমার সঙ্গে আসা থেকে আমি নিজেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম কি-না সন্দেহ। যাই হোক, আমার আরও একটি অনুরোধ তোমার 'পরে রইলো। সারদা একলা থাকলো, মধ্যে মধ্যে তুমি তার খোঁজ-খবর নিও।

সারদার ব্যবহারে তারক তার প্রতি এত বেশি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে নতুন-মা সারদার অকৃতজ্ঞতার উল্লেখমাত্র না করিয়া বরং বিমলবাবুকে তার তদারক্ করিতে অনুরোধ করিলেন দেখিয়া মনে মনে জ্বলিয়া গেল। মনের বিরক্তি ইহাদের সম্মুখে পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেজন্য এখান হইতে সরিয়া যাইবার ইচ্ছায় বলিল, শিবুর মা আর দারওয়ানটা ঠিক উঠেচে কি না আমি একবার দেখে আসি নতুন-মা। এই বলিয়া অনাবশ্যক দ্রুতপদে অন্যদিকে চলিয়া গেল।

বিমলবাবু সবিতার পানে প্রশ্নসূচক দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন, কি হয়েচে বলো ত? তারককে একটু উত্তেজিত বলে মনে হচ্চে যেন।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সারদা আমার সঙ্গে না আসায় তারক তার উপরে বিষম অসন্তুষ্ট হয়েচে। ওর ধারণা আমি পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে যাচ্ছি, সারদা সঙ্গে থাকলে হয়তো আমার অনেক সুবিধা হোতো।

বিমলবাবু বলিলেন, সেটা শুধু তারকই যে ভাবচে তা তো নয়। আমিও যে ঠিক ওই ভাবনাই ভাবচি নতুন-বৌ!

সবিতা করুণ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি আজ ঠিক এর উল্টো ভাবনাই ভাবচি।

বিমলবাবু সবিতার মুখে এত করুণ হাসি পূর্ব্বে দেখেন নাই। তাঁহার বুকের ভিতরটা বেদনায় যেন মোচড় দিয়া উঠিল। সবিতার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, আমি শুনতে পাইনে নতুন-বৌ?

ক্লান্ত-কণ্ঠে সবিতা বলিলেন, সমস্ত কথাই তোমায় একদিন বলবো ভেবেচি। আর কেউই তো আমার এ অন্তর্দ্দাহ বুঝতে পারবে না, বিশ্বাস করতে হয়তো চাইবে না। আমার অনেক জানাবার আছে। এই তেরো বৎসর ধরে দিনের পর দিন রাত্রের পর রাত ক্রমাগত যে-প্রশ্ন আমার বুকের ভিতর আছড়ে-পিছড়ে মরচে, আজও

তার জবাব পাইনি। ভগবানের চরণে বারবার জানিয়েছি, ঠাকুর, তোমার অজানা তো কিছুই নেই। এতবড় নির্মম জিজ্ঞাসা আমার জীবনে তুমিই পাঠিয়েচ। তার জন্য তোমাকে অভিযোগ করবো না, শুধু এর সত্য উত্তরটাও তুমি এই জীবনে আমাকে দিয়ে দিও। এ-ছাড়া প্রার্থনার আর কিছুই তো রাখিনি! যত বৃহৎ দুঃখই দাও না কেন, আমি তাকে তোমার হাতের দান বলে মেনে নিয়ে সোজা হয়েই চলতে পারতাম। কিন্তু আমার জীবনে তো তুমি দুঃখ পাঠাওনি; পাঠিয়েচো শুধু তীব্র পরিহাস। মানুষের পরিহাস সওয়া কঠিন নয়, কিন্তু তোমার এ নিষ্ঠুর পরিহাস যে সহ্য হয় না!

বিমলবাবুর আনন্দসৌম্য মুখে একটা কঠিন বেদনাভূতির ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল। তিনি একটিও কথা কহিলেন না, অন্য একদিকে দৃষ্টি মেলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি যেন ইহলোক হইতে লোকান্তরে নিরুদ্দিষ্ট।

অনেক সময় কাটিয়া গেল। সবিতা অস্ফুট মৃদুস্বরে ডাকিলেন, দয়াময়।

বিমলবাবু ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহস্নিগ্ধ গাঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, নতুন-বৌ!

সবিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। মুখে উদ্বেগ ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বিমলবাবুর মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সানুনয়-কণ্ঠে বলিলেন, একটি কথা বলবো? বলো, কিছু মনে করবে না?

বিমলবাবু সবিতার কথায় সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, নতুন-বৌ, আজ তুমি 'কিছু মনে করার' ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে উপরে উঠতে পারোনি, জানতাম না। কিন্তু থাক সে-কথা, কি বলতে চাও বলো, কিছু মনে করবো না।

নতদৃষ্টি সবিতা বলিলেন, তুমি আমাকে নতুন-বৌ বলে ডেকো না।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ সবিতার পানে তাকাইয়া থাকিয়া শান্ত-স্বরে বলিলেন, তাই হবে।

এবার মুখ তুলিয়া বিমলবাবুর পানে চাহিতে দেখা গেল সবিতার সুন্দর চোখ দুটি শিশিরসিক্ত পদ্মপাপড়ির মত অশ্রুভারে টলমল্ করিতেছে।

বিমলবাবুকে কি-একটা কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না, বাধিয়া গেল। বিমলবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

প্ল্যাটফর্মের উপর হইতে কামরার মধ্যে উঠিয়া আসিয়া সবিতার সামনের বেঞ্চে বসিলেন। তারপরে স্নেহকোমল অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলিলেন, তোমাকে নাম ধরে ডাকার অধিকার আমায় দিতে পারবে কি তুমি? সঙ্কোচ ক'রো না। যদি কোনও বাধা থাকে, একটুও আমি দুঃখিত হবো না জেনো। শুধু বলে দিও, কি বলে ডাকলে

তোমার মনে বাজবে না, স্মৃতির দাহ জেগে উঠবে না। আমি তো বেশী কিছু জানিনে। হয়তো না জেনে আঘাত দিচ্চি তোমাকে।

সবিতা এবারে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কি যেন একটা কথা বারংবার বলিবার চেষ্টা করিয়াও লজ্জায় ও দুঃখে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিমলবাবু আবার বলিলেন, কুণ্ঠিত হ'য়ো না। বলো, কি বলে ডাকলে তুমি সহজে সাড়া দিতে পারবে?

সবিতা তথাপি নিরুত্তর রইলেন। তার পরে বিপুল সঙ্কোচ প্রাণপণে ঠেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আমাকে রেণুর মা বলে ডেকো।

বিমলবাবুর মুখে কোমল সহানুভূতির কারুণ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, সত্যি! ভারী সুন্দর। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে, তোমার এতবড় পরিচয়টা এতদিন আমার মনে হয়নি কেন বলো তো?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

বিমলবাবু আনন্দ মধুর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এ যে তুমি কতবড় দান আজ আমাকে দিলে, তা হয়তো তুমি নিজেও জানো না রেণুর মা! তোমার দেওয়া এই সম্মান এই বিশ্বাসের যেন মর্য্যাদা রাখতে পারি। আমার আর কোনও কামনা নেই।

বিমলবাবু হয়তো আরও কিছু বলিতেন, ট্রেন ছাড়িবার সঙ্কেতসূচক দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল। হাতঘড়ির পানে চাহিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, যাই এবার। হরিণপুরে থাকতে যদি ভালো না লাগে, চলে আসতে দ্বিধা ক'রো না যেন। তারক যদি পৌঁছে দিয়ে যেতে ছুটি না পায়, খবর দিও। রাজু গিয়ে নিয়ে আসবে। প্রয়োজন হলে আমিও যেতে পারি।

বিমলবাবু গাড়ি হইতে নামিয়া গেলেন। তারক দ্রুতপদে আসিতেছিল। হাতে এক-গ্লাস বরফখণ্ডপূর্ণ রঙীন পানীয়। সিরাপ জিঞ্জার বা ঐরূপ কিছু। বিমলবাবুর হাতে গ্লাসটি তুলিয়া দিয়া বলিল, নতুন-মাকে তো একফোঁটা জলও মুখে দেওয়াতে পারলাম না। আপনি যেন এটা রিফিউজ করবেন না।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, দাও।

গ্লাসটি বিমলবাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া তারক পকেট হইতে কলাপাতা-মোড়া পানের দোনা বাহির করিল।

শেষঘণ্টা পড়িয়া গার্ডের হুইসেল শোনা গেল। সবিতা বলিয়া উঠিলেন, গাড়ি যে এখনি ছাড়বে তারক! উঠে এসো এইবার। তোমার এই অতিথিবাৎসল্যের মধ্যে আমি যে কি করে দিন কাটাবো তাই ভাবচি।

বিমলবাবু তাঁর পানীয় তখনও শেষ করিতে পারেন নাই। হাসিতে গিয়া বিষম খাইলেন।

সবিতা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, আহা—

বিমলবাবু মুখ হইতে গ্লাসটি নামাইয়া সবিতার দিকে চাহিয়া এইবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ট্রেন তখন চলিতে শুরু করিয়াছে। 'নমস্কার'! বলিয়া তারক চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া পড়িল।

১৭

ব্রজবাবুর আপন ভাইপো এবং খুড়তুতো ছোট ভাই নবীনবাবু, যাঁহারা এই দীর্ঘ বারো-তেরো বৎসর দেশের বাড়ি-ঘর নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগদখল করিতেছিলেন, এতদিন পরে সকন্যা ব্রজবাবুর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন আদৌ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গ্রামে ব্রজবাবুর নিজের দোতলা কোঠাবাড়ি, বাগান, পুকুর, জমিজমা সপরিবারে তাহারাই এতদিন অধিকার করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। যিনি প্রধান সরিক, বলিতে গেলে প্রকৃত মালিক আজ হঠাৎ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, সুতরাং বিচলিত হইবার কথা। কিন্তু তবুও ব্রজবাবুর ভাইপোরা ও খুড়তুতো ভাই নবীনবাবু ব্রজবাবুর দেশে আসার প্রতিবাদ করিতে ভরসা করেন নাই। কারণ, মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে এই ব্রজবাবুই তাঁহাদের একখানি মূল্যবান তালুক লেখাপড়া করিয়া দান করিয়াছেন, যাহার আয় বার্ষিক প্রায় হাজার টাকার কাছাকাছি। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা নিজেদের সংসারে বাসগৃহের অন্তঃপুরে তো ব্রজবাবু ও রেণুকে স্থান দিতে পারবে না। সে কারণে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া যুক্তি-পরামর্শ করিয়া ব্রজবাবুকে তাঁহার বাড়ির সদর অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সদরবাড়ি একতালা কোঠা। দুইখানি বড় বড় ঘর। ঘরের কোলে ভিতর দিকে দর-দালান, বাহিরের দিকে খোলা রোয়াক। দালানের দুই প্রান্তে দুইখানি ছোট ঘর। একখানি চাকরদের তামাক সাজিবার, অন্যখানি আলোবাতি রাখিবার ফরাস-ঘর। এই সদরবাটী।

ঘরগুলি ঝাঁটপাট দিয়া ধোয়াইয়া, খান-দুই তক্তপোষ পাতাইয়া মাটির নূতন কলসীতে পানীয় জল তুলাইয়া রাখিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তালুকদাতা খুড়ার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলে ব্রজবাবু ও রেণুর সেদিন একবেলার আহারাদির ব্যবস্থাও তাঁহাদের নিকট হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা বাটীর মধ্যে হয় নাই। খাদ্যসামগ্রী বহির্বাটীতে পৌঁছিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রজবাবু বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও এ ব্যবস্থার অর্থ বুঝিয়া লইতে বুদ্ধিমতি রেণুর বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সে আজন্মকালই স্বল্পবাক্ ও সহিষ্ণু-প্রকৃতির মেয়ে। কোনও ব্যাপারে মনে আঘাত কিংবা অপমান বোধ করিলেও তাহা লইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

খুড়া দেশের বাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণ প্রণাম ও কুশল-প্রশ্নাদির পর প্রথমেই জানিতে চাহিলেন, কি কারণে তিনি এতদিন পরে বাড়িতে ফিরিয়াছেন? কথাবার্ত্তার পর যখন জানা গেল যে, বিশিষ্ট ধনী খুড়া ব্রজবাবু আজ সর্ব্বস্বান্ত গৃহহীন হইয়া অনূঢ়া বয়স্থা কন্যাসহ গ্রামে ফিরিয়াছেন, অবশিষ্ট জীবদ্দশা এইখানেই কাটাইবার সঙ্কল্প লইয়া --তখন তাঁহারা রীতিমত ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রজবাবুর শরীরের যেরূপ অবস্থা, শেষ পর্য্যন্ত ঐ বয়স্থা অবিবাহিতা কন্যা তাঁহাদের স্কন্ধে না পড়িলে হয়। তালুক দান করিয়া অবশেষে খুড়া কি তাঁহার ধুবড়া মেয়েটিরও দায়িত্বভার ভাইপো-দেরই দান করিয়া যাইবেন নাকি? এমনি হইলেও বা হইত, কিন্তু কুলত্যাগিনী জননীর ঐ অনূঢ়া কন্যাকে সংসারে আশ্রয় দিয়া কে বিপদের ভাগী হইবে?

ব্রজবাবু তাঁহার গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। পারিবারিক ঠাকুর-ঘরে গোবিন্দজীউকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মুখপাত্রস্বরূপ সম্মুখে আসিয়া জোড়-করে ব্রজবাবুকে বলিলেন, মেজদা, একটা কথা আপনাকে না জানালে নয়। মুখে আনতে যদিও বুক ফেটে যাচ্ছে, তবুও না জানিয়েও উপায় নেই। আপনি ভরসা দিলে আমরা খুলে বলতে পারি।

নির্ব্বিরোধী ব্রজবাবু ভ্রাতার এই সবিনয় ভূমিকায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন বলিলেন, সে কি নবীন! ভরসা আবার দেব কি? বলো বলো, এখুনি বলে ফেলো, কি তোমাদের সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে? তাই তো—কি মুস্কিল—তোমরা কি না শেষকালে—

ব্রজবাবু সমস্ত কথা ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি নবীনচন্দ্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদল তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইলেন। উৎসাহিত হইয়া নবীনচন্দ্র আরও সাড়ম্বরে অতিবিনয়-সমেত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিলেন। বহু অবান্তর কথা এবং নিজেদের নির্দ্দোষিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ-সহ যাহা জানাইলেন তাহার সার-মর্ম্ম এই যে, ব্রজবাবু ও রেণুকে যদি নবীনবাবুরা সংসারে স্থান দেন, তাহা হইলে গ্রামে তাঁহাদের পতিত হইতে হইবে। গ্রাম-শুদ্ধ সকলেই জানে, এই রেণুকে তিন বৎসরের শিশু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহার জননী দূরসম্পর্কের নন্দাই রমণীবাবুর সহিত

প্রকাশ্যে কুলত্যাগ করিয়াছিল। আজ বারো-তোরো বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। গ্রামের কেহই আজও তাহা বিস্মৃত হয় নাই।

ব্রজবাবু বিবর্ণমুখে নতশিরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই অসহায় মুখ দেখিলে অতি-বড় কঠিন হৃদয়ও ব্যথিত না হইয়া পারে না। নবীনচন্দ্রেরও হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনিই বা কি করিতে পারেন! একমাত্র আশা ছিল, ব্রজবাবু বিশিষ্ট অর্থশালী ব্যক্তি—গ্রামে অর্থব্যয় করিতে পারিলে অনেকেরই মুখে চাপা দেওয়া যায়। কিন্তু ব্রজবাবু আজ নিঃস্ব অর্থহীন। সুতরাং বয়স্থা কন্যাকে এতকাল অনূঢ়া রাখার অপরাধ গ্রামের কেহই ক্ষমা করিবেন না—বিশেষতঃ যে কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়াও বিবাহ হয় নাই, জননী যাহার কলঙ্কিনী।

নতুন-বৌ গৃহত্যাগ করিলে গ্রামের কুৎসা-আন্দোলনই যে ব্রজবাবুকে দেশের বাড়ি ছাড়িয়া গোবিন্দজীউ ও শিশুকন্যাসহ কলিকাতাবাসী করিতে বাধ্য করিয়াছিল, বাড়িতে আসিবার পূর্ব্বে এ-কথা যে তাঁহার কেন মনে পড়ে নাই ইহা ভাবিয়া ব্রজবাবু সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

দেশের এ অপ্রিয় আন্দোলনের সংবাদ রেণু জানিত না। জানিলে সে ব্রজবাবুকে গ্রামে আসিবার পরামর্শ দিত না; কিন্তু এ অবস্থায় এখানে থাকাও তো চলে না। এখন যাইবেনই বা কোথায়?

ব্রজবাবুর চিন্তাজালে বাধা দিয়া নবীন ও কৃতজ্ঞ ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বারংবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকন্যা ব্রজবাবুকে নিজেদের মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উপায় নাই, ইহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কুণ্ঠিত হইয়া ব্রজবাবু বলিলেন, নব, তোমরা লজ্জিত হ'য়ো না। আমি সমস্তই বুঝতে পারচি। এটা আগেই আমার বিবেচনা করা উচিত ছিল ভাই। যাই হোক, এটাও বোধ হয় গোবিন্দজীর পরীক্ষা। দেখি তাঁর ইচ্ছা আবার কোথায় নিয়ে যান!

ব্রজবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র বলিলেন, কিন্তু মেজকাকা, সবচেয়ে ভাবনা আমাদের রেণুর বিয়ের জন্যে।

ব্রজবাবু ধীর-কণ্ঠে জবাব দিলেন, কিছু চিন্তা ক'রো না বাবা, আমি ওকে আর আমার গোবিন্দজীকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করবো। গোবিন্দজীর রাজ্যে মায়ের অপরাধের জন্যে মেয়েকে কেউ দোষী করেন না। যে পর্য্যন্ত না যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, এখানে এই বৈঠকখানা-বাড়িতেই পৃথকভাবে থাকবো। কারুর কোনও অসুবিধা ঘটাবো না।

আত্মীয়দের কথাবার্তায় বুঝা গেল, বাস্তবাটীর ঠাকুর-ঘরে গোবিন্দজীউ তাঁহার পূর্ব্ব

বেদীতে অধিষ্ঠিত হওয়ার বাধা নাই, বাধা রেণুর ঠাকুর-ঘরে প্রবেশের এবং ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের।

মুখে যাহাই বলুন না কেন, এই ঘটনায় ব্রজবাবু যাথার্থই মর্মাহত হইলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান লক্ষ্য, পরম প্রিয়তম গোবিন্দজীউ নিজ পূজামন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না, বৈঠকখানা-বাড়িতে পড়িয়া রহিলেন, এই ক্ষোভে ও দুঃখে ব্রজবাবু মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সংসারে নানা বিপর্যয় এমন কি সর্বস্বান্ত গৃহহারা অবস্থাও তাঁহার অন্তরকে এমন রিক্ত করিতে পারে নাই।

গ্রামে আসিয়া পর্য্যন্ত রেণুর মোটে অবকাশ রহিল না। গোবিন্দজীর সেবা এবং পিতার যত্ন ও শুশ্রূষা লইয়া তাহাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। অন্য কোনও ব্যাপারে তাহার দৃষ্টি দিবার সময় বিরল, হয়তো ইচ্ছাও নাই।

সদরবাটীর দুইখানি ঘরের একখানি গোবিন্দজীউর জন্য, অন্যখানি পিতার জন্য সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। পিতার শয়নগৃহেরই একপ্রান্তে একখানি সরু তক্তাপোষে নিজের শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছে। ছোট ছোট দুখানি কক্ষের একখানি ভাণ্ডার এবং অপরখানি রন্ধনকক্ষ হইয়াছে। উঠানের এককোণে একটুখানি জায়গা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রেণু স্নানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে।

ব্রজবাবু ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করেন—গোবিন্দ, তোমাকে তোমার আপন মন্দির থেকে বাইরে এনে অসম্মানের মধ্যে ফেলে রাখলাম শেষকালে! এ কি আমার উচিত হ'লো প্রভু? কিন্তু আমার রেণুর যে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে তোমার সেবায় বঞ্চিত করলে সে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? পতিতপাবন, তুমিও কি অবশেষে আমাদের সাথে পতিত সেজে রইলে?

সন্ধ্যারতির ক্ষণে আরতি করিতে করিতে ব্রজবাবু আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন, এই ধরণের ভাবনায়। দক্ষিণ হাতের পঞ্চপ্রদীপ, বাম হাতের ঘণ্টা নিশ্চল হইয়া যায়। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, খেয়াল থাকে না।

রেণু ডাকে, বাবা—

ব্রজবাবুর চমক ভাঙে। সলজ্জে ত্রস্ত-হস্তে আবার আরব্ধ আরতিতে পুনঃপ্রবৃত্ত হন।

কখনও বা সংশয়-উদ্বেল চিত্তে ভাবেন—গোবিন্দ, সন্তানস্নেহে অন্ধ হয়ে তোমার প্রতি ত্রুটি করে প্রত্যবায়ভাগী হলাম না তো প্রভু?

এইরূপ অত্যধিক মানসিক সংঘাতে ব্রজবাবু যখন বিপর্য্যস্ত-চিত্ত, সেই সময়ে ঘটিল এক দুর্ঘটনা। দ্বিপ্রহরে একদিন পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রজবাবু মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। রেণু ভয়ে ও উদ্বেগে কাতর হইলেও স্বভাবগত ধীরতার

সহিতই অর্দ্ধ-চেতন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, নবুকাকুকে কিংবা দাদাদের ডাকবো কি ?

ব্রজবাবু অতিকষ্টে শুধু বলিলেন, রাজু—

রেণু সেদিনই রাখালকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

গ্রামের চিকিৎসকটি মেডিক্যাল কলেজের ষষ্ঠ বার্ষিকে এম. বি. ফেল। গ্রামের পশার মন্দ জমে নাই। ব্রজবাবুকে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, মাথায় রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। সতর্কতা-সহকারে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইলে এ-যাত্রা বাঁচিয়া যাইবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপ ঘটিলে জীবনের আশা অল্পই। এখন হইতে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন।

রাখাল তাহার বন্ধু যোগেশের মেস্ হইতে সেদিন বাসায় ফিরিল রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটায়। যোগেশ কোনও মতে রাখালকে ছাড়ে নাই, খাওয়াইয়া দিয়াছে।

দিল্লীতে কয়েকটি বিবাহযোগ্য অনূঢ়া পাত্রী রাখালকে তাহার আপত্তি সত্ত্বেও দেখানো হইয়াছিল। তাহাদেরই মধ্যে একটি পাত্রীর কাকা কলিকাতার অফিসে চাকরি করেন। দিল্লী হইতে পাত্রীর পিতার তাগিদ অনুসারে পাত্রীর খুড়া আসিয়া যোগেশকে ধরিয়াছেন। রাখাল-রাজবাবুর সহিত তাঁহার ভাইঝির বিবাহ দিয়া দিতেই হইবে। সে ভদ্রলোক নাকি যোগেশকে এমনভাবে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন যে, নিজে বিবাহিত এবং অন্য জাতি না হইলে যোগেশ হয়তো এই অরক্ষণীয়াটির রক্ষণভার গ্রহণ করিয়া তাহার খুড়ার অনুনয়-বিনয়ের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ফেলিত।

পাত্রীর একখানি ফটোগ্রাফও যোগেশ রাখালকে দেখাইয়াছে। যদি চেহারা ঠিক মনে না পড়ে সেজন্য খুড়া এই ফটোখানি যোগেশের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন।

রাখাল প্রথমে তো হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু যোগেশচন্দ্র না-ছোড়। সে প্রাণপণ তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে লাগিল, যদ পাত্রীর বয়স, চেহারা, শিক্ষা, এবং তাহার পিতৃকুল-সম্বন্ধে রাখালের কোনও অপছন্দ না থাকে, তবে সে কেন বিবাহ করিবে না ?

যোগেশ জানে, রাখাল বিবাহের পণ-গ্রহণ প্রথাকে অকৃত্রিম ঘৃণা করে। সংসারে রাখালের অপেক্ষা অনেক অল্প আয়ের মানুষও বিবাহ করিয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রতিপালন করিতেছে। স্বয়ং যোগেশচন্দ্রই তো তাহাদের অন্যতম উদাহরণ। তবে মধ্যবিত্ত বিবাহিত ব্যক্তির জীবনযাত্রাপ্রণালী বড়লোকদের অনুকরণে হয়তো চলে না, যেমন চলে তাহা অবিবাহিত অবস্থায়। বন্ধুর বিবাহে বান্ধবীর জন্মদিনে নিউ মার্কেটের

ফুলের বাস্কেট উপহার, কিংবা মরক্কো-বাঁধাই মূল্যবান সংস্করণের রবীন্দ্রনাথ অথবা শেলি ব্রাউনিঙের গ্রন্থ উপহার দেওয়ার বাধা ঘটিতে পারে। বিলিতি সেলুনে আট আনার চুল ছাঁটার পরিবর্তে দেশী নাপিতের কাছে আট পয়সার চুল ছাঁটিতে তখন হয়তো বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু বিবাহের যোগত্যাসম্পন্ন পুরুষ যদি বিবাহোপযোগী বয়সে কেবলমাত্র দায়িত্বভার বহনের ভয়ে অথবা নিজের বিলাস ও অবাধ মুক্তির বাধা ঘটিবার আশঙ্কায় বিবাহে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তার চেয়ে কাপুরুষ সংসারে বিরল। হিসাব করিলে দেখা যায়, বিবাহে অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া যতখানি অপরাধ করে তাহাদের চেয়ে বেশী দোষী এবং অশ্রদ্ধেয়—যাহারা যোগ্যতা-সত্বেও মুক্তির বিঘ্ন আশঙ্কায় এবং দায়িত্ব এড়াইবার জন্যই চিরকুমার থাকিতে চায়, ইত্যাদি।

রাখাল নির্ব্বিকার হাসিমুখে বন্ধুর যুক্তি এবং ভৎ'সনা নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া গেল। শেষে আহারাদির পর বাসায় ফিরিবার সময় যোগেশের বারংবার পীড়াপীড়ির জবাবে বলিল, আমাকে একটু ভেবে দেখতে সময় দাও ভাই!

যোগেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, বেশ বেশ, এ তো ভাল কথা। তা হলে কবে আন্দাজ তোমার উত্তর পাওয়া যাবে বলে দাও। আসছে পরশু? কেমন?

রাখাল হাসিয়া বলিল, এত বেশি সময় দিচ্ছো কেন? বলো না, আসচে ভোরে—

যোগেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, না না, তা নয়। তবে জানো কি ওদের কন্যাদায় কি-না। একটু বেশি-রকম ব্যাকুল হয়ে রয়েচে। তোমার এই ভেবে দেখা'র সময়টুকু ওদের কাছে খুনী আসামীর জজের রায়ের জন্য অপেক্ষার মতই শ্বাসরোধকর প্রতীক্ষা। তাই বলছিলাম।

রাখাল বলিল, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, আমি কয়েকদিনের মধ্যে তোমাকে জানিয়ে যাবো।

যোগেশকে প্রসন্ন করিয়া রাখাল তাহার মেস হইতে যখন বাহির হইল তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা চলিতেছিল।

বিবাহের পাত্রীটি সে দিল্লীতে নিজ-চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। বয়স আঠারো-উনিশ হইবে। বেশ মোটাসোটা গোলগাল। রং ফর্সা না হইলেও কালো বলা চলে না। চেহারায় স্বাস্থ্যের লাবণ্য আছে। লেখাপড়া মোটামুটি শিখিয়াছে। সূচী-শিল্প ও রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা বলিয়া পাত্রীর পিতা উচ্ছ্বসিত সার্টিফিকেট নিজ-মুখেই অযাচিত দাখিল করিয়াছিলেন।

মেয়েটি রাখাল ও যোগেশকে নমস্কার করিয়া অতিশয় গম্ভীর-মুখে অত্যধিক অবনত শিরে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সেই মেয়েটি যদিই প্রজাপতির দুর্ব্বিপাকে তাহার পত্নী হইয়া গৃহে আসে, কেমন মানাইবে? মেয়েটির সেই অতি-গম্ভীর মুখ ও

উঁচু করিয়া বাঁধা ঢিপির মত মস্ত খোঁপা-সমেত অতি-অবনত মাথাটি মনে পড়িয়া রাখালের অকস্মাৎ অত্যন্ত হাসি আসিল।

জীবনের সর্ব্ব অবস্থায় সকল প্রকার সুখে-দুঃখে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাসি-মুখে আশ্বাস দিতে পারে, আনন্দ ও তৃপ্তি পরিবেশন করিতে পারে, এমনতর ভরসা করা যাইতে পারে কি ঐ মেয়ের 'পরে? দূর দূর!

দিল্লীতে আরও যে-কয়টি পাত্রী রাখালকে দেখানো হয়েছিল তাহারাও কম-বেশী তথৈবচ। রাখালের মানসপটে চিন্তায় চিন্তায় বহু বালিকা কিশোরী তরুণীর রকমারী রূপচ্ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও সে মনে করিতে পারিল না যাহার উপরে চিরদিনের মতো আপন জীবনের সুখ-দুঃখের সকল ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভরতা লাভ করা সম্ভব।

সমস্ত মুখগুলিকে আড়াল করিয়া একখানি কোমল শান্ত অথচ বুদ্ধি-দীপ্ত সুন্দর মুখ বারংবার তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। অথচ বিবাহের পাত্রী নির্ব্বাচন ব্যাপারে সে-মুখ স্মরণে জাগিবার কোন অর্থই হয় না, তাহা আর যে-কেহ অপেক্ষা রাখাল নিজেই ভাল করিয়া জানে। কিন্তু সে যাহাই হউক, রাখালের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় সে-মুখের কান্তিই অন্যবিধ; যাহা আর কাহারো সহিত তুলনা করা চলে না।

শুধু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই নয়, একান্ত আপনজন সুলভ নিবিড় হৃদ্যতার মাধুর্য্য সেই চক্ষু'য়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, অনাবিল হাসির ভঙ্গীতে যাহা স্বতঃই ক্ষরিত হইয়া পড়িত, তাহার সহিত সংসারে আর দ্বিতীয় কাহারো কি উপমা চলে? রাখাল যে তাহারই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-জড়িত অকুণ্ঠ নির্ভরতা লাভ করিয়াই আজ নিজেকে বিবাহের দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া ক্ষণেকের তরেও চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার মূল সূত্র হারাইয়া ফেলিয়া রাখাল সারদার ভাবনাই ভাবিয়া চলিল।

সারদা সেদিন রাত্রে তাহাকে বলিয়াছিল—আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

কিন্তু সত্যই কি তাই? রাখাল অনেকেরই অনেক করে এ কথা হয়তো সত্য, সারদারও সে সামান্য কিছু উপকার বা সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে রাখালের কি কোনও ক্ষতিই হয় নাই! তাহা যদি না-ই হইবে তবে কেন সে সেদিন রাত্রে এমনভাবে আত্মসংবরণে অক্ষম হইল? শুধু সারদাকেই যে রূঢ় তিরস্কার করিল তাহাই নহে, তাহার মাতৃস্বরূপিণী নতুন-মাকে পর্য্যন্ত দু-কথা শুনাইয়া দিল একজন অপর ব্যক্তির সম্মুখেই।

তারককে সারদা যদি যত্ন আদর করে, তাহাতে রাখালের ক্ষুব্ধ হইবার কি আছে। সারদার নিকট রাখালও যে, তারকও সে। বরং রাখাল অপেক্ষা তারক বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাহার এইসকল গুণেরই সেদিন উল্লেখ করিয়াছিল সারদা, তাহাতে এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে যাহার জন্য রাখাল অমন জলিয়া উঠিল? কেন সে অকস্মাৎ নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অনুভব করিল?

ভাবিতে ভাবিতে মুখ চোখ ও কান উত্তপ্ত হইয়া জ্বালা করিতে লাগিল। নিকটস্থ একটা পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরিবিলি কোণের একটি শূন্য বেঞ্চিতে রাখাল সটান শুইয়া পড়িল।

চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল, দিন দুই-তিন পূর্ব্বে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে সে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। একখানি চলন্ত মোটর হইতে ঝুঁকিয়া বিমলবাবু হাত নাড়িয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাখাল বিমলবাবুর পানে তাকাইলে তিনি মোটর থামাইয়া হাত ইসারায় তাহাকে নিকটে ডাকিয়া গাড়ি হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছিলেন। রাখাল নিকটে গেলে বিমলবাবু সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন করেন—তোমার কাকাবাবুর ও রেণুর চিঠিপত্র পেয়েচো কি রাজু?

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া রাখাল বলিয়াছিল, কেন বলুন তো?

বিমলবাবু বলিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেশে গিয়ে তাঁরা কেমন আছেন খবর পাইনি, তাই তোমাকে জিজ্ঞেসা করচি।

রাখাল জবাব দিয়াছিল, তাঁরা ভালই আছেন।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন, তুমি কবে চিঠি পেয়েচ?

সে উত্তর দিয়াছিল, দিন-চারেক হবে। তার পর মৌখিক সৌজন্যে বিমলবাবুকে প্রশ্ন করিয়াছিল, আপনি কোনদিকে চলেছেন?

বিমলবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, একবার সারদা-মার খোঁজ নিতে যাচ্ছি।

ইহাতে অতিমাত্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কোন্ সারদা?

বিমলবাবু ঈষৎ আশ্চর্য্য হইয়া জবাব দিয়াছিলেন, সারদাকে তো তুমি চেনো।

রাখাল শুষ্ককণ্ঠে বলিয়াছিল, সে তো এখানে নেই। নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুরে তারকের কাছে গেছে।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন, সে কি! তুমি কি জানো না সারদা তোমার নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুরে যায়নি?

রাখাল উত্তর দিয়াছিল, না! এ-খবর আমি শুনিনি। আমি তাদের যাবার আগের দিন রাত্রি পর্য্যন্ত সারদার সেখানে যাওয়াই স্থির দেখে এসেছিলাম।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন, তাই স্থির ছিল বটে, কিন্তু আমি স্টেশনে গিয়ে দেখলাম

সারদা আসেনি। তোমার নতুন-মা বললেন, তার যাওয়ার উপায় নেই। আমাকে বলে গেলেন, সারদা একা থাকলো, মাঝে মাঝে তার খোঁজ-খবর নিও। তাই মাঝে মাঝে তার খবর নিতে যাই।

রাখাল পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বলিল, সারদা কেন হরিণপুরে গেল না, জানেন কি?

বিমলবাবু বলিলেন, সারদাকে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম, মালিকের হুকুম ভিন্ন এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র নড়বার তার উপায় নেই।

রাখাল বিমূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিল, কে মালিক?

বিমলবাবু উত্তর দিয়াছিলেন, ঠিক জানি না। হয়তো তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী বলেই মনে হয়।

রাখাল মুদ্রিত-চক্ষে পার্কের বেঞ্চে শুইয়া এস্প্ল্যানেডে বিমলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করিতে লাগিল। সারদা হরিণপুরে নতুন-মার সহিত কেন গেল না? বলিয়াছে মালিকের হুকুম ব্যতীত তাহার অন্যত্র যাওয়ার উপায় নাই। সে মালিক কে? বিমলবাবু কিংবা আর কেউ সারদার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী জীবনবাবুকে সেই ব্যক্তি অনুমান করুন না কেন—একমাত্র রাখাল নিজে নিশ্চিতরূপে জানে, আর যাহাকেই সারদা তাহার মালিক বলিয়া নির্দ্দেশ করুক, পলায়িত বিশ্বাসঘাতক জীবন চক্রবর্ত্তীকে কখনই করে নাই!

বুঝিতে কিছুই তাহার বাকী রহিল না। তবুও রাখালের মনের মধ্যে কোথায় যেন কি একটা বিরোধ বাধিতে লাগিল

এগারোটা বাজিলে পার্কের রক্ষক আসিয়া রাখালকে উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। উঠিয়া ভারাক্রান্ত মনে সে বাসায় যখন পৌছিল তখন সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার পূর্ব্বে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল - কাল সকালে উঠিয়াই সারদার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। চা বাসায় খাইবে না। সারদাকেই চা তৈয়ারী করিয়া দিতে বলিবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর রাখাল মনে মনে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। তারপর নানারূপ অসম্ভব কল্পনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

১৮

পরদিন যখন রাখালের ঘুম ভাঙিল বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। ফেরিওয়ালার উচ্চ হাঁকে গলি মুখরিত। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া রাখাল একটু লজ্জিত-ভাবে উঠিয়া পড়িল। মুখ-হাত ধোওয়া হইলে কামাইবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া পরিপাটিরূপে দাড়ি কামাইয়া ফেলিল। ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবি বাহির করিয়া জামা-কাপড় বদলাইয়া লইল। মনোযোগের সহিত চুল ব্রাস করিতে করিতে চা-পিপাসায় ঘন ঘন তাহার হাই উঠিতে লাগিল। হাসিয়া স্টোভটির পানে তাকাইয়া রাখাল মৃদু-কণ্ঠে কহিল, তোমার এ-বেলা ছুটি।

খুঁটিনাটি কাজ-কর্ম যথাসম্ভব দ্রুতহস্তে সম্পন্ন করিয়া বার্নিশ-করা ঝক্‌ঝকে জুতা জোড়া পরিত্যক্ত ময়লা রুমালে সযত্নে ঝাড়িয়া পায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে পিওন হাঁকিল—টেলিগ্রাম—

রাখাল জুতা ফেলিয়া রাখিয়া উৎসুক আগ্রহে ছুটিয়া আসিল। সহি করিয়া দিয়া টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে দুর্ভাবনায় মুখ তাহার অন্ধকার হইয়া উঠিল। ব্রজবাবু বিশেষ পীড়িত। রেণু তাহাকে সত্বর যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া অল্পক্ষণ দ্বিধাগ্রস্তভাবে সে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল সারদার সহিত আজ আর দেখা করিতে যাইবে কি-না। টাইম-টেবল বাহির করিয়া ট্রেনের সময় দেখিয়া ফেলিল। বেলা ন'টায় একটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু তাহা ধরিতে পারা যাইবে না। এখন সাড়ে-আটটা। বেদানা আঙুর কমলালেবু প্রভৃতি ফলমূল এবং রোগীর প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীও কিছু কিনিয়া লইতে হইবে সুতরাং ন'টার ট্রেন পাওয়া অসম্ভব। পরের ট্রেন বেলা সাড়ে বারোটায়—যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া রাখাল চিন্তিতমুখে সারদার সহিত দেখা করিতে চলিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাইরে যাইবার পূর্ব্বে একবার তাহাকে জানাইয়া যাওয়া উচিত। ইচ্ছা, সেইখানেই সত্বর চা পান করিয়া ফিরিবার মুখে প্রয়োজনী সামগ্রীগুলি কিনিয়া লইয়া সাড়ে-বারোটার ট্রেনে রওনা হইবে।

সারদার বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দেখিল রোয়াকে মাদুর পাতিয়া সারদা চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াইতেছে। কেহ শ্লেটে লিখিতেছে, কেহ বানান

শিখিতেছে, কেহ বা করিতেছে ছড়া মুখস্থ। রাখালকে দেখিয়া সারদা ব্যস্ত অথবা আশ্চর্য্য হইল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া ছেলেদের বলিল, যাও, তোমাদের এখন ছুটি। দুপুরবেলায় আজ পড়তে হবে।

ছেলেরা চলিয়া গেলে সারদা রোয়াক হইতে উঠানে নামিয়া রাখালকে প্রণাম করিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ঘরে বসবেন চলুন।

রাখাল শুষ্ক-কণ্ঠে কহিল, নাঃ, বসবার সময় নেই। দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।

রাখাল হয়তো মনে মনে আশা করিয়াছিল সারদা তাহাকে অভাবিতরূপে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইবে। কিন্তু সারদার ব্যবহারে মনে হইল রাখাল যে আজ এই সময়ে আসিবে তাহা যেন সে পূর্ব্ব হইতে জানিত।

একে রেণুর টেলিগ্রাম পাইয়া মন ছিল উদ্বিগ্ন চঞ্চল, তাহার উপর সারদার সহজ শান্ত অভ্যর্থনা রাখালের চিত্ত বিরূপ করিয়া তুলিল। মনের ভিতরে এমন একটা অহেতুক অভিমান গুমরাইতে লাগিল যাহার কারণ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা কঠিন।

রাখাল বলিল, তুমি মার সঙ্গে হরিণপুর যাওনি শুনলাম।

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর না পাইয়া রাখাল পুনরায় বলিল, কেন গেল না জানতে পারি কি?

সারদা তথাপি নিরুত্তর।

রাখাল কহিল, নতুন-মাকে একলা না পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গী হওয়া তোমার উচিত ছিল না কি?

সারদা কোনই উত্তর দেয় না দেখিয়া রাখালের মনের মধ্যে উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। মৌনতা ভাঙাইবার জন্যই বোধ হয় একবার বলিয়া বসিল, আমার ঋণ তো সেদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিয়েচো, সুতরাং কথার উত্তর না দিলেও চলে, কিন্তু নতুন-মার ঋণও এরই মধ্যে শুধে ফেলেচ নাকি সারদা?

সারদার মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তবুও সে এই কঠিন উপহাসের উত্তর দিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনার যা বলবার আছে ঘরে এসে বলুন। এখানে দাঁড়িয়ে হাটের মাঝখানে বলবেন না। ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এখুনি আসচি। চলে যাবেন না আমার অনুরোধ রইলো।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই সারদা মুহূর্ত্তমধ্যে রোয়াকের অন্য পাশে বেড়া-দেওয়া অপর ভাড়াটের অংশে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিরক্ত রাখাল তাহার উদ্দেশে ব্যস্ত সুরে বলিতে লাগিল, না না, বসবার আমার মোটেই সময় নেই। এখুনি যেতে হবে। যা বলতে এসেচি—শুনে যাও—

কিন্তু সারদা তখন চলিয়া গিয়াছে। রাখাল অল্পক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবে কি আরও একটু অপেক্ষা করিবে দ্বিধা করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত চিত্তে সারদার ঘরে গিয়া বসিয়াই পড়িল। পাঁচজনের বাড়ির মাঝে চেঁচাইয়া সারদাকে বার বার ডাকাও যায় না, দাঁড়াইয়া থাকাটা আরও অশোভন। রাখাল ঘরে গিয়া বসিবার এক মিনিটের মধ্যেই সারদা ক্ষুদ্র এলুমিনিয়ম কেট্‌লির হাতলে শাড়ির আঁচল জড়াইয়া মুঠি করিয়া ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঢাকনি চাপা দেওয়া কেট্‌লি হইতে অল্প অল্প গরম ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। ঘরের কোণে কেট্‌লি নামাইয়া রাখিয়া দ্রুত-হস্তে জানালার মাথার তাকের উপর হইতে একটি ধবধবে শাদা পাতলা কাচের পেয়ালা পিরিচ একখানি নূতন চামচ নামাইল। ক্ষুদ্র চায়ের টিনও একটি নামাইল। চায়ের টিনটি একেবারে নূতন, প্যাক খোলা হয় নাই। সারদা লেবেল ছিঁড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে টিন খুলিয়া ফেলিয়া কেট্‌লির জলে চা-পাতা ভিজাইয়া ঢাকনি চাপা দিল। তার পর পেয়ালা পিরিচ ও চামচ বাহির হইতে ধুইয়া আনিল এবং সেই সঙ্গে লইয়া আসিল কাগজের মোড়কে চিনি ও ক্ষুদ্র কাঁসার গ্লাসে টাট্‌কা দুধ।

চৌকিতে বসিয়া রাখাল নিঃশব্দে সারদার কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। বেলা হইয়াছে যথেষ্ট, অথচ চা পান করা হয় নাই। মাথাটি বেশ ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং সারদার চায়ের আয়োজন দেখিয়া তাহার বিরক্তি ও অভিমান অনেকখানি কমিয়া গিয়াছিল। তথাপি সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্যই বলিল, এত সমারোহ করে চা তৈরী হচ্ছে কার জন্যে?

সারদা পেয়ালায় চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে মৃদু হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার রাখালের পানে তাকাইল। তার পর আবার নিজের কাজে মন দিল।

মনে মনে লজ্জিত হইলেও রাখাল তখন বলিতে পারিল না—আমি উহা খাইব না। সারদা ততক্ষণে দুধ-চিনি মিশ্রিত সোনালী বর্ণ গরম চায়ে চামচ নাড়িতে নাড়িতে পিরিচ-সমেত পেয়ালাটি রাখালের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

লইতে ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া রাখাল বলিল, এর জন্য এতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা তোমার উচিত হয়নি সারদা। কিছু দরকার ছিল না এর।

সারদা নিতান্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, আমি তা জানতাম না। আচ্ছা তবে থাক্, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

ঠোঁটের প্রান্তে চাপা দুষ্ট হাসি। রাখাল ঐ হাসি চেনে। তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া বলিল, নাঃ, করেইচ যখন আমার নাম করে, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

সারদা এইবার ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটু পরে শাদা কাচের একখানি প্লেটে খানকয়েক গরম শিঙাড়া ও গোটা-দুই টাট্‌কা রাজভোগ রসগোল্লা লইয়া ফিরিয়া আসিল।

রাখাল প্লেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ও-সব আবার আনলে কেন সারদা? সারদা গম্ভীর-মুখে বলিল, চায়ের সঙ্গে জলযোগের জন্য। কিন্তু চায়ের পেয়ালাটি যে খালি করে দিতে হবে এবার। আর এক পেয়ালা চা আপনাকে ছেঁকে দেব। আমার অন্য পেয়ালা আর নেই।

রাখাল এবার আর আপত্তি তুলিল না। এক নিশ্বাসে অবশিষ্ট চা-টুকু পান করিয়া লইয়া পেয়ালাটি মেঝেয় নামাইয়া দিল। তাহার পর নির্ব্বিকারে তুলিয়া লইল খাবারের প্লেটখানি।

সারদা দ্বিতীয় পেয়ালা চা লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে রাখাল খাবার খাইতে খাইতে মুখ না তুলিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সারদা, তুমি নিজে ত চা খাও না। ঘরে চায়ের সরঞ্জাম রেখেচ কার জন্যে?

সারদা নিরীহ-মুখে বলিল, এই ধরুন, তারকবাবু-টাবু—

রাখাল বলিল, ও—বুঝেছি। অর্দ্ধ-সমাপ্ত শিঙাড়াটি শেষ করিয়া খাবার সমেত প্লেটখানি রাখাল নামাইয়া রাখিল।

সারদা ব্যস্ত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অকৃত্রিম ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিল, ও কি? রসগোল্লা মোটে ছুঁলেনই না যে! না না, তা হবে না দেব্‌তা! তুলে নিন রেকাবি। সবগুলি না খেলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো কিন্তু বলে রাখচি।

অকস্মাৎ সারদার এই আন্তরিক চাঞ্চল্যে রাখাল হতভম্ব হইয়া বিমূঢ়ের মত পরিত্যক্ত প্লেট তুলিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু আমার যে সত্যি খেতে রুচি নেই সারদা! সমস্ত খাবারগুলি না খেলে কি যথার্থই তোমার কষ্ট হবে?

সারদা আরক্ত মুখে কহিল, হ্যাঁ-হ্যাঁ, হবে। আপনি খান বলচি। রসগোল্লা আপনি কত ভালবাসেন আমি জানিনে বুঝি? সকালে গরম শিঙাড়া চায়ের সঙ্গে রোজই তো আনিয়ে খান? বলুন, খান না?

রাখাল বিস্মিত কৌতুকে বলিল, কিন্তু তুমি এ-সব গুপ্ত সংবাদ জানলে কেমন করে?

সারদা শান্তভাবে কহিল, আমি জানি। তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিল, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো এক পেয়ালা চায়ে আপনার কোনও দিন তেষ্টা মেটে? দু'পেয়ালা চা না হলে মন খুঁৎখুঁৎ করে না কি?

রাখাল রসগোল্লাভরা গালে ভারী গলায় বলিল, হুঁ, বুঝেচি। কিন্তু আমি যে বাসায় চা খাই ঠিক এইরকম বড় পেয়ালায়, তারক কি সে খবরটাও তোমাকে দিয়ে গেছে ?

সারদা জবাব দিল না। রাখালের চা ও খাবার খাওয়া হইয়া গেলে মুখ ধোওয়ার জল ও সুপারি এলাচ আনিয়া দিল।

হাত মুখ মুছিবার জন্য একখানি পরিচ্ছন্ন গামছা হাতে দিয়া সারদা বলিল, উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু-গলায় যা বলতে চাইছিলেন, এইবার উঠানে নেমে তা বলবেন চলুন।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল, সারদা, তুমি দেখছি আজকাল আমাকে প্রতি কথায় উপহাস করো।

জিভ কাটিয়া সারদা বলিল, বাপ্‌রে ? কি বলেন দেব্‌তা ? এতবড় দুঃসাহস আমার নেই। ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবো না ?

রাখাল গম্ভীর-মুখে বলিল, আমি জানতে এসেছিলাম তুমি নতুন-মাকে একা হরিণপুরে পাঠিয়ে কি গুরুতর প্রয়োজনে কলকাতায় রইলে ? তোমাকে সত্যি করে এর জবাব দিতে হবে।

সারদা অল্পক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, আগে আপনি আমার একটি কথার সত্যি করে জবাব দেবেন বলুন ?

দেবো।

যে-প্রশ্ন আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেচেন, নিজে কি তার জবাব সত্যিই জানেন না ?

রাখাল মুস্কিলে পড়িল। আমতা আমতা করিয়া বলিল, আমি যা অনুমান করচি সেটা ঠিক কি-না জানবার জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞেসা করচি সারদা !

সারদা বলিল, তাহলে জেনে রাখুন, মনের কাছ থেকে যে জবাব পেয়েচেন, সেইটেই সত্যি। নিজের অন্তর কখনও মানুষকে ঠকায় না।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সারদা উচ্ছিষ্ট পেয়ালা পিরিচ ও রেকাবি উঠাইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, সেইদিকে তাকাইয়া রাখাল কহিল, তবুও নিজের মুখে বুঝি স্পষ্ট বলতে পারলে না কেন যাওনি !

সারদা হাসিয়া হাতের উচ্ছিষ্ট পেয়ালা প্লেটগুলি ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, এরই জন্যে যাইনি। এইবার স্পষ্ট জবাব পেলেন তো ? বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল, কিছুদিন পূর্ব্বে সে বলিয়াছিল—দুনিয়ার সারদাদের সে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু সত্যই কি তাই ? এই

সারদার সমতুল্য কি আর একটি মেয়েরও জীবনে দেখা পাইয়াছে ? জীবনদানের মূল্যে এমন করিয়া নিঃশব্দে জীবন উৎসর্গ আর কে করিতে পারে ?

ধোওয়া বাসনগুলি আনিয়া তাকের উপরে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সারদা বলিল, প্রথম যেদিন আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন দেব্‌তা, আপনাকে চা তৈরী করে খাওয়াতে চেয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন, অসময়ে চা খাওয়া আমার সহ্য হয় না। জলখাবার আনিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আমার আগ্রহ দেখে আপনার দয়া হয়েছিল। বলেছিলেন, আবার যেদিন সময় পাবো, আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো। সেই থেকে আমি চায়ের সরঞ্জাম ঘরে যোগাড় করে রেখে দিয়েচি। জানতাম একদিন না একদিন আপনি এই ঘরে বসে আমার হাতের চা জলখাবার গ্রহণ করবেনই। কিন্তু বলেছিলেন নিজে চেয়ে নিয়ে খাবো। আমার ভাগ্যে সেটা আর হ'লো না।

রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে পড়িল সে আজ বাসা হইতে বাহির হইয়াছিল চা জলখাবার খাইবে বলিয়াই।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। রাখালের হঠাৎ মনে পড়িল বাজার করিয়া শীঘ্র বাসায় ফেরা প্রয়োজন। সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ আমি যাই সারদা। সাড়ে-বারোটায় আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।

সারদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন ?

কাকাবাবুর বড় অসুখ। রেণু যাওয়ার জন্যে তার করেচে।

সারদা চিন্তিত-মুখে বলিল, নতুন-মাকে খবর দিয়েচেন ?

না। নতুন-মা তো হরিণপুরে। তুমি তাঁর চিঠিপত্র পাও নাকি ?

হাঁ। তিনি প্রতি চিঠিতেই কাকাবাবু ও রেণুর সংবাদ জানতে চান। আপনার কুশলও প্রতি পত্রেই জিজ্ঞেসা করেন।

রাখাল বলিল, তা হলে খবরটা তুমিই তাঁকে লিখে দাও। আমায় তিনি চিঠি-পত্র দেননি।

সারদা বলিল, তা দেব। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন দেব তা। আমার ফিরিতে বেশি দেরি হবে না।

সারদা টিনের তোরঙ্গটি খুলিয়া কতকগুলি কাপড় বাহির করিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারদা মিলের ফর্সা শাড়ি ও মোটা সেমিজে পরিচ্ছন্ন বেশে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি হাতে ঘরে ঢুকিল।

বিস্মিত রাখাল সারদার মুখের পানে চাহিতে সারদা কহিল, আমাকেও যে আপনার সঙ্গে যেতে হবে দেব্‌তা।

রাখাল অতিরিক্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে ?

কাকাবাবুর অসুখ। রেণু ছেলেমানুষ, একলা। আমি গেলে অনেক দরকারে লাগতে পারবো।

রাখাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, কিন্তু—

বাধা দিয়া সারদা বলিল, অমত করবেন না দেবৃতা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। কাকাবাবু আমায় চেনেন, রেণুও আমায় জানে। আমি গেলে ওঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না, দেখবেন। সারদার কণ্ঠস্বরে নিবিড় মিনতি ফুটিয়া উঠিল।

রাখাল দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল সারদাকে সঙ্গে লইয়া গেলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। বলিল, আচ্ছা, চলো তা হলে ; কিন্তু তোমার খাওয়া তো হয়নি ? আমি বাজার করে ফিরে আসছি। তুমি এগারোটার মধ্যে স্নানাহার করে তৈরী হয়ে নাও।

সারদা কহিল, আপনার খাওয়ার কি হবে ?

আমি স্টেশনে রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবো ঠিক করেচি।

আমার রান্না চড়ে গেছে। আপনি সাড়ে দশটার মধ্যে খাবার তৈরী পাবেন। এখানেই আজ দুটি খেয়ে নিন না দেবৃতা।

না, না, আমার খাওয়ার জন্য তোমাকে হাঙ্গামা করতে হবে না। আমি দোকানে খাবার খেয়ে নিতে পারবো।

আপনাকে ভাত খেতে হবে না। গরম লুচি ভেজে দেবো। লুচি খেতে আপনার আপত্তি কি ?

আপত্তি কিছু নেই। এই তো সেদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ খেলাম তোমার কাছে। এখনও পেটের ভিতর চা-জলখাবার হজম হয়নি।

তা হলে খান-কতক লুচি ভেজে দিই ?

খাই যদি ভাতই খাব, লুচি নয়। জাতের বালাই আমার নেই। আমি এখনও তারকবাবু হয়ে উঠতে পারিনি।

সারদা হাসিয়া বলিল, তারকবাবুর উপর এত বিদ্রূপ কেন দেবৃতা ?

রাখাল বলিল, নিশ্চয়ই তুমি জানো, তারক যার তার হাতে অন্নগ্রহণ করে না।

সারদা হাসিতে লাগিল, জবাব দিল না।

রাখাল বলিল, চললুম তা হলে। জিনিস পত্র কিনে একেবারে বাসা থেকে স্নান সেরে বাক্স-বিছানা নিয়ে ফিরবো এখানে ? তুমি প্রস্তুত থেকো ?

রাখাল বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিল প্রায় পৌনে বারোটায়। একটি ফলের টুকরিতে কমলালেবু, বেদানা, আঙুর প্রভৃতি ফল, তালমিছরি, বার্লি, পার্লসাগু, এক-টিন উৎকৃষ্ট মাখন, একটিন রোগীর পথ্য হাল্কা বিস্কুট ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়াছে।

ঐ-ছাড়া, বেডপ্যান, হট্‌ওয়াটার ব্যাগ, আইস ব্যাগ, অয়েল ক্লথ প্রভৃতি রোগীর প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রীও কিনিয়াছে। আর আছে তার বিছানা ও বাক্স।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়াই ভাত চাহিল। সারদা ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া রাখিয়াছিল। রাখালকে হাত-পা-ধুইবার জল ও গামছা আগাইয়া দিয়া ভাত বাড়িয়া আনিল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তৈরী তো সারদা?

সারদা জবাব দিল, আমি তো অনেকক্ষণ তৈরী?

রাখাল আসনে বসিয়া নিঃশব্দে আহারে মন দিল। আহারের আয়োজন অতি সামান্যই। কিন্তু তাহার অন্তরালে যে আন্তরিকতা ও সযত্ন আগ্রহ বর্ত্তমান, তাহার পরিচয় রাখালের অন্তরে অজ্ঞাত রহিল না। তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া উঠিলে সারদা আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দিল। রাখাল জীবনে কোনও দিন এরূপ সেবা-গ্রহণে অভ্যস্ত নহে। সুতরাং তাহার যথেষ্ট বাধ বাধ ঠেকিতে ছিল। কিন্তু সারদার এই ঐকান্তিক আগ্রহ যত্নে বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না। আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়িকা দিল। তারপরে গামছাখানি রাখালের হাতে তুলিয়া দিয়া সারদা গুটিকয় টাটকা সাজা-পান আনিয়া সামনে ধরিল।

রাখাল কহিল, একেই বলে বিধাতার মাপা। কোথায় স্টেশনে কেনা খাবার, আর কোথায় সারদার হাতের রান্না অমৃতোপম অন্নব্যঞ্জন! মায় আঁচাবার জল, দাঁত খোঁটার খড়কে, হাত মোছার গামছা, ঘরে সাজা পান! আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম!

সারদা মৃদু হাসিল, কিছু বলিল না। রাখালের উচ্ছিষ্ট থালা-বাটী বাহিরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল, আপনি একটু বসুন। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসচি।

রাখাল একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া শূন্য তক্তাপোষের এককোণে বসিয়া পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক টানিতে প্রবৃত্ত হইল। চাহিয়া দেখিল, সারদা একখানি ক্ষুদ্র সতরঞ্চি-মোড়া বিছানার ছোট বাণ্ডিল তক্তাপোষে রাখিয়া গিয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলি বা বাক্স নাই।

সারদা ফিরিয়া আসিল সত্য সত্যই দশ মিনিটের মধ্যে। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার খাওয়া হয়েচে সারদা?

সারদা বলিল, খেতেই তো গিয়েছিলাম।

সে কি? এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল? নিশ্চয়ই তুমি ভাল করে খাওনি।

সারদা হাসিয়া কহিল, আজ আমি সবচেয়ে ভাল করে খেয়েচি। দেব্‌তার প্রসাদ কি হেনস্তা করে খেতে আছে? এখন নিন, উঠুন। সব প্রস্তুত। আপনার

তো দেখচি লগেজ অনেকগুলি। একটি স্যুটকেস, একটি এটাচি কেস, একটি বিছানা, একটি ফলের ঝুড়ি, একটি প্যাকিং বাক্স, মায় একটি জীবন্ত লগেজ পর্য্যন্ত।

রাখাল সারদার পরিহাসের জবাব না দিয়া বলিল, তোমার তো বেডিং প্রস্তুত দেখচি। কাপড়-চোপড়ের বাক্স কই?

সারদা বলিল, খান-তিনেক শাড়ি আর গোটা-দুই সেমিজ ঐ বিছানার সঙ্গেই বেঁধে নিয়েচি।

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল, ওতে কুলোবে কেন?

সারদা মৃদু হাসিয়া বলিল, যথেষ্ট। ময়লা হলে সাবান দিয়ে সাফ করে নেবো, যা নিত্য এখানে করি।

রাখাল একটুখানি গুম হইয়া রহিল। বারংবার মনে হইতে লাগিল বলে, কাপড়ের তোমার এত অভাব, এটা কি আমাকে জানালে তোমার অপমান হতো সারদা? কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। রাগের ঝোঁকে টাকা লইবার কথা মনে পড়ায় নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল। রাখাল উদাস-কণ্ঠে কহিল, তা হলে এবার ট্যাক্সি নিয়ে আসি।

সারদা সচকিতে বলিয়া উঠিল, ওমা—বলতে একেবারেই ভুলে গেছি দেবতা—আপনি বাজার করতে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই বিমলবাবু এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন একটা জরুরী কাজে যাচ্ছেন, এখনই ফিরে আসবেন। আপনার সঙ্গে তাঁর দরকার আছে। তিনি তাঁর মোটরে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবেন বলে গেলেন।

রাখালের মুখ-ভাবের কোমলতা অন্তর্হিত হইল। শুষ্ক-স্বরে কহিল, আজকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই সারদা, ফিরে এসে দেখা হবে। দেরি করা চলে না, আমি ট্যাক্সি আনতে চললুম।

রাখালের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সদর দরজায় সম্মুখে মোটরের হর্ন শোনা গেল এবং উঠান হইতে বিমলবাবুর আওয়াজ পাওয়া গেল—সারদা-মা—

সারদা বাহির হইয়া বলিল, আসুন—

বিমলবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এই যে রাজু এসে গেছো। ভাগ্যে আজ এদিকে একটা দরকারে এসেছিলাম। মনে হ'লো পাশেই যখন এসে পড়েছি, সারদা-মাকে একবার দেখে যাই। এসে শুনলাম ব্রজবাবুর অসুখের তার পেয়ে তোমরা আজই রওনা হচ্ছো। চলো তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি; বড় গাড়িটাতেই আজ বেরিয়েচি, মালপত্র নেওয়ার অসুবিধা হবে না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাখাল আপত্তি করিতে পারিল না। জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠানো হইলে বিমলবাবু রাখালের হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, আমার একটি অনুরোধ রেখো,

ব্রজবাবুর অসুখে যদি কোনও রকম সাহায্যের প্রয়োজন বোঝ, আমাকে তার করতে ভুলো না। রোগে অর্থবল ও লোকবল দুয়েরই দরকার। তুমি জানালে তৎক্ষণাৎ বড় ডাক্তার নিয়ে রওনা হতে পারবো। আমি ব্রজবাবু ও রেণুর অকৃত্রিম হিতার্থী, বিশ্বাস করতে দ্বিধা ক'রো না।

বিমলবাবুর কণ্ঠের দৃঢ়তায় রাখাল বোধ হয় একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই ঈষৎ আশ্চর্য্যভাবেই তাঁহার মুখের পানে তাকাইল।

ম্লান হাসিয়া বিমলবাবু বলিলেন, আমি জানি রাজু, তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আজ তাঁদের আর কেউ নেই। তবুও আমার দ্বারা যদি তাঁদের কোনও দিক থেকে কোনও উপকার বিন্দুমাত্রও সম্ভব মনে করো, খবর দিতে ভুলো না। এইটুকু তোমায় জানিয়ে রাখলাম।

রাখাল কি-যেন বলিতে যাইতেছিল, বিমলবাবু বলিলেন, রেণু আর ব্রজবাবু আজ কত বেশি অসহায় আমি তা জানি রাজু।

রাখালের দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। বলিল, আপনার প্রতি অবিচার করেছি আমাকে ক্ষমা করবেন। কাকাবাবুর অসুখে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় আপনাকে সংবাদ দেব।

অসমাপ্ত*

* ১৮শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রের রচিত হইবার পর ১৯শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমতী রাধারাণী দেবী উহা সমাপ্ত করেন।

১৯

তারকের সুনিপুন সেবায় যত্নে ও সুন্দর ব্যবহারে সবিতার পরিশ্রান্ত মন অনেকখানি স্নিগ্ধ হইয়াছিল। উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত অন্তর লইয়া সবিতা তারকের প্রতি ব্যবহার, প্রতি কর্ম্ম, প্রতি কথাবার্ত্তার মধ্যে আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। তারকও সবিতাকে নিজের মায়ের মতই শুধু নয়, দেবতাকে ভক্ত যেমন নিরঙ্কুশ ত্রুটিহীনতায় সেবা করে তেমনই ভাবে সেবা-যত্ন সমাদরের বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নাই।

কথাপ্রসঙ্গে সবিতা একদিন তারককে প্রশ্ন করিলেন, তারক, তুমি আমাকে যে হরিণপুরে নিয়ে এলে বাবা, রাজুকে কি জানাওনি?

একটু কুণ্ঠিতভাবে তারক উত্তর দিল, না মা।

বিস্মিত হইয়া সবিতা বলিলেন, কিন্তু তাকেই তো তোমার সবার আগে জানানো উচিত ছিল তারক!

তারক কহিল, কেন জানাইনি সে-কথা আপনাকে একদিন বলবো মা।

সবিতা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, দুই বন্ধুর ভিতরে তোমাদের এমন ব্যাপার এরই মধ্যে ঘটে গেল যা মাকেও জানাতে কুণ্ঠিত হতে হচ্চে বাবা!

নতমুখে তারক কহিল, রাখাল হয়তো সে অভিযোগ আপনাকে জানিয়েচে, কিংবা না জানিয়ে থাকলে শীঘ্রই একদিন জানাবেই। সেজন্য আমিও আপনাকে সমস্ত বলবো ঠিক করেচি মা।

তারকের মুখের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সবিতা বলিলেন, রাজুর তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনেচি। আমি জানতাম তাকে তুমি চেনো। এখন বুঝতে পারচি, তুমি আমার রাজুকে চেননি বাবা!

তারক চঞ্চল হইয়া বলিল, কেন মা?

সবিতা বলিলেন, যত বড় অন্যায়ই যে-কেউ তার উপর করুক না, রাজু দুনিয়ার কারো কাছে কারো নামে কখনো অভিযোগ করেনি, করবেও না। অভিযোগ করার শিক্ষা জীবনে সে পায়নি তারক, সহ্য করার শিক্ষাই পেয়েচে।

তারক আরো কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, বলিল, আমাকে মাপ করুন মা, আমার বলবার দোষে ভুল বুঝবেন না। বলতে চেয়েছিলাম, রাখালের কাছে আপনি আমার সম্বন্ধে যে ঘটনা শুনেচেন, কিংবা শুনবেন, সেটা বাহ্যতঃ সত্য হলেও সমস্ত সত্য নয়।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, আমি রাজুর কাছে কিছুই শুনিনি বাবা, কোনও দিন শুনতে পাবোও না, সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

তারক অকস্মাৎ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু এটা আমি কিছুতেই মানতে পারবো না মা, আপনার কাছেও আমাদের বিচ্ছেদের কারণ গোপন করা তার উচিত হয়েচে! আপনি শুধু তাকে স্নেহরসে ও অন্নরসেই পুষ্ট করে তোলেন নি, আপনার কাছেই পেয়েচে সে শিক্ষা দীক্ষা যা-কিছু সমস্ত! আজ সে যে পৃথিবীতে বেঁচে আছে এবং ভদ্রলোকের মতোই বেঁচে আছে, এর জন্য বিপুল ঋণ তার কার কাছে? কার আশ্চর্য্য অসাধারণ মন, অসাধারণ জীবন রাখালের দৃষ্টি ও মনকে এতখানি প্রসারিত করে তুলেচে? কার অপার স্নেহ, অন্তরাল হতে বিধাতার মতোই তার জীবনকে সতর্কভাবে রক্ষা করে আসচে? সেই মায়ের কাছে সত্য গোপন করা আমি ন্যায় বলে মানতে পারবো না মা। আপনি বললেও না।

এক নিশ্বাসে এতখানি বক্তৃতা করিয়া তারক দম লইতে লাগিল।

সবিতা স্থির-দৃষ্টিতে তারকের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিলেন। ধীর-কণ্ঠে কহিলেন, তারক, তোমাদের কি হয়েচে বাবা?

বলি শুনুন তা হলে মা। রাখাল আমার কাছে আপনার পরিচয় যা দিয়েছিল, যদি আপনাকে সত্যিই সে নিজের মা বলে জ্ঞান করতো, তাহলে সে-পরিচয় দিতে কখনই পারতো না।

সবিতা কোনও কথা কহিলেন না এবং তাঁর সস্মিত মুখভাবেরও কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

তারক পুনরায় সোৎসাহে বলিতে প্রবৃত্ত হইল, আপনি বলেছিলেন মা, কারো সম্বন্ধে কোনও কথা উপযাচক হয়ে বলা তার প্রকৃতি নয়। কিন্তু আমিই তো তার বিপরীত প্রমাণ পেয়েচি। সে উপযাচক হয়েই আমার কাছে তার নতুন-মার এমন পরিচয় দিয়েছিল যা আমার জানবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু নির্ব্বোধ বোঝেনি, আগুনকে ছাই বলে নির্দ্দেশ করলে প্রথমে হয়তো মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু সে ভুল বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। অগ্নি নিজের পরিচয় নিজেই প্রকাশ করে।

সবিতা এবারও জবাব দিলেন না। পূর্ব্ববৎ সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলিয়া মৌনই রহিলেন।

তারক বলিতে লাগিল, অবশ্য আমি স্বীকার করি মা, সে যখন অনেক-কিছু অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিল—এ সকল শুনে আমার ঘৃণা হচ্ছে কি না? আমি জবাব দিয়েছিলাম—ঘৃণা, হওয়াই তো স্বাভাবিক রাখাল। তখন তো জানতাম না তার উদ্দেশ্যই ছিল আপনার 'পরে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়া! তা না হলে এ-সব কথা বলার তার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

সবিতা এইবার কথা কহিলেন, শান্ত-কণ্ঠে বলিলেন, রাজু মিথ্যা কথা বলে না তারক। সে যা-কিছু তোমাকে বলেচে সমস্তই সত্যি।

তারকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আপনি জানেন না, সে যে কি ভয়ানক কথা—

সবিতা কহিলেন, জানি। তুমি যাই কেন শুনে থাকো না তারক, রাজুর মুখের কোন কথাই মিথ্যা নয়।

তারকের কণ্ঠনালী কে যেন শক্ত মুঠোয় চাপিয়া স্বররোধ করিয়া ফেলিল। চেষ্টা সত্ত্বেও আর একটি শব্দও কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল না।

সবিতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তুমি রাজুর প্রতি শুধু ভুলই করোনি তারক, অবিচার করেচ। সে তোমাকে ভুল বোঝাতে চায়নি, বরং তুমিই পাছে কিছু ভুল বোঝো সেই ভয়ে গোড়াতেই সমস্ত ঘটনা খোলাখুলিভাবে তোমাকে সে জানিয়েচে। যদি মনে করে থাকো তার কথা মিথ্যে, তাহলে খুবই ভুল করেচো।

তারক শুষ্ক-স্বরে কহিল, কিন্তু মা, আমি তো কিছুই জানতে চাইনি, সে উপযাচক হয়ে কেন—

সবিতা মলিন হাসিয়া কহিলেন, তুমি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। সমস্ত দিকে মন মেলে চিন্তা করে ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি তোমার থাকাই সম্ভব। সংসারে দৃশ্যতঃ অনেক জিনিসই হয়তো আমরা একরকম দেখতে পাই, কিন্তু সাদৃশ্য থাকলেও তারা সমস্তই বস্তুতঃ এক নয়। তা ছাড়া, এটা তো জানো—বাহির দিয়ে ভিতরের বিচার কোনও সময়েই করা চলে না। এ-সকল বিষয়ে সাধারণ লোকে বোঝে না এবং বুঝতে চায়ও না। কিন্তু তুমি তাদের দলের নও; রাজু তা জানতো বলেই সে তার নতুন-মায়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী তোমার কাছে খুলে জানিয়েছিল।

তারক অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে মুখে তুলিয়া কহিল, রাখাল আমাকে বলেছিল মা একদিন, সংসারে হাজারের মধ্যে ন'শো নিরানব্বুই-জন সাধারণ মেয়ে, ক্বচিৎ কখনও একটি অসাধারণ মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়—নতুন মা সেই ন'শো নিরানব্বুইয়ের পর ক্বচিৎ মেলা একটি মেয়ে। এঁকে কেউ ইচ্ছা করলেও অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে পারে না। সে সত্যি কথাই বলেছিল।

সবিতা কথা কহিলেন না, অন্যমনস্কে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারক একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া কণ্ঠস্বরে আবেগ আনিয়া বলিতে লাগিল, শিশুবয়সে মাকে হারিয়েচি জ্ঞান হবার আগেই, চিনতাম কেবলমাত্র বাবাকে। বাবাই আমাকে নিজ-হাতে মানুষ করেছিলেন, বড় করেছিলেন। সেই বাবা যখন আত্মসুখলোভে এনে দিলেন মাতৃহারা সন্তানকে এক বিমাতা, সেইদিনই দুঃখে অভিমানে ঘৃণায় চলে এসেছিলাম দেশত্যাগী হয়ে। বাপের মুখ আর দেখিনি, দেশেরও নয়। আপনাকে

পেয়ে মা, জীবনে নতুন করে পেলাম পিতৃ-মাতৃস্নেহের আস্বাদ। আমার কাছে আপনি মা ছাড়া অন্য আর কিছুই নয়। আপনার জীবনে যে ঝড়, যে আঘাত, যে গুরুতর পরীক্ষাই এসে থাক না, আপনার হৃদয়ের অপরিমেয় মাতৃস্নেহকে তা বিন্দুমাত্র শোষণ করতে পারেনি। সন্তানের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সবিতা বলিলেন, তোমার বাবা এখনও জীবিত? তবে যে তুমি একদিক আমাকে বলেছিলে তুমি পিতৃমাতৃহীন?

তারক হাসিয়া কহিল, ঠিক বলেচি মা। আমার জন্মদাতা হয়তো আজও জীবিত থাকতে পারেন, আমার বাবা কিন্তু জীবিত নেই। পিতার মৃত্যু না ঘটলে মাতৃহারা অভাগা সন্তানের জীবনে বিমাতার আবির্ভাব ঘটে না, এই-ই আমার বিশ্বাস।

সবিতা বিস্মিত-নেত্রে তারকের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

তারক বলিতে লাগিল, জীবনে আমার বৃহৎ আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক। শুয়ে খেয়ে-পরে কোনরকমে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকতে চাইনে। আমি চাই প্রাচুর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সার্থক সুন্দর জীবন নিয়ে বাঁচতে। হাজার জনের মাঝখানে আমার প্রতি সবার দৃষ্টি পড়বে, হাজার নামের মাঝখানে আমার নামটি চিনতে পারবে সকলেই। কর্ম্মজীবনের সার্থকতায়, যশে গৌরবে, সম্মানে প্রতিপত্তিতে উন্নত বৃহৎ জীবন নিয়ে বাঁচবো এই আমি চাই। শুধু অর্থ উপার্জ্জনই জীবনের একান্ত কামনা নয়, শুধু স্বাচ্ছন্দ্য-জীবিকানির্ব্বাহই আমার চরম লক্ষ্য নয়!

সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এ তো খুব ভালো বাবা! পুরুষমানুষের জীবনে এমনিতরই উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন। লক্ষ্য থাকবে যত উঁচু, যত বিস্তৃত—জীবনও হবে তত প্রসারিত।

তারক উৎসাহিত হইয়া বলিল, আপনাকে তো জানিয়েচি মা, কত দুঃখে-কষ্টে, কত বাধায়, নিজে আত্মনির্ভর হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হয়েচি। আমি বড় জেদী মা। যা করবো বলে সঙ্কল্প করি—বিশ্রাম থাকে না আমার, যে পর্য্যন্ত না তা সিদ্ধ হয়।

সবিতা স্মিত-মুখে তারকের যৌবনোচিত আশা-আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহদীপ্ত মুখখানির পানে তাকাইয়া অন্য-মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তারক বলিতে লাগিল, আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী একমাত্র আপনাকে খুলে বলেচি মা। কি জানি কেন এক এক সময়ে মনে হয়, জীবনে বুঝি কিছুই পাইনি, কিছুই পেলাম না। মনে হয় যদি কোনদিন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করি, তাতে আর কি লাভ হবে? যশেও যদি দেশদেশান্তর ভরে যায়, তাতেই বা কি? সম্মান-প্রতিপত্তির সবচেয়ে উঁচু চূড়াতে উঠলেও কি আমার আশৈশবের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মিটবে? চিরদিন যে-অভিমান যে-দুঃখ নিজের গোপন অন্তরের মধ্যেই একাকী বহন

করলাম, বিধাতার কাছে পর্য্যন্ত জানালাম না অভিযোগ, সে-বেদনা কি কোনদিন দূর হবে আমার অর্থ মান যশ বা কর্ম্মজীবনের চরিতার্থতা দিয়ে? সমস্ত প্রাণ যেন হা হা করে ওঠে, মুশড়ে পড়ে যা-কিছু কর্ম্মের উৎসাহ আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা। মনে হয়েচে, অদৃষ্ট দেবতা যে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে শৈশবেই করেচেন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, সে যে কতবড় দুর্ভাগ্য নিয়ে মানুষের হাটে এসেচে, সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা করে না। জীবজগতের স্রষ্টার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান মাতৃস্নেহ, সেই স্নেহেই যে আজীবন বঞ্চিত, তার আর—বেদনার আবেগে তারকের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল।

সবিতার চোখের কোণ সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিছুই বলিলেন না, সান্ত্বনাও দিলেন না। মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল সহানুভূতির ছায়া। যে নিবিড় বেদনা তিনি নিঃশব্দে অতি সঙ্গোপনে অন্তরের নিভৃতে একাকী বহন করিয়া আসিতেছেন, সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাঁহার সেই বেদনাস্থানই তারক করিয়াছে আজ অজ্ঞাতে স্পর্শ। তারকের শেষের কথা-কয়টি সবিতার সমগ্র অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নিঃশব্দে নত-নয়নে তিনি নিজের অশান্ত হৃদয়াবেগ সংযত করিতে লাগিলেন।

সদর দরজায় পিওন হাঁকিল—চিঠি—

তারক বাহিরে গিয়া পত্র লইয়া আসিল।

সবিতার নামে চিঠি। সারদা লিখিয়াছে। সংবাদ দিয়াছে, বিমলবাবুর সহিত রাজুর দেখা হইয়াছিল রাস্তায়। তাঁহার মুখে বিমলবাবু সংবাদ পাইয়াছেন—দেশে কন্যাসহ ব্রজবাবু কুশলেই আছেন।

সবিতা পত্র পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, রাজু বোধহয় সারদার সঙ্গে দেখা করতে আসে না। আসবেই বা কি করে, সে হয়তো জানেই না সারদা হরিণপুরে আসেনি।

তারক কথা কহিল না।

সবিতা আবার বলিলেন, দেখি, আমিই না হয় তাকে একখানা চিঠি লিখে দিই। এক কাজ করো না তারক, তুমি তাকে এখানে আসবার নিমন্ত্রণ করে চিঠি লেখো, আমিও তার সঙ্গে লিখে দেবো এখানে আসতে। এখানে সে এলে তোমাদের দুই বন্ধুর মান-অভিমানের মীমাংসা হয়ে যাবে।

তারক বলিল, বেশ তো। আমি লিখে দিচ্চি আজই।

সবিতা স্নেহস্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, রাজু আমার বড় অভিমানী ছেলে। কিন্তু তার অন্তরের তুলনা কোথাও দেখলাম না।

কথাটা সবিতা বলিলেন এমনই সহজভাবেই, কিন্তু তারকের চিত্তে ইহা অন্য অর্থে

আঘাত করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল নতুন-মা বোধহয় তাহারই অন্তঃকরণের সহিত তুলনা করিয়া রাজুর সম্বন্ধে এই কথা বলিলেন। তাহার মুখ হইয়া উঠিল অন্ধকার, বাক্য হইয়া গেল নিস্তব্ধ।

সবিতা তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বিগলিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, রাজুর কথা যখন ভাবি তারক, তখন মনে হয়, আমার রাজু বেশি স্নেহের ধন, না রেণু? রাজু আর রেণু ওদের দুজনের মধ্যে কে বেশি আর কে কম আমি ঠিক করে উঠতে পারিনে।

তারক বলিয়া উঠিল, নিজের অন্তর তা হলে এখনও আপনি চেনেননি মা। রেণুর সঙ্গে রাজুর কোন তুলনাই হতে পারে না।

সবিতা বলিলেন, কেন বলো তো?

রাজুকে আপনি যতই আপন সন্তানের তুল্য ভাবুন না কেন, তবু সেটা আপন সন্তানের তুল্যই থেকে যাবে। তুল্য বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ আপন সন্তান হয়ে উঠবে না, উঠতে পারেও না।

সবিতা বলিলেন, সকল ক্ষেত্রে সব ব্যাপার একরকম হয় না তারক।

তা জানি মা। তবু বলি শুনুন। আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, আপনার অন্তরের স্নেহাধিকারে রেণু আর রাজুর সমান দাবি যতই থাক্ না, পার্থক্য যে কত বেশি তা দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরুন, আপনার এই হরিণপুরে আসা। রওনা হবার আগের রাত্রে শুনলাম, রাখাল আপনাকে নিষেধ করেছিল হরিণপুরে আসতে। আপনি নাকি বলেছিলেন—ছেলে বড় হলে তার সম্মতি নেওয়া দরকার। তাই শুনে সে অসম্মতিই জানিয়েছিল, আপনি তা ঠেলে এলেন আমার এখানে। কিন্তু মা, রেণু যদি আপনার এখানে আসার এতটুকু অনিচ্ছার আভাসমাত্র জানাতো, আপনি হরিণপুরে আসা তখনই বন্ধ করে দিতেন নিশ্চয়।

সবিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমি জানতাম তারক, রাজু কেবল-মাত্র অভিমান বশে রাগ করেই আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল। ওটা তার তর্ক বা জেদ মাত্র। সত্যি-সত্যিই যদি আমাকে এখানে পাঠাবার তার অনিচ্ছা থাকতো, তা হলে আমি কখনই আসতে পারতাম না বাবা।

কিন্তু ধরুন, রেণু যদি কেবলমাত্র জেদ কিংবা তর্ক করেই আপনাকে কোনখানে যেতে নিষেধ করতো, আপনি তার সেই তর্ক ও জেদের খাতির না রেখে পারতেন কি মা?

সবিতা মৌন হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি ঠিকই বলেচ তারক। মানুষ নিজের অন্তরকেই বোধ হয় সবচেয়ে কম চেনে। তবে একটা কথা। রাজু আমার কাছে রেণুর বাড়া না হতে পারে, আমি কিন্তু রাজুর কাছে

মায়ের বাড়ী। আমার দিক দিয়ে না হোক, রাজুর নিজের দিক দিয়ে কিন্তু ও আমার রেণুরও বাড়ী। এখানে আমার ভুল হয়নি।

তারক চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিয়া কহিল, বিমলবাবুর চিঠি তো কই এলো না মা আজও।

সবিতা বলিলেন, তুমি কি তাঁকে সম্প্রতি চিঠি লিখেচ।

লিখেচি বৈ কি! আপনাকে তিনি চিঠি দেননি বোধ হয় আট-দশদিন হবে। তাই নয় কি?

হাঁ। কিন্তু আমি তাঁর আগের চিঠির জবাব এখনও পর্য্যন্ত দিইনি। সেইজন্যই বোধ হয় আমাকে চিঠি লেখেননি। কারণ, তিনি কুশলে আছেন, সারদার পত্রে তো তা জানতেই পাচ্চি।

তারক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, ঐ একটি মানুষ দেখলাম মা, যাঁর পায়ের কাছে আপনিই মাথা নীচু হয়ে আসে।

সবিতা জবাব দিলেন না।

তারক আপনা-আপনিই বলিতে লাগিল, কি মহৎ মন, উদার চরিত্র, সুন্দর মানুষ। প্রকৃত কর্ম্মবীর। জীবনে এমন সার্থককাম পুরুষ অল্পই চোখে পড়ে।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও-কথা কি হিসাবে বলচো তারক? একমাত্র আর্থিক উন্নতি ভিন্ন সংসারে আর কোন চরিতার্থতা লাভ করেচেন? কি-ই বা বড়ো আনন্দ সঞ্চয় করতে পেরেচেন সারা জীবনে?

তারক উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিল, যে পুরুষ নিজেরই সামর্থ্যে অমন বিপুল অর্থ অনায়াসে উপার্জ্জন করতে পারেন, এমন প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারেন, তাঁর জীবনে অন্য ছোটখাটো সার্থকতা কিছু ঘটুক বা না ঘটুক তা নিয়ে আক্ষেপ নেই মা। পুরুষমানুষের কর্ম্মময় জীবনের এইরকম বিরাট সার্থকতার চেয়ে আর অন্য কি কাম্য থাকতে পারে বলুন?

সবিতা হাসিলেন, জবাব দিলেন না। তারকের মুখে পুরুষমানুষের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত তিনি অনেক বড় বড় কথা ও বৃহত্তর কল্পনাই শুনিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু তাহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থকতার লক্ষ্য কোন্ পথে, তা সে কোনদিনও স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই বা করে নাই।

সবিতা তারকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপের ঈষৎ আভাস এইবার যেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চিন্তাধারা কেমন এক অনির্দ্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া গেল।

শিবুর মা আসিয়া ডাকিল, মা, বেলা হয়ে যাচ্ছে, রান্না চড়াবেন চলুন।

তারক বলিল, অনেকদিনই তো মায়ের হাতে অমৃত প্রসাদ পেলাম। এইবার র াঁধুনিটাকে হাঁড়ি ধরতে অনুমতি দিন! এই দারুণ গরমে আগুন-তাতে আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে -

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, আগুন-তাতে রান্না করলে বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাঙে না তারক, উন্নতি হয়।

সে সাধারণ বাঙালী মেয়েদের হতে পারে মা, আপনি তাদের দলে ন'ন আমি জানি।

তুমি কিচ্ছু জানো না বাছা।

না মা, আমি শুনবো না, কলকাতার বাসায় আপনার র াঁধুনি-বামুন ছিল দেখেচি। এখানে কেন আপনি র াঁধুনির হাতে খাবেন না বলুন তো? র াঁধুনীর হাতে প্রবৃত্তি হয় না এটা আপনার বাজে ওজর। আসল কথা, নিজে পরিশ্রম করতে চান।

তাই যদি হয় তারক; তাতে আপত্তি কেন বাবা?

অকৃত্রিম আন্তরিকতায় প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তারক কহিল, না তা হয় না আমার রাজরাজেশ্বরী মাকে আমি প্রতিদিন র াঁধতে, বাটনা বাটতে, কাপড় কাচতে দিতে পারবো না। এ সত্যিই আপনার কাজ নয় যে মা!

সবিতার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল। একান্ত অন্যমনস্কচিত্তে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

তারক বলিল, আজ থেকে ঝি আর র াঁধুনি আপনার কাজ করবে, আমি বলে দিচ্চি ওদের। আর আপনার এ-সব অত্যাচার চলবে না কিন্তু।

সবিতা সকরুণ হাসিয়া কহিলেন, তারক, আমার 'পরেই অত্যাচার হবে বাবা, যদি আমাকে এইটুকু কাজকর্মও করতে না দাও। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলচি, র াঁধুনীর রান্না আর আমায় গলা দিয়ে নামবে না। দাসী-চাকরের সেবা গায়ে আমার বিছুটির চাবুক মারবে। এ জেনেও যদি তুমি আমার নিজের কাজের জন্য চাকর-চাকরানী বহাল করতে চাও, আমি নিরুপায়!

তারক বিস্ময়াভিভূত হইয়া কহিল, আপনি কি চিরদিনই এমনিভাবে নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করবেন মা?

সবিতা কহিলেন, চিরদিন করবো কি-না জানিনে বাবা। তবে আজকে আমি পারচিনে সইতে দাসদাসীর সেবা, এইটুকুমাত্র বলতে পারি। ঈশ্বর যদি কখনও মুখ তুলে চান, তোমারই কাছে আবার এক সময় এসে খাটে পালঙ্কে বসে চাকর-দাসীর সেবা নেবো বাবা।

তারক সবিতার কথার রহস্যভেদ করিতে পারিল না, দুঃখিত-চিত্তে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল, মা, মানুষকে মানুষ ছোট ভাবে কি করে, তাই ভাবি। আমি কিন্তু মানুষের পরিচয় একমাত্র মানুষ ছাড়া জাত-গোত্র-কুল-শীল দিয়ে আলাদা করে ভাবতে পারিনে। সেইজন্য আমার কাছে মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত সমস্তই সমান।

সবিতার বিষাদ-গম্ভীর মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আমি তা জানি তারক। তোমার অন্তঃকরণ কত যে উঁচু ও উদার, তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্ব্বেই তা জেনেচি। তোমাকে আমি স্নেহ করি, বিশ্বাস করি বাবা।

তারক বিস্ময় ও কৌতূহলমিশ্রিত কণ্ঠে কহিল, আমাকে দেখার আগে থেকেই আমার পরিচয় জেনেছিলেন মা? কই, এতদিন তো বলেননি।

সবিতা সস্নেহে হাসিলেন।

তারক কহিল, কিন্তু যার কাছে আমার কথা শুনে থাকুন না কেন, আমি যে বিশ্বাসের উপযুক্ত তা কি করে জানলেন বলুন তো?

মমতাকোমল-কণ্ঠে সবিতা বলিলেন, কি করে যে জানলাম, তা নাইবা শুনলে বাবা! তবে জেনেচি বলেই তোমার স্নেহের আহ্বান রাখতে রাজুরও মনে ব্যথা দিয়ে এখানে এসেচি, এতে কোনও ভুল নেই।

তারক অভিভূত-স্বরে কহিল, আমাকে এত স্নেহ এত বিশ্বাস করেন মা?

সবিতা গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, শুধু বিশ্বাস নয় বাবা, তারও চেয়ে বড় কথা, তোমার উপরে নির্ভর করার সাহস আমি পেয়েচি। তুমি তো জানো তারক, আমার ছেলে নেই। রাজু আমার ছেলের অভাব পূর্ণ করলেও এখনও কিছু অপূর্ণ আছে। তোমাকে সে শূন্যতা পূর্ণ করতে হবে বাবা।

তারক বিস্ময়-বিমূঢ়-চিত্তে অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল।

২০

সারদাকে লইয়া রাখাল যখন ব্রজবাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া পৌঁছিল, রোগের প্রবল প্রকোপ তখন কতকটা সামলাইয়া উঠিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ন নাই। এই অসুস্থতায় ব্রজবাবু দেহের সহিত মনেও নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাখালকে দেখিয়া তাঁহার নিমীলিত নেত্র বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্বভাবতঃ কোমলচিত্ত রাখাল তাহার পিতৃতুল্য প্রিয় কাকাবাবুর অসহায় অবস্থা দেখিয়া চোখের জল সংবরণ করিতে পারিল না।

ব্রজবাবু মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, রাজু, তোমাকে আমি ডেকেচি—

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিলেন, তোমার বোনটিকে দেখবার কেউ নেই বাবা। ওর জন্যেই তোমাকে ডাকা।

রাখাল কথা কহিল না। ব্রজবাবু অতিশয় ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন, রাজু, এখানে এরা আমাকে একঘরে করে রেখেচে। আমার গোবিন্দজী তাঁর নিজের ঘরে ঢুকতে পাননি, তাঁর নিজের বেদীতে উঠতে পাননি। রেণু আমার গোবিন্দজীর ভোগ রাঁধে বলে সকলেরই আপত্তি। আমার অবর্ত্তমানে এখানে কেউ আমার রেণুর ভার নেবে না। ওকে তুমি নিয়ে গিয়ে ওর বিমাতার কাছেই পৌঁছে দিও। হেমন্ত রাগ করবে জানি, কিন্তু আশ্রয় দেবে নিশ্চয়। এ-ছাড়া আর তো কোনও উপায় খুঁজে পাচ্চিনে বাবা।

রাখাল চুপ করিয়াই রহিল। পিতৃহীনা, কপর্দ্দকশূন্যা অনূঢ়া রেণুকে তাহার বিমাতা ও বিমাতার বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন ভ্রাতা নিজের সংসারে গ্রহণ করিবেন কিনা সেই-সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল। তথাপি মুখে কিছুই বলিল না।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, ওর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত মনে গোবিন্দর পায়ে ঠাঁই নিতে পারতাম। অন্তিম-সময়ে একান্তচিত্তে গোবিন্দকে স্মরণ করতেও বাধা পাচ্ছি রাজু। রেণুর জন্য দুশ্চিন্তা আমাকে শান্তিতে মরতে দিচ্চে না।

রাখাল কহিল, এখন ও-সব কেন ভাবচেন কাকাবাবু? আপনার এমন কিছুই হয়নি যার জন্যে রেণুকে এখনি হেমন্তমামার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমি নিজে এবার রেণুর বিয়ের জন্যে উঠে-পড়ে লাগচি।

ব্রজবাবু করুণ হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু রেণু যে বিয়ে করবে না বলে রাজু?

রাখাল বলিল, ছেলেমানুষ একটা কথা বলেচে বলেই কি সেইটেই চিরদিন মেনে চলতে হবে ? যখন আপনার অতবড় সর্ব্বনাশের মধ্যে দুঃখকষ্টের ধাক্কায় সে ও-কথা বলেছিল ; কিন্তু আজ আপনার এই অবস্থা দেখে তার বুঝতে কি দেরি হবে যে, তার জীবনে অন্য আশ্রয় গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন হয়েছে !

ব্রজবাবু অত্যন্ত মলিন হাসিয়া কহিলেন, রাজু, রেণু তোমার নতুন-মার মেয়ে। সংসারে একমাত্র আমি আর ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেন না ওর মায়ের জেদ কেমন ছিল। তাকে নিজের সমস্ত জীবনটাই তছনছ করে বলি দিতে হয়েচে শুধু জেদেরই পায়ে। জেদ যদি তার চড়তো, তা ভাঙার শক্তি অন্যলোকের তো ছিলই না, তার নিজেরও ছিল না। রেণু সেই মায়ের মেয়ে।

রাখাল কহিল, কিন্তু আমার মনে হয় কাকাবাবু, রেণু বোধ হয় নতুন-মার মতো অত বেশি জেদী নয়।

তুমি ওদের চেনো না রাজু। মেয়ে তার মায়ের প্রকৃতি অবিকল পেয়েচে। যে-মাকে জ্ঞান হবার আগেই হারিয়েচে, তার স্বভাব প্রকৃতি অন্তঃকরণ কি করে যে ওর হ'লো আমি ভেবে পাইনে। নতুন-বৌয়ের মত তেজস্বিনী, সৎ-প্রকৃতির ও সৎ-চরিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়। এটা আমি যত ভালো করে জানি, এত আর কেউ জানে না। সেই নতুন-বৌ,—ব্রজবাবুর কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া গেল। কণ্ঠ ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, আমার ভাগ্য ছাড়া এ আর অন্য কিছুই নয় রাজু। তাকে আমি কিছুমাত্র দোষ দিইনে।

ব্রজবাবু এই সকল আলোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া রাখাল পাখা লইয়া বাতাস দিতে দিতে কহিল, ও-সব কথা এখন থাকুক কাকাবাবু। আপনি আগে সেরে উঠুন, তার পর হবে।

ব্রজবাবু জীবনে কোনদিন সবিতার কথা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করেন নাই। আজ তাঁহার সন্তানতুল্য রাজুর সহিত সেই বিষয় লইয়া তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখিয়া রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রোগে মানুষকে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে তখন তাহার চিন্তার পর্য্যন্ত সংযম থাকে না। বোধ হয় ব্রজবাবুরও এখন আর আপন মনের গোপন গভীর চিন্তাগুলি একাকী বহন করিবার সামর্থ্য ছিল না।

সারদা ঘরে আসিয়া ব্রজবাবুকে প্রণাম করিল। সচকিতে রাখালের দিকে চাহিয়া ব্রজবাবু কহিলেন, তোমার নতুন-মাও এসেছেন নাকি রাজু ?

রাখাল বলিল, না। তিনি তো কলকাতায় নেই। বর্দ্ধমানে তারকের কাছে গেছেন। সারদা আপনার অসুখের খবর শুনে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে, কাকাবাবু আমাকে জানেন, আমার সেবা গ্রহণ করতে তিনি আপত্তি করবেন না।

ব্রজবাবু ক্লান্তিভরে বালিশে মাথা এলাইয়া বলিলেন, কারুরই সেবা নেবার দরকার হবে না রাজু, আমার রেণু-মা যতক্ষণ আছে। তবে সারদা-মা এসেচেন ভালই করেচেন, আমার রেণুকে একটু উনি দেখাশুনা করতে পারবেন। ওকে যত্ন করবার কেউ নেই। সংসারের কাজ, ঠাকুর-সেবা, তার উপরে রোগীর সেবার চাপে দিনরাত্রে একদণ্ড ওর ছুটি নেই!

রাখাল বলিল, নতুন-মাকে আপনার অসুখের খবর দেবো কি কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ত্রস্ত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, না না—তোমরা পাগল হয়েচো? অমন কাজও ক'রো না, আমার অসুখ যদি তিনি শোনেন, তার পর তাঁকে আর কোন-কিছুতেই কোথাও আটকে রাখা যাবে না। সেই দণ্ডেই এখানে চলে আসবেন।

রাখাল কথা কহিল না।

মাথায় রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে ব্রজবাবুর বাম অঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহানির আশঙ্কা বর্ত্তমান। গ্রামের ডাক্তার বলিতেছেন এ-রকম সঙ্কটাপন্ন রোগী নিজের হাতে রাখিতে তিনি ভরসা করেন না। উপযুক্ত ঔষধ পথ্য ইন্‌জেক্‌শন প্রভৃতি গ্রামে পাওয়া যায় না। এমন কি, রক্তের চাপ পরিমাপের উৎকৃষ্ট যন্ত্রেরও এখানে অভাব। কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় রোগীকে নাড়াচাড়া করা সম্ভবপর নয়। হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, নাড়ির গতি অতি দ্রুত। সুতরাং কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ কোনো চিকিৎসক লইয়া আসা সম্ভব হইলে সত্বর তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

রাখাল বিপদে পড়িল। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার অনেকেরই নাম তাহার জানা আছে, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় কাহারও সাথে নাই। তা ছাড়া, এই-রকম রোগীর জন্য কাহাকে আনা সমীচীন হইবে সেও এক সমস্যা। উপরন্তু অর্থেরও একান্ত অভাব। তাহার যাহা-কিছু যৎসামান্য পুঁজি ছিল তাহা রেণুর অসুখের সময় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ব্রজবাবুর চিকিৎসার জন্য এখন যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। অথচ তাহাদের কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই। এ অবস্থায় নতুন-মাকে সংবাদ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর কোথায়? এ সংবাদ পাইলে নতুন-মা না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না নিশ্চিত; কিন্তু দেশের এই বাস্তুভিটায় আর তাঁহার পদার্পণ করা কোনদিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার পরিণাম রোগীর পক্ষেও অশুভকর হইতে পারে। রাখাল দুর্ভাবনার আর কূলকিনারা পাইল না। অথচ শীঘ্রই একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া ফেলা বিশেষ প্রয়োজন।

এমন সময়ে আসিল রাখালের কাছে বিমলবাবুর পত্র।

ব্রজবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—আমার একান্ত অনুরোধ, ব্রজবাবুর জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক, নার্স, ঔষধ, পথ্য ও অর্থ যা। কিছু প্রয়োজন, অতি অবশ্য আমাকে তার-যোগে জানাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করিতে পারিব।

রাখাল পত্রখানি হাতে লইয়া চিন্তিত-মুখে বসিয়া ছিল। সারদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও-কার চিঠি দেব্‌তা?

বিমলবাবুর।

সারদা বলিল, কলকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্য আপনি এত ভাবচেন দেব্‌তা—অথচ বিমলবাবুকে একটু লিখে দিলেই তিনি তখুনি ভাল ডাক্তার পাঠাতে পারতেন।

রাখাল বলিল, হুঁ।

সারদা বলিল, আমি বুঝেছি আপনি সংশয়ে পড়েছেন। তাঁর সাহায্য নিতে আপনার বাধচে।

রাখাল কথা কহিল না।

সারদাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে কহিল, কাকাবাবুর অবস্থা যা দাঁড়িয়েচে কখন কি ঘটে বলা কঠিন। যা করবেন শীগ্‌গিরই স্থির করে ফেলুন। না হয় অন্য কিছু প্রয়োজন জানিয়ে নতুন-মাকেই লিখুন টাকার জন্য।

রাখাল তথাপি চুপ করিয়াই রহিল।

সারদা কহিল, যদি মনে না করেন তো একটা কথা মনে করিয়ে দিই।

রাখাল সপ্রশ্ন-চোখে তাকাইল।

তুচ্ছ মান-অপমান, উচিত-অনুচিতের ওজন হিসাব করে চলার চেয়ে এখন কাকাবাবুর প্রাণরক্ষার চেষ্টাটাই কি সবচেয়ে বেশি দরকারী নয়? আপনার নিজের কর্তব্যের দিক থেকে একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন না!

কি করতে বলচো তুমি?

এ অবস্থায় বিমলবাবুর কিংবা নতুন-মার সাহায্য নেওয়া উচিত আমাদের। নতুন-মার সাহায্য নিতে রেণু কুণ্ঠাবোধ করলে সেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপনার তো বাধা নেই।

তুমি ঠিকই বলেচো সারদা। কাকাবাবুর এই জীবন-সঙ্কট অবস্থায় উচিত অনুচিতের প্রশ্ন অন্ততঃ আমার দিক দিয়ে ওঠা কখনই উচিত নয়। তা হ'লে নতুন-মা আর বিমলবাবু দুইজনকেই এখানকার সমস্ত অবস্থা জানিয়ে দুখানা চিঠি লিখে দিই।

কিন্তু মাকে জানাতে যে কাকাবাবু সেদিন বিশেষ করে আপনাকে নিষেধ করে দিয়েছেন?

তাও তো বটে! তা হ'লে শুধু বিমলবাবুকেই—আচ্ছা—বিমলবাবু তো কাকাবাবুর পরিচিত? কাকাবাবুকে জানিয়েই ব্যবস্থা করা যাক না—

এটা মন্দ যুক্তি নয়। তবে রোগীর এ অবস্থায় তাঁকে এ-সব প্রস্তাবে বিচলিত করা হবে না তো?

রাখাল অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, তবে কি করবো সারদা? ওঁদের কিছু না জানিয়েই কি বিমলবাবুকে খবর দেবো?

একটু চিন্তা করিয়া বলিল, তাই করুন দেব্‌তা।

গোবিন্দজীর ভোগ রাঁধিতেছিল রেণু। সারদা দূরে বসিয়া তরকারী কুটিতে কুটিতে গল্প করিতেছিল। রেণু কাজ করিতে করিতে 'হাঁ' 'না' 'তার পর' এইরূপ সংক্ষিপ্ত দু-একটি কথা কহিতেছিল।

সর্ব্বদা এইরূপই ঘটে। রেণু থাকে নির্ব্বাক শ্রোতা, সারদা গ্রহণ করে বক্তার আসন। কত যে গল্প করে ঠিক-ঠিকানা নাই। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই সারদা সবচেয়ে বেশি গল্প করে তার দেব্‌তার। নতুন-মায়ের গল্পও অনেক বলে, ভাড়াটিয়াদের গল্প তো আছেই। বলে না কিছু রমণীবাবু সম্বন্ধে এবং নিজের অতীত সম্বন্ধে রেণু কখনও কোন প্রশ্ন করে না, বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করে না কোনো বিষয়েই। টানা টানা শান্ত চোখ দুটি মেলিয়া নীরবে গল্প শুনিয়া যায়। নিপুণ হাত দুখানি ব্যাপৃত থাকে একটা-না-একটা প্রয়োজনীয় কাজে। বেশী কথা কোনদিনই তার মুখে শোনা যায় না।

সারদা তরকারী কুটিতে কুটিতে বলিতেছিল বিমলবাবুকে দেব্‌তা আজ টেলিগ্রাম করতে গিয়েছেন, কলকাতা থেকে ভাল ডাক্তার নিয়ে এখানে আসবার জন্য। বোধ করি কালকের মধ্যেই তিনি ডাক্তার নিয়ে এসে পড়বেন।

রেণুর দৃষ্টিতে বিস্ময় প্রকাশিত হলেও মুখে কোনও প্রশ্ন নিঃসৃত হইল না।

সারদা বলিতে লাগিল, বিমলবাবু এসে পড়লে অনেকটা ভরসা পাওয়া যাবে। উপযুক্ত চিকিৎসা, ওষুধ, পথ্য সমস্ত ব্যবস্থা হবে। কাকাবাবু এইবারে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।

রেণু এইবার জিজ্ঞাসুনয়নে সারদার পানে তাকাইল।

সারদার তখন আপনমনে বকিয়া চলিয়াছে—অমন মানুষ কিন্তু সংসারে দুটি দেখলাম না রেণু। যেমন সদাশয় তেমনি অমায়িক। শুনেচি তিনি কোটীপতি, লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে তাঁর দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ে, কিন্তু এমন নিরহঙ্কার সহজ-বিনয়ী মানুষ কোথাও দেখিনি এর আগে। যথার্থ যাকে শিবতুল্য বলে। এমন না

হ'লে বিধাতা এত ঐশ্বর্য্য দেবেনই বা কেন? কথায় বলে—মনের গুণে ধন! বিমলবাবুর ধনও যেমন, মনও তেমনি।

নির্ব্বাক রেণু তখন গোবিন্দজীর ভোগ রন্ধন শেষ করিয়া পিতার পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল। মৌন থাকিলেও সে যে মনোযোগ সহকারেই সারদার মন্তব্যগুলি শুনিতেছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সারদার বাক্যস্রোতে উচ্ছ্বাস আসিয়াছে। সে বলিতে লাগিল, বিমলবাবু সেদিন আমাদের সকলকে রক্ষা করেছিলেন পথে দাঁড়ানোর লজ্জা থেকে। সে-দুর্দ্দিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার চোখে অন্ধকার ঠেকে। যিনি বাড়ি-শুদ্ধ লোকের আশ্রয় বলো, বল-ভরসাই বলো, যা কিছু, সেই মা আমাদের যখন নিরাশ্রয় হতে বসলেন, তখন আমাদের যে ভয় ভাবনা ও উৎকণ্ঠা ঘনিয়ে এসেছিল সে শুধু জানেন ঈশ্বর নিজে। বিশেষ করে আমার তো পায়ের নীচে থেকে পৃথিবী সরে যাওয়ার যোগাড় হয়েছিল। মা ছাড়া তখন আমার ইহজগতে অন্য আশ্রয় বা অবলম্বন কিছুই ছিল না।

রেণু তেমনই বিস্মিত নয়নে সারদার পানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, কেন?

সারদা বলিল, তোমাকে সবই বলেচি ভাই। তুমি কি সে-সব কথা ভুলে গেছো? আমার চরম দুর্দ্দিনে মা আমাকে তাঁর স্নেহের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই না আজ দাঁড়িয়ে আছি!

রেণু আত্মবিস্মৃতভাবে বলিল, তার পর?

তার পরের কাহিনীও তো তুমি শুনেছো ভাই আমার মুখে। আমার পুনর্জন্ম ঘটালেন মা আর এই দেব্‌তা। মাঝে মাঝে এখন ভাবি রেণু, ভাগ্যে সেদিন মরে যাইনি।

রেণু হাসিয়া কহিল, কেন সারদাদিদি, সেদিন মরে গেলেই বা আজ তোমার কিসের ক্ষতি হ'তো ভাই?

অনেক ক্ষতি হ'তো। সে যে কত বড় ক্ষতি, ছেলেমানুষ বুঝতে পারবে না বোন।

রেণু চুপ করিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিল। সারদার তরকারি কাটা শেষ হইলে, বাকী আনাজগুলি ঝুড়িতে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, সংসারে যথার্থ খাঁটি জিনিস কিছু পেতে হলে বড় করে তার দাম দিতে হয়। দুর্লভের মূল্য অনেক। আমাদের জীবনেও এ নীতি মেনে চলতে হয়। নকল ও ভেজালের সমস্যা মানুষের মধ্যে এত বেশি বেড়ে উঠেচে যে, এখন কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি চেনা কঠিন। জীবনে যতবড় সম্পদ যে পেয়েচে বোন, তাকে তত বেশি মূল্যও দিতে হয়েচে গভীর দুঃখের মধ্য দিয়ে। অন্ততঃ এটা ঠিক বুঝেচি যে, দুঃখের কষ্টিপাথরে না পড়লে জীবনের যাচাই হয় না।

রেণু কোনদিনই কিছু বিশেষ করিয়া জানিবার জন্য সারদাকে প্রশ্ন করিত না। আজ কিন্তু সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, সারদাদিদি, তোমার নিজের জীবনে তো অনেক দুঃখই পেয়েচো ভাই, তাতে খাঁটি সামগ্রী কি কিছু সঞ্চয় করতে পেরেচো?

সারদা চমকিয়া উঠিল। রেণু যে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে সে সম্ভাবনা তাহার একবারও মনে হয় নাই। একটু বিব্রত হইয়াই বলিল, কি করে বলবো দিদি?

কেন? যেমন করে এই সমস্ত কথা বলচো।

সারদা সহসা অনাবশ্যক গম্ভীর হইয়া বলিল, কিছু করতে পেরেচি কিনা জানিনে, তবে সম্বল যে পেয়েচি, আর সে যে ষোলো আনাই খাঁটি, তাতে আমার আর সংশয় নেই।

সরলমতি রেণু মমতায় বিগলিত হইয়া কহিল, সারদাদিদি, যে স্বামী তোমাকে একলা অসহায় ফেলে রেখে পালিয়ে রইলেন, তাঁকে এখনও এত ভক্তি কর তুমি?

সারদা জবাব দিল না। মুখে তার বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আনাজের ঝুড়ি ও বঁটি লইয়া অন্য ঘরে রাখিতে উঠিয়া গেল।

রাখাল আসিয়া ডাকিল, রেণু!

রাজুদা?

কাকাবাবুর রান্নাটা হয়েচে কি বোন?

হয়েচে। এইবার গিয়ে বাবাকে চান করিয়ে দেবো।

কাকাবাবু ঘুমুচ্চেন। তোর যদি রান্না সারা হয়ে থাকে তো একটু ও-ঘরে আয় না, গোটা-কতক কথা আছে।

এই যে, আমাদের ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি ভাই, চলো।

অল্পক্ষণ পরে রেণু যখন হাত-পা ধুইয়া রাখালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, রাখাল ঘরের মেঝেয় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া রেণুকে বলিল, আয়, বোস।

রেণু বসিল। বলিল, ডাক্তারবাবু আজ তোমার কাছে কি বলে গেছেন রাজুদা?

ভালোই বলে গেছেন।

তবে কেন তুমি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে এলে বড় ডাক্তার নিয়ে আসবার জন্য?

তুই পাগল। গোড়া থেকেই তো শুনচিস্ এখানকার ডাক্তারবাবু বলেচেন, একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে দেখানো দরকার। ঐ রোগের চিকিৎসা গাঁয়ের ডাক্তারের কর্ম নয়। হ'তো ম্যালেরিয়া, পিলে, কি পালাজ্বর, ওরা চতুর্ভুজ হয়ে চার হাতে

করতো কত চিকিৎসা। কাউকে ডাকতে দিত না, কিন্তু ওকথা থাক্। তোকে ডাকলাম একটা দরকারি পরামর্শের জন্য।

রেণু নীরবে রাখালের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

বার-দুই গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিতে করিতে রাখাল বলিল, বলছিলুম কি, কাকাবাবু একটু সামলে উঠলেই তো এখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলতে হবে। আপাততঃ কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবু সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত আগের মতো একটা ছোট বাসা ভাড়া করে না হয় থাকা যাবে। কিন্তু তার পরে—

রাখাল বলিতে বলিতে চুপ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর দ্বিধাজড়িত।

রেণু তেমনই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

চিন্তিতমুখে রাখাল কহিল, তার পরে যে কি ব্যবস্থা হতে পারে সেই কথাই ভাবচি। এখানে তো আর ফিরে আসা চলবে না!

রেণু শান্ত গলায় বলিল, কেন?

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল, তাও কি বুঝতে পারিস্‌নি রেণু, এতদিন এখানে বাস করে? দেখচিস্ তো জ্ঞাতিদের আচার-ব্যবহার! কাকাবাবুর এতবড় অসুখ, একটা উঁকি মেরে খোঁজ নেয় না কেউ।

রেণু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু তুমি তো জানো রাজুদা, কলকাতায় বারোমাস থাকা আমাদের অবস্থায় কুলোবে না। এখানে বাস ভাড়া লাগে না, ঝিয়ের মাইনে মাত্র এক টাকা। আনাজ-তরকারি কিনে খেতে হয় না। খরচ কত অল্প।

রাখাল বলিল, কিন্তু কাকাবাবুর যা শরীরের অবস্থা, ওঁর 'পরে তো নির্ভর করা চলে না বোন! একটু ভেবে দেখ ওঁর অবর্ত্তমানে তোর আশ্রয় কোথায়? এখানে জ্ঞাতিরা তো তোদের সম্পর্কই ত্যাগ করেছেন। সৎমা আগেই পৃথক হয়ে নিজের পিতৃকুলে সরে পড়েছেন। কলকাতায় ফিরে যে-কদিনই থাকা হোক, তার মধ্যে তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলে কাকাবাবু তখন আমার কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবেন। তাঁর যা সামান্য আয় আছে, আমার সঙ্গে একত্রে থাকলে স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছল ভাবেই চলে যাবে। কারুর সাহায্য নিতে হবে না আমি থাকতে।

রেণু চুপ করিয়া শুনিতেছিল। তাহার মৌনতায় উৎসাহিত হইয়া রাখাল বলিতে লাগিল, আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেচি বোন, এছাড়া অন্য সুব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। মেয়ের ভবিষ্যতের দুর্ভাবনাই কাকাবাবুকে সবচেয়ে বেশী বিব্রত করে তুলেছিল। তোমাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করতে পারলে তাঁর মনের গুরুতর দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। তখন তিনি সহজেই সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা করি।

রেণু মৃদুকণ্ঠে বলিল, বাবাকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারবো না রাজুদা।

কিন্তু না গিয়েও যে কোন উপায় নেই দিদি। তুমি যদি ছেলে হতে, ফেলে যাওয়ার কথাই উঠতো না। কিন্তু মেয়েদের যে আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই।

অল্পবয়সী বিধবা মেয়েরা তো সারাজীবন বাপের বাড়িতে থাকে দেখেচি।

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া জবাব দিল, থাকে সত্যি, কিন্তু তাদের যদি পিতৃকুলে দাঁড়াবার মতো আশ্রয় না থাকে কোনও সময়ে, তখন তারা শ্বশুরকুলেই গিয়ে আশ্রয় নেয়, এও দেখেচো নিশ্চয়। স্বামী না থাকলেও তাদের শ্বশুরকুল তো থাকে।

রেণু নতমুখে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল রাজুদা, আমি বাবাকে নিজের মুখে জানিয়েচি, বিয়েতে আমার একটুও রুচি নেই। আমি বিয়ে করতে পারবো না।

রাজু হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোকে বুদ্ধিমতি ঠাওরাতাম, এখন দেখচি তুই একেবারে পাগল রেণু। আরে, সেদিন তুই ও-কথা না বললে কাকাবাবু কি বেঁচে থাকতে পারতেন? হঠাৎ কারবার ফেল হয়ে সর্ব্বস্ব গেল। বসতবাড়ি-শুদ্ধ নিলামে ওঠায় একেবারে পথে দাঁড়ালেন। সেই দুঃসময়ে তোর বিয়ে বন্ধ হওয়ার ছুতো নিয়ে ঝগড়া করে হেমন্তমামা তাঁর বোন আর ভাগ্নীর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আঠারো আনা বুঝে নিয়ে সরে দাঁড়ালেন, পাছে কাকাবাবুর দেনার দায়ে তাদেরও পথে দাঁড়াতে হয়! সংসার এমনই স্বার্থপর বোন!

রাখাল একবার থামিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পরে আবার বলিতে লাগিল, স্বামীর অতবড় দুঃসময়ে স্ত্রী নিজের ভাইয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে আপনার আর্থিক ভালোমন্দের দিকটাই কেবলমাত্র বিবেচনা করলে, স্বামীর পানে তাকালেও না। তুই যদি সেদিন তাঁকে অমন করে ভরসা দিয়ে না বল্‌তিস্ রেণু, তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি কথনো কোথাও যাবো না বাবা—তা হলে কাকাবাবু সংসারে দাঁড়াতেন কাকে অবলম্বন করে?

রেণু অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, কিন্তু রাজুদা, আমি তো বাবাকে সান্ত্বনা বা সাহস দিতে ও-কথা বলিনি। আমি যে সত্যি কথাই বলেচি।

রেণুর কথা বলার ভঙ্গিতে রাখাল মনে মনে প্রমাদ গনিলেও মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, সত্যি কথা নয়তো কি মিথ্যে কথা বলেচিস্ বলচি আমি? কিন্তু কি জানিস্ বোন, সংসারে বেশীর ভাগ সত্যিই—সাময়িক সত্যি। চিরকালের সত্যি বলে যদি কিছু থাকে তা সংসারের বাইরের বস্তু। তুমি সেদিনকার সেই মুখের কথাটি রক্ষা করবার জন্ত আজ যদি বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠো, জেনো, তার ফলে হয়তো তোমাদের জীবনে অকল্যাণই দেখা দেবে—যা কল্যাণ বহন করে আনে, তাকেই বলে সত্য। অশুভকর যা তা সত্য নয়। সেদিন তোমার মুখের যে কথাটি কাকাবাবুকে সবচেয়ে সান্ত্বনা ও শান্তি দিয়েছিল—আজ সেই কথাটিকে রক্ষা করার জন্ত তুমি যদি

জিদ্ ধরে বসো, তা হলে জেনো, সেই অবাঞ্ছিত ব্যাপারই কাকাবাবুর সবচেয়ে দুঃখ-দুর্ভাবনার হেতু হবে। এমন কি, হয়তো সেটা তার মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্ত হতে পারে। একটা কথা ভুলো না রেণু, যে উগ্র বিষ ধাতছাড়া রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবন দান করে, সেই বিষ পান করেই আবার সুস্থ মানুষ আত্মহত্যা করে। স্থান কাল ও অবস্থা-অনুসারে একই ব্যবস্থা কোনও সময় যেমন মঙ্গলকর, আবার অন্য এক সময়ে তেমনি অমঙ্গলকরও। বড় হয়েচো, সবদিক সুস্পষ্ট করে ভেবে দেখো। বিশেষ প্রয়োজনে একবার একটা কথা বলেচো বলেই সেই মুখের কথাটাকেই জীবনের সকল মঙ্গলামঙ্গল প্রয়োজন অপ্রয়োজনের চেয়ে বড় করে তুলতে গিয়ে অকল্যাণ ডেকো এনো না।

রেণু নত-চক্ষে চুপ করিয়া রহিল।

২১

কলিকাতার দুইজন খ্যাতনামা বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্রজবাবুকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষান্তে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিমলবাবু আরও কয়েকদিন তাঁহার নিকটে আছেন। ব্লাডপ্রেশার আর একটু কমিলেই ডাক্তারের নির্দ্দেশমত ব্রজবাবুকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি কোনও জায়গায় পর্য্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত একখানি ছোট বাড়ি ভাড়া করিবার জন্য বিমলবাবু কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মচারীরা সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিবে।

কলিকাতার চিকিৎসকেরা আসিয়া রোগীর ব্যবস্থা করিয়া যাইবার পর হইতে ব্রজবাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। সকলেরই মন বেশ উৎফুল্ল।

ব্রজবাবু বৈকালে উত্তরদিকের বারান্দায় একখানি ডেক চেয়ারে শুইয়া ছিলেন। পাশের চৌকিতে বিমলাববু খবরের কাগজ হাতে বসিয়া। উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল জগৎব্যাপী ট্রেড্-ডিপ্রেশন্ বা ব্যবসায়ের দুরবস্থা লইয়া।

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্রজবাবু বলিলেন, আপনি যখন প্রথম আমার কাছে এসে আমার ব্যবসায় কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, আমার মনে হয়েছিল সাধারণ বড়লোকের মতোই ব্যবসায়-সম্বন্ধে আপনার শুধু সৌখীন আগ্রহ-উৎসাহই আছে, সুক্ষ্ম-ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও ভালোমন্দ জ্ঞান—অর্থাৎ যাকে ব্যবসায়বুদ্ধি বলে, তা আপনার নেই। তার পরে যখন আপনার অন্যান্য সব প্রচুর লাভজনক বড় বড় ব্যবসায়ের বিবরণ

শুনলাম, তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারিনি। আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এইজন্য যে, এতবড় ব্যবসায়ী লোক হয়েও আপনি কি দেখে আমার ভরা-ডোবা ব্যবসা অত চড়া দামে কিন্‌তে চাইছিলেন!

বিমলবাবু হাসিলেন।

ব্রজবাবু পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বিমলবাবু, সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি বুঝতে পারেননি ও-ব্যবসা সে অবস্থায় কিনে নেওয়া দূরে থাক্ যেচে সেধে হাতে তুলে দিলেও কেউ নিতে চাইতো না ওর দেনার পরিমাণ দেখে? সে অবস্থায় ওর ভার নেওয়া মানে ইচ্ছে করে টাকাগুলো গঙ্গাগর্ভে ফেলে দেওয়া।

বিমলবাবু তেমনই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, এবারও কোনও জবাব দিলেন না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য্য মানুষ আপনি!

এবার বিমলবাবু কথা কহিলেন। বলিলেন, আমার চেয়েও অনেক বেশী আশ্চর্য্য মানুষ আপনি!

কিসে বলুন তো?

আপনি জেনে-শুনেও অবিশ্বাসী ও প্রতারক আত্মীয়দের হাতে আপনার নিজ হাতে গড়া বৃহৎ ব্যবসা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ম্লান হাসিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করা কি এতই অপরাধ বিমলবাবু? বিশ্বাস আমি কোনও কারণেই হারাতে চাইনে।

বার বার ক্ষতি-স্বীকার ও দুঃখভোগ করেও কি বিশ্বাস বজায় রাখা সম্ভব?

তা জানিনে, কিন্তু রাখা ভালো। অবিশ্বাসীর কোথাও আশ্রয় নেই, কোনও সান্ত্বনা নেই।

আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কি সত্য জেনেচেন?

হাঁ। আমি বিশ্বাস করে ঠকিনি। বাইরে থেকে মানুষ আমাকে বার বার নির্ব্বোধ বলেচে, কিন্তু আমি জানি আমি ভুল করিনি, তারাই ভুল করেচে।

বিমলবাবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রজবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দূরদিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বজবাবুর বলিতে লাগিলেন, আমার সমস্ত কাহিনী একদিন বলবো আপনাকে। আপনি অন্যের মুখে কতদূর কি শুনচেন তা জানিনে, তবে আমার মুখে সেদিন যেটুকু শুনেছিলেন, তা কিন্তু সমস্ত নয়। নিজের কথা বলবার আগে আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

বলুন, কি জানতে চান?

আপনার যা আর্থিক অবস্থা, তাতে আপনাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র বলা যেতে পারে। আপনি সবল সুশ্রী স্বাস্থ্যবান পুরুষ, ভাগ্যদেবী সকল দিক দিয়েই আপনার প্রতি

প্রসন্ন—অথচ এত বয়স পর্য্যন্ত সংসারে প্রবেশ করেননি, এর যথার্থ কারণটা জানতে পারি কি? অবশ্য যদি বলতে আপনার বাধা না থাকে।

বলতে কিছুমাত্র বাধা নেই। কারণটা নেহাৎ সোজা। প্রথমতঃ সময় ও সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়তঃ বিবাহে অনিচ্ছা।

প্রথমটা হয়তো একদিন সত্য ছিল, কিন্তু আজ তো আর তা নয়? তখন ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টায় দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সংসার পাতার ভাবনা ভাববার অবকাশ ছিল না। কিন্তু তার পরে?

বললুম তো এইমাত্র, রুচি হয়নি।

রুচি-অরুচির কথা উঠলে আর কোনও প্রশ্ন চলে না বিমলবাবু। তবু আমার আর একটি জিজ্ঞাসার জবাব দিন। এখন কি সংসারী হবার কোনও বাধা আছে আপনার?

ব্রজবাবুর প্রশ্নে বিমলবাবু বিস্ময়বোধ করিতেছিলেন যতখানি তারও বেশি করিতেছিলেন কৌতুকবোধ। চাপা হাসিতে তাঁহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন, বাধা কোনদিনই ছিল না ব্রজবাবু, আজও নেই। হয়তো বা আমার বিবাহের পথ এত বেশী অবাধ বলেই স্বয়ং প্রজাপতি পথ আগলে বসে রইলেন; নববধূর আর শুভাগমন হ'লো না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দেখুন, আমাদের দেশে একটা মেয়েলী প্রবাদ হয়তো শুনেচেন,

অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর।
অতিবড় সুন্দরী না পায় বর॥

আমারও হয়েচে তাই। বিবাহের পাত্র হিসাবে নাকি আমি সকলদিক দিয়েই উপযুক্ত, এ-কথা অনেকেই বলেচেন, অন্ততঃ ঘটক সম্প্রদায় তো বলেনই। তবুও যার সারা-যৌবনে বিয়ের ফুল ফুটলো না, সে-স্থলে প্রজাপতির বাধা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন?

কিন্তু এতদিন ফোটেনি বলেই যে কোনদিনই ফুটবে না, এও তো নয়।

সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে দাদা। অকালে কি আর ফুল ফোটে? জোর করলে তার বিকৃতি ঘটানো হয় মাত্র। বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা মরশুমী ফুলের মতো, ঠিক নিজের ঋতুতে আপনি ফোটে। মরশুম চলে গেলে আর ফোটে না, তখন সে দুর্লভ।

ব্রজবাবু একটু চিন্তা করিয়া হাসি-মুখে বলিলেন, ভাল মালী চেষ্টা করলে অসময়েও ফুল ফোটাতে পারে; কিন্তু সে-কথা থাক, বিবাহটা যে ঠিক মরশুমী ফুল, আমি মানতে পারলাম না। বিয়ের ফুল ফোটা বলে একটা কথা এদেশে আছে, কিন্তু কোনও দেশেই ওটা যে ফুলের চাষের নিয়ম মেনে চলে এমন প্রমাণ বোধ হয় নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, না না, তা নয়। আমি বলতে চাইচি, জীবনে বিবাহের

একটি নির্দ্দিষ্ট শুভ লগ্ন আছে। সে লগ্নটি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আর বিবাহ হয় না। যাঁরা তার পরেও বিবাহ করেন, সে ঠিক বিবাহ নয়।

সেটা তাহলে কি?

সেটা শুধু স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসবাস মাত্র। কোনও ক্ষেত্রে বংশ-রক্ষার প্রয়োজনে কোনও ক্ষেত্রে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের কিংবা সুখ-সুবিধা ও আরামের প্রয়োজনে—কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হৃদয়-মনের বিলাসিতা চরিতার্থের জন্য।

বিস্মিত কৌতূহলে ব্রজবাবু প্রশ্ন করিলেন, ঐ-সকল বাদ দিয়ে বিবাহটিকে আর অন্য কি বস্তু বলতে চান আপনি?

সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। সংসারে দেখা যায় সমাজ অনুমোদিত পুরুষ ও নারীর মিলনকে বিবাহ বলা হয়; কিন্তু আমি তা মনে করি না। মানুষের জীবনে এমন একটা বসন্ত-ঋতু আসে, এমন একটা আনন্দকাল আসে যে পরমক্ষণে নর-নারীর ঈপ্সিত মিলন, দেহে মনে অপূর্ব্ব রসে ও রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। দুটি প্রাণের, দুটি দেহ-মনের সেই যে রস-মধুর বর্ণরাগ—তাকেই বলি বিবাহ। সূর্য্যাস্তের পর-মুহূর্ত্তেই, যখন সন্ধ্যা হয়নি অথচ দিন অবসান হয়েচে, সেই সুন্দর সন্ধিলগ্ন, সেইটুকু আয়ু অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী। তাকে আমরা গোধূলিক্ষণ বলি। সেই রমণীয় সময়টুকুর মধ্যে পশ্চিমের আকাশে জেগে ওঠে অপরূপ আলোর লীলা, আর অফুরন্ত রঙের বৈচিত্র্য যা সমস্ত দিবা-রাত্রির দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনক্রমে কোন মুহূর্ত্তেই ধরা যায় না। সে ঐ বিশেষ ক্ষণটুকুর সামগ্রী। মানুষের জীবনে বিবাহও তাই।

ব্রজবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, বুঝেচি। কিন্তু আপনি যা বললেন বিমলবাবু, তা হয়তো আপনাদের কল্পনা-কাব্যের পাতায় লেখে, বাস্তব জীবনের হিসাবের খাতায় লেখে না।

সেইজন্য তো আমাদের বিবাহিত জীবনের পাতায় এত গরমিল জমে ওঠে, হিসাব মেলে না কিছুতে।

অর্থাৎ, আপনি বলচেন বিবাহ ব্যাপারটা কাব্যের খাতায় ছন্দের অন্তর্গত, হিসাব-খাতার অঙ্কের অন্তর্গত নয়?

সে-কথার জবাব এড়াইয়া গিয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনিই বলুন না দাদা। বিবাহের অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবনে একবারও ঘটেনি, কিন্তু আপনার ঘটেচে একাধিকবার। আপনি ও-বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।

আমার কথা মানেন তো বলি।

বলুন।

বিয়ের ফুল ফোটার দিন আজও আপনার অটুট আছে।

তার মানে ? আপনি কি বলতে চান এই বয়সে—

বিমলবাবুর বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আপনি সত্যিই হাসালেন কিন্তু বিমলবাবু।

কেন বলুন তো ?

আপনার বিয়ের আর বয়স নেই, এ-রকম একটা অসম্ভব ধারণা কি করে হ'লো ? তা হলে আমরা তো—

কিন্তু আপনার বেশী বয়সে বিবাহের অভিজ্ঞতা যে একবারও সুখের হয়নি এও তো সত্য !

আপনি ভাগ্য মানেন কি ?

কতকটা মানি বৈ কি। তবে অন্ধ অদৃষ্টবাদী নই।

'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ' এই তিনটে ব্যাপার যে সম্পূর্ণ ভাগ্যের 'পরে নির্ভর করে এটা স্বীকার করেন কি ?

না। এ যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে জন্ম ও মৃত্যুকে সম্পূর্ণ না হলেও কতকটা ইচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেচে মানুষ, যদিও জন্ম-মৃত্যু ব্যাপারটা একেবারেই প্রকৃতির নিয়ম। জীবমাত্রেই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। সুতরাং ও-দুটো বাদ দিয়ে বিবাহটাই ধরুন। ওটা সামাজিক সুবিধার জন্ত মানুষের গড়া নিয়ম। কাজেই ও ব্যাপারটায় অদৃষ্টের বিশেষ হাত নেই। মানুষের ইচ্ছাই এক্ষেত্রে প্রধান।

এ-সকল যুক্তিতর্ক ব্রজবাবুর হয়তো ভাল লাগিতেছিল না। সুতরাং তিনি এ আলোচনায় আর যোগ না দিয়া নীরবে চক্ষু মুদিয়া ডেক-চেয়ারে পড়িয়া রহিলেন।

বিমলবাবুও হস্তস্থিত সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছিল, সংবাদপত্রের অক্ষরগুলি ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিমলবাবু দুই একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিলেন আলো জ্বালা হইয়াছে কিনা।

অর্দ্ধশায়িত ব্রজবাবু মুদ্রিত-নয়নে কি ভাবিতেছিলেন কে জানে। হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া ডান হাত বাড়াইয়া বিমলবাবুর একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, বিমলবাবু, তা হলে আপনি সত্যই বিশ্বাস করেন, বিবাহ নিয়তির অধীন নয়, মানুষের ইচ্ছার অনুগত ?

বিমলবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হাঁ, আমার নিজের বিশ্বাস তাই বটে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এ নিয়ে এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ব্রজবাবু ?

বলচি। কিন্তু তার আগে আপনি কথা দিন আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন ? না—না, অনুরোধ নয় প্রার্থনা, এ আমার ভিক্ষা। ব্রজবাবু ব্যাকুল হইয়া বিমলবাবুর দুটি হাত চাপিয়া ধরিলেন।

অতিমাত্রায় বিপন্ন হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনি কি বলচেন? আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মতো। যে-আদেশ যখনি করবেন পালন করবো। এমন অনুচিত কথা উচ্চারণ করে আমাকে অপরাধী করবেন না।

না না, কথাটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এ আমার অনুরোধ নয়, একান্ত প্রার্থনাই। বলুন আমার মিনতি রাখবেন?

সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই রাখবো। বিমলবাবু কথাটা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াই বলিলেন।

অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ আপনার মঙ্গল করবেন। আমার জন্ম-দুঃখিনী মেয়েটার ভার আপনি নিন বিমলবাবু। ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

বিমলবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, ব্রজবিহারী-বাবু তাঁহাকে বিবাহের পাত্ররূপে নিজ কন্যার জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন। ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া বলিলেন, আপনি আগে একটু সুস্থ হয়ে উঠুন ব্রজবাবু, ও-সব আলোচনা পরে হবে।

ব্রজবাবু সকাতরে বলিতে লাগিলেন, আপনি উদার প্রকৃতির, মন আপনার উন্নত। অন্য কারু কাছেই আমি ভরসা করে এ প্রস্তাব করতে পারতাম না। আমার জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী আপনি সমস্তই জানেন। দেবতার নির্ম্মাল্যের মতোই মেয়ে আমার নিষ্পাপ। তার গুণের সীমা নেই, রূপও নিতান্ত অবজ্ঞার নয়। অথচ এমন মেয়েরও ভাগ্যে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছিলেন! আপনি হয়তো জানেন না, রেণুর বিবাহ হওয়াই এখন দুর্ঘট। আমার না আছে আজ অর্থবল, না আছে লোকবল, না আছে কুলের গৌরব। ওর বিবাহের আশা-ভরসাই নেই।

অতিশয় আশায় আগ্রহান্বিত হইয়া ব্রজবিহারীবাবু এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু বিমলবাবু নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া আছেন দেখিয়া অকস্মাৎ তিনি ভগ্নোৎসাহে চক্ষু মুদিয়া আরাম-কেদারায় এলাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নিরুপায়ের মতো বলিলেন, গোবিন্দ তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

সারদা বারন্দায় লণ্ঠন লইয়া আসিল।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, রাজু কি বাড়ি আছে?

সারদা বলিল, না, একটু আগে ডাক্তারখানায় গিয়েচেন। এখুনি ফিরবেন। ব্রজবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, কাকাবাবু, আপনার কমলালেবুর রস আনবো কি?

ব্রজবাবু ইশারায় হাত নাড়িয়া মানা করিলেন।

বিমলবাবু বলিলেন, না কেন দাদা, আপনার কমলার রস খাওয়ার সময় হয়েচে যে নিয়ে আসবে বৈকি। আনো সারদা-মা।

ব্রজবাবু আর নিষেধ করিলেন না। মুদিত-চক্ষে নির্জীবভাবে পড়িয়া রহিলেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোকে বিমলবাবু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন, অসুস্থ ব্রজবাবুর রক্তহীন মুখমণ্ডল পাংশু বিবর্ণ। মুদিত চক্ষুর দুই কোণে দুই বিন্দু অতি ক্ষুদ্র অশ্রুকণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাণাধিকা কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতখানি গভীর হতাশার গোপন বেদনায় ঐ পরমসহিষ্ণু মানুষটির নেত্রকোণে আজ অশ্রুকণা নিঃসৃত হইয়াছে, বিমলবাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না। নিরুপায় বেদনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সান্ত্বনা দিবার উপায় বা ভাষা কিছুই পাইলেন না।

গোবিন্দজীর আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রেণু নিজে উপস্থিত থাকিয়া পূজারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে আরতি করাইতেছে। ব্রজবাবু আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। যতক্ষণ ঘণ্টা-কাঁসর নিস্তব্ধ না হইল, ললাটে যুক্ত করে ঠেকাইয়া নতশিরে প্রণামরত রহিলেন। ধূপ, ধুনা, চন্দনকাষ্ঠচূর্ণ ও গুগ্‌গুলের ধূমসৌরভে শীতল সন্ধ্যার মৃদুবায় সুরভিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁসর-ঘণ্টা নিঃশব্দ হইলে তাহার পরও ব্রজবাবু অনেকক্ষণ একইভাবে উদ্দিষ্ট ইষ্টদেবতাকে মনে মনে বন্দনা করিয়া পরে চেয়ারের উপর আবার লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রেণু আসিয়া তাঁহাকে গোবিন্দের চরণামৃত ও কমলার-রস পান করাইল। একটু পরে রাখাল আসিয়া বিমলবাবুর সাহায্যে ব্রজবাবুকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। দুইজন মানুষের কাঁধে দুই হাতে অপটু শরীরের ভার রাখিয়া অতি-কষ্টে ব্রজবাবু অল্প হাঁটিতে পারেন। এখনও সমস্ত অঙ্গে স্বাভাবিক জোর ফিরিয়া পান নাই।

আহারাদির পর রাত্রে বিমলবাবু কোনও এক সময়ে ব্রজবাবুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ব্রজবাবুর রোগশীর্ণ শিথিল হাতখানি নিজ মুঠায় তুলিয়া লইয়া বিমলবাবু চুপি চুপি কহিলেন, আপনি সন্ধ্যাবেলায় যে প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখতে চাই। আপনাকে কাল আমি জানাবো।

ব্রজবাবু মাথা হেলাইয়া সায় দিলেন।

বিমলবাবু উঠিয়া গেলে ছায়াছন্ন নির্জন কক্ষে শয্যাশায়ী ব্রজবাবু অস্ফুটস্বরে বারংবার তাঁহার ইষ্টদেবতা গোবিন্দের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে বিমলবাবু যখন ব্রজবাবুর নিকটে আসিয়া বসিলেন, ব্রজবাবু লক্ষ্য করিলেন, একটি পরিতৃপ্ত আনন্দের স্নিগ্ধ দীপ্তি বিমলবাবুর মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। সেই উজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া ব্রজবাবু মনে মনে হয়তো অনেকটাই আশান্বিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ভরসা করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিলেন না। কহিলেন, খবরের কাগজ এসেচে। রাজু পড়ে শোনাতে চাইছিল, নিষেধ করলাম। কি

হবে পৃথিবী-সুদ্ধ লোকের দৈনিক বিবরণ শুনে। তার চেয়ে কোন সদ্‌গ্রন্থ শ্রবণে মনেরও শান্তি, পরলোকেরও কল্যাণ।

বিমলবাবু হাসিলেন। বলিলেন, কোন্ বই শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে বলুন, পড়ে শোনাই।

চৈতন্যচরিতামৃত পড়বেন?

বিমলবাবু বলিলেন, বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে ঐ একখানা আশ্চর্য্য পুঁথি।

পড়েচেন আপনি? ব্রজবাবুর কণ্ঠে বিস্ময় ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অল্প-স্বল্প নেড়েচি মাত্র। পড়া হয়েচে ঠিক বলা চলে না।

সে তো নয়ই। চৈতন্যচরিতামৃত যে মানুষ পাঠ করতে পেরেচে অর্থাৎ ওর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেচে, সে তো গোবিন্দ-পাদপদ্মে পৌঁছে গিয়েচে।

বিমলবাবু বলিলেন, এখানে চৈতন্যচরিতামৃত আছে কি?

হাঁ আছে। রেণুকে আমি ভাগবত আর চরিতামৃত সঙ্গে আনতে বলেছিলাম। রেণু নিজেও পুঁথিখানি পড়তে ভালবাসে কি-না।

তাই নাকি? মেয়েকেও তা হলে আপনি ভগবৎ-প্রেমামৃতের আস্বাদন দান করেচেন বলুন?

জিভ কাটিয়া যুক্ত-কর ললাটে ঠেকাইয়া উদ্দেশ্য দেবতাকে প্রণাম করিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, ছি, ছি, এমন কথা মুখে আনতে নেই। ওতে আমার অপরাধ হবে। গোবিন্দ-প্রেমের আস্বাদ সে কি মানুষ মানুষকে দিতে পারে বিমলবাবু? জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা সবই সেখানে তুচ্ছ অর্থহীন। কেবল তিনি যাকে নিজে কৃপা করেন, সেই ভাগ্যবানই সংসারে তাঁর প্রেমের দুর্লভ আস্বাদন-লাভে ধন্য হয়।

বিমলবাবু নীরব রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, এই যে কাল সন্ধ্যায় ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় আপনার কাছে এক প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, আজ সকালে আর তো তার জন্য এতটুকুও আগ্রহ অনুভব করচিনে। এ কি গোবিন্দেরই করুণা নয়? নিরুদ্বেগ সরল হাসিতে ব্রজবাবুর মুখখানি কোমল হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, আমি কাল রাত্রে চিন্তা করে ও-বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেচি।

ব্রজবাবুর রোগ-পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির আনন্দ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আমি জানি তোমাকে উপলক্ষ্য করে গোবিন্দ আমায় ভারমুক্ত করবেন।

বিমলবাবু বলিলেন, কি করে টের পেলেন বলুন তো—কথা-কয়টি স্নিগ্ধকৌতুকে সমুজ্জল।

ব্রজবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, গোবিন্দই যে তাঁর অধম সেবকের

সকল ভাবনা নিরাকরণ করেন। তোমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার কাছে সেই জন্যই। ব্রজবাবুর মুখে অপরিসীম বিশ্বাস ও ভক্তির পবিত্র আভা।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সংসারে বহুবিধ দুঃখে নিপীড়িত এই রোগাতুর বৃদ্ধের সরল চিত্তের পরিতৃপ্তির প্রফুল্লতাটুকু নষ্ট করিয়া দিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না, অথচ কথাটা এখানে না বলিলেও নয়। বৃদ্ধের ভ্রান্ত ধারণা সত্বর দূর করিতে না পারিলে জটিলতা-বৃদ্ধির সম্ভাবনা!

বিমলবাবু বলিলেন, আমি কাল বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখেছি আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে। সকল দিক বিবেচনা করে রেণুকে গ্রহণ করাই স্থির করেছি। কিন্তু এ-সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আপনি প্রতিশ্রুতি দিন, আমি যা চাইবো আপনি দেবেন?

ব্রজবাবু বিমূঢ়-নেত্রে বিমলবাবুর মুখের পরে চাহিয়া থাকিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে কহিলেন, বলুন—

বিমলবাবু বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার কন্যা দান করতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করতে চাই। যাগ-যজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণ করে ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ আইনতঃ পত্নীরূপে গ্রহণ করলে সে আমার গোত্র ও উপাধি নিয়ে আমাদের বংশের অন্তর্ভুক্ত হ'তো। আমার সম্পত্তিতে তার অধিকার বর্ত্তাতো, আমার মরণে তাকে অশৌচ স্পর্শ করতো। আমি যাগ-যজ্ঞে মন্ত্রোচারণ করেই ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ ও আইনতঃ তাকে আমার দত্তক-কন্যারূপে গ্রহণ করতে চাই। তাতেও সে আমার গোত্রে অধিকার পাবে, আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়ে আমার মরণে অশৌচ পালন করবে।

ব্রজবাবু নির্ব্বোধ চাহনিতে বিমলবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কথা কহিতে পারিলেন না।

বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, রেণু আপনার কত স্নেহের সামগ্রী আমি জানি। আমারও সে কম স্নেহের নয়। ওকে সন্তানরূপেই গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত হয়েছি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলবাবু বলিলেন, বিবাহযোগ্য সৎপাত্র কেউ আমার বংশে থাকলে, তাকে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করে রেণুকে আমি পুত্র-বধূরূপে নিয়ে যেতাম। কিন্তু সে-রকম আপন-জন কেউ নেই আমার। দূর সম্পর্কে যারা আছে, তারা আমার রেণুমার উপযুক্ত পাত্র নয়। কাজে কাজেই আমি স্থির করেছি সোজাসুজি ওকে আমার দত্তক-কন্যারূপে গ্রহণ করবো। রেণু-মাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে দান করার ভার এবং ওর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে ভাবনার দায়িত্ব সমস্ত আমি তুলে নিলাম—আপনার আর নয়।

ব্রজবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, জবাব দিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলে ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও রেখাই ফুটিয়া উঠিল না, যেমন নির্ব্বাক ছিলেন তেমনই রহিলেন।

দুপুরবেলায় রাখাল বিমলবাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অতিশয় গম্ভীর-মুখে বলিল, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকাইলে রাখাল বুক-পকেট হইতে ডাকঘরের মোহরাঙ্কিত একখানি পোস্টকার্ড বাহির করিয়া বলিল, পড়ে দেখুন।

বিমলবাবু কার্ডখানি হাতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া নাম-সহি লক্ষ্য করিলেন—'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র'। বলিলেন, ইনি কে রাজু? চিনতে পারলাম না তো!

কাকাবাবুর এ-পক্ষের শ্যালক। আমাদের শকুনী-মামা। নাম শোনেননি কি?

ওঃ, ইনিই ব্রজবাবুর কারবারের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন না?

হাঁ। শুধু কারবারের কেন, বিষয়-আশয়ের, ঘর-সংসারের, স্ত্রী-কন্যার সব ভারই তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়ে কাকাবাবুকে নিশ্চিন্ত ভাবে গোবিন্দজীর পায়ে সমর্পণ করেছিলেন।

নিঃশব্দে নতনয়নে পোস্টকার্ডখানি পাঠ করিয়া বিমলবাবু চক্ষু তুলিয়া রাখালের মুখের পানে তাকাইলেন।

রাখাল বলিল, বলুন দেখি, এ চিঠি এখন কাকাবাবুর হাতে দেওয়া উচিত কি না?

বিমলবাবু নিরুত্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাখাল পুনশ্চ কহিল, কাকাবাবুর কাছে এ সংবাদ গোপন রাখাও তো আমাদের পক্ষে অনুচিত হবে।

বিমলবাবু বলিলেন, তা তো হবেই।

তারপর একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, এ চিঠি ওঁর হাতে দিয়ে কাজ নেই, পড়ে শোনালেই চলবে। কারণ, চিঠির কতকটা অংশে অনাবশ্যক কটু কথা আছে। ওঁকে সেটা না শোনালেই ভাল হয়।

নিশ্চয়। কোন্ অংশ বাদ দিয়ে কতটুকু ওঁকে শোনানো যেতে পারে বলুন তো?

এই যে লিখেচেন, "যে কলঙ্কিত বংশে রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কলুষের লজ্জা তো তাহাকে চিরদিন বহন করিতে হইবেই জানি। আমার আশঙ্কা হয়, আপনার অপরাধ ও মহাপাপের শাস্তি শেষ পর্য্যন্ত আমার নিরপরাধ ভাগিনেয়ীকে স্পর্শ না করে। সেজন্যই তাহাকে যথাসম্ভব সত্বর সৎপাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা

করিয়াছি। আপনাকে সংবাদ দিবার প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ ইত্যাদি।" এ-সব অংশ ওঁকে শোনাবার দরকার নেই।

রাখাল কহিল, রাণীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল তার পিতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্মতি ও অসম্মতির অপেক্ষা না করেই। আশ্চর্য্য! সংসারে এমন দেখেচেন কি বিমলবাবু?

বিমলবাবু একটু হাসিলেন মাত্র।

রাখাল আবার পড়িতে লাগিল—"অদ্য নির্বিঘ্নে শুভ-গাত্র হরিদ্রা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য গোধূলি-লগ্নে শুভ-বিবাহ।" ব্যাস্, এইটুকুমাত্র লিখেচে। কোথায় বিবাহ হচ্চে, পাত্র কেমন, কোন সংবাদই দেয়নি। আক্কেল-বিবেচনা দেখলেন?

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, বড় মেয়ে অবিবাহিতা রইলো, অথচ ছোট মেয়ের ঘটা করে বিয়ে।

বিমলবাবু শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, সংসারে এই-ই নিয়ম রাজু। কোনো কিছুই কারো জন্য অপেক্ষা করে থাকে না।

কাকাবাবু ওদের সর্ব্বস্ব দিয়ে আজ কপর্দ্দক-শূন্য বলেই এতটা বেশী বাড়াবাড়ি সম্ভব হ'লো, নইলে হতে পারতো না।

উদাস-কণ্ঠে বিমলবাবু বলিলেন, এটাও হয়তো সংসারেরই সহজ নিয়ম।

পত্রখানি পাওয়া অবধি রাখালের অন্তরের মধ্যে জ্বালা করিতেছিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, সংসারের নিয়ম বলে সব কিছুই সহ্য করা যায় না বিমলবাবু।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু সহ্য না করেও তো উপায় নেই রাজু।

২২

শীতের সন্ধ্যা। কলিকাতার সরু গলির মধ্যে একখানি একতলা বাড়ির দুয়ার-ভেজানো ঘরে রেণু হ্যারিকেন-লণ্ঠনের সামনে বসিয়া পশমের ছোট টুপি বুনিতেছিল। দুয়ারের বাহির হইতে সারদার অনুচ্চ-কণ্ঠ শোনা গেল,—দিদি—

রেণু সাড়া দিল,—এসো—

সারদা দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে প্রকাণ্ড ধামা লইয়া দাসী।

রেণু তাহাকে দেখিয়া সারদার দিকে চাহিতেই সারদা বলিল, গোবিন্দজীর জন্য মা কিছু ফল-মূল তরি-তরকারি আর ভাল মাখন পাঠিয়েছেন।

রেণুর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীর-কণ্ঠে কহিল, সারদাদিদি, ও তো আমরা নিতে পারবো না।

সারদা কুণ্ঠিত-কণ্ঠে কৈফিয়তের সুরে কহিল, সে কি দিদি, এ তো তোমাদের জন্য নয়। এ যে গোবিন্দজীর—

রেণু সারদার কথা শেষ হইতে না দিয়া শান্ত-গলায় কহিল, গোবিন্দজীকে উপলক্ষ করে মা সব আমাদেরই পাঠিয়েচেন। এ তুমিও জানো, আমিও জানি সারদাদিদি—কিন্তু এ নেওয়ার উপায় নেই, মাকে বলো তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন।

শান্ত কণ্ঠের এই সহজ কথা কয়টির পিছনে কতখানি সুনিশ্চিত অটলতা আছে তাহা সারদার বুঝিতে ভুল হইল না। দাসীকে ইঙ্গিতে ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সারদা রেণুর কাছে আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু ভাল আছেন তো?

রেণু হাতের পশমের কাজটা শেষ করিতে করিতে জবাব দিল, হাঁ।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কহিবার মতো কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া সারদা মনে মনে সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল। তাই উঠি উঠি ভাবিতেছে, এমন সময়ে রেণুই কথা কহিল। উলের টুপি বুনিতে বুনিতে মৃদু-কণ্ঠে কহিল, সারদাদিদি, মাকে বুঝিয়ে ব'লো তিনি যেন মনে কষ্ট না পান। আমার জন্য তাঁকে মনের মধ্যে দুঃখ-দুর্ভাবনা রাখতে মানা ক'রো। যা হবার নয় তা যে হয় না, তিনি আমার চেয়ে ভালই জানেন। দুঃখ-মোচনের চেষ্টায় উভয় পক্ষেরই দুঃখের বোঝা ভারী হয়ে উঠবে মাত্র।

সারদা নির্ব্বাক হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল ঐ কর্ম্মনিবিষ্টা নতনেত্রা মেয়েটি তাহার অত্যন্ত নিকটে থাকিয়াও অতিশয় সুদূর হইতে শান্ত কথা কয়টি যেন বলিয়া পাঠাইল।

আরও কতক্ষণ সময় কাটিয়া গেলে সারদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আমি তা হলে আজ যাই ভাই?

মাথা হেলাইয়া ইসারায় রেণু সম্মতি জানাইল।

রেণু একইভাবে অখণ্ড মনোযোগের সহিত উলের ক্ষুদ্র টুপিটি ক্ষিপ্র হস্তে বুনিতে লাগিল। রাত্রের মধ্যেই এটি শেষ করিয়া ফেলিয়া একজোড়া ছোট মোজা ধরিতে হইবে।

প্রায় সাত-আট মাস হইল ব্রজবাবু গ্রামের বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। বিমলবাবুর ভাড়া-করা ভালো বাসায় রেণু কিছুতেই যাইতে চাহে নাই। ব্রজবাবু অনেকটা সুস্থ হইয়া ওঠাতে রেণু জেদ করিয়া অল্প ভাড়ায় ছোট একটি একতলা বাসায় আসিয়াছে। পিতার অসুখে অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া অপরের

সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া বরাবর অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে সে অসম্মত। এই নীরব-প্রকৃতি সুশীলা মেয়েটির সম্মতি-অসম্মতি যে কত সুদৃঢ় দুর্লঙ্ঘ্য এই ঘটনার পর তাহা সকলেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে।

রেণু অল্প মাহিনার একটা ঠিকা ঝি রাখিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম ও দেবসেবার অবকাশে সে নিজে ছোট শিশুদের জন্য জাঙিয়া, পেনি, ফ্রক, প্রভৃতি সেলাই করে। উলের মোজা, টুপি, সোয়েটার বোনে। আচার, জেলি ও বড়ি তৈয়ারী করিয়া ঠিকা ঝির সাহায্যে দোকানে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দেয়।

খোলা ছাদের উপরে করোগেট টিনের ছাদযুক্ত একটি সিঁড়ির ঘর আছে; সে ঘরখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ঠাকুর-ঘর করা হইয়াছে। ব্রজবাবু স্নানাহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বক্ষণ এই পূজা-ঘরেই যাপন করেন। সংসার কি করিয়া চলিতেছিল, কোথা হইতে খরচ আসিতেছে সংবাদ জানিতে চান না, জানিতে ভয় পান। রেণু ছাড়া আর কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা বা দেখা-সাক্ষাৎও করেন না।

সারদা আশঙ্কা করিয়াছিল দ্রব্যসামগ্রী ফেরত আসায় সবিতার অত্যন্ত আঘাত লাগিবে। তাই বাড়ি পৌঁছিয়া দ্রব্যসামগ্রীপূর্ণ ধামাটি নিঃশব্দে একতলায় ভাঁড়ার-ঘরে তুলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সবিতা নিজের ঘরে বসিয়া পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতেছিলেন। সারদাকে দেখিয়া সপ্রশ্ন-চক্ষে তাকাইলেন।

ঘরের মেঝেতে সবিতার নিকট বসিয়া পড়িয়া সারদা বলিল, কাকাবাবু ভাল আছেন মা।

রেণু?

রেণুও ভালো আছে।

সবিতা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পঞ্জিকার পাতায় পুনরায় মনসংযোগ করিলেন।

সারদা বিস্মিত হইল। অন্যদিন রেণুর সহিত দেখা করিয়া বাড়ি ফিরিলে দেখিতে পায় সবিতা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় তাহার পথ চাহিয়া আছেন। তার পরে কতই না সতৃষ্ণ আগ্রহে একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া সমস্ত খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিতে চাহেন। রেণু কি করিতেছিল, কি কি কথা কহিল, তার চুল বাঁধা হইয়াছিল কি-না, কাপড় কাচা হইয়াছিল কি-না, রেণু আগের চেয়ে রোগা হইয়া গিয়াছে, না তেমনই আছে, ইত্যাদি। ব্রজবাবু অপেক্ষা রেণুর সম্বন্ধেই সবিতা অনেক কিছু জানিতে চাহেন, ইহাও সারদা লক্ষ্য করিয়াছে।

কতক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। সারদা আপনা আপনিই বলিতে লাগিল, ওদের অভাব এমন কিছু বেশি নয় মা, যার জন্য আপনি এত বেশি ভাবচেন। দুটি মাত্র

প্রাণী। খরচই বা কি, কাজই বা কি? ইচ্ছে করেই তাই রেণু রাঁধুনি রাখেনি। সংসারে অনটন তো কিছুই দেখলাম না।

সবিতা পঞ্জিকার একটি পাতার কোন মুড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া বইখানি বন্ধ করিলেন। সারদার মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, তা যেন ওদের না-ই রইল। কিন্তু তুমি জিনিসের ধামাটা কোথায় লুকিয়ে রেখে এলে সারদা?

সারদা থতমত খাইয়া গেল। বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল সবিতার মুখে বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। বরং ঠোঁটের প্রান্তে চাপা হাসির রেখা।

সবিতা বলিলেন, তুমি বুঝি এই ভেবে ভয় পেয়েচো সারদা যে, জিনিস ফেরত এসেচে শুনে তোমাদের মা দুঃখে ক্ষোভে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন, নয়?

সারদা লজ্জিত হইয়া বলিল, না তা ঠিক ভাবিনি। তবে—হয়তো মনে খুবই আঘাত পাবেন ভয় হয়েছিল।

সবিতা সস্নেহে সারদার পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, বোকা মেয়ে তোমার মতন করে মায়ের হৃদয়টার দিকেই কেবলমাত্র তাকিয়ে মাকে ভালবাসতে সবাই কি শিখেচে? এ নিয়ে তো রেণুর উপরে রাগ করতে পারিনে মা, তার দোষ নেই কিছু।

সে কথা আর আপনাকে বলতে হবে না। রেণু যে আপনারই মেয়ে, আজ যেন তা সবচেয়ে স্পষ্ট করে দেখে এলাম মা।

সবিতা সে কথা এড়াইয়া গিয়া সহজ সুরে কহিলেন, কি বলে তোমায় ফেরালে সে আজ?

সারদা আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইয়া শেষে বলিল, আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি কি ফেরত আসবে জেনেই জিনিস পাঠিয়েছিলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, না। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা ঠিক করে বলো তো মা, সত্যিই কি ওদের কোনও অভাব-অনটন নেই দেখে এলে?

ভিতরের কথা কি করে জানবো মা?

দেখে কি মনে হ'লো?

সারদা নতশিরে নিরুত্তর রহিল।

সবিতা আর প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার কালো ছায়া ঘনাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে সবিতা প্রশ্ন করিলেন, আজ যখন তুমি গেলে, সে তখন কি করছিলো?

উলের টুপি বুনছিলো।

সবিতার মুখে বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্লিষ্ট-কণ্ঠে কহিলেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম রাজুকে দিয়ে ওর ঐ উলের সামগ্রী কেনবার। সে রাজুকে বেচতে চায়নি।

কেন মা?

রাজু যে-দামে ওকে বেচে দিতে চেয়েছিল, সে-দাম নিতে রাজি হয়নি। বলেছিল, এ তোমাদের সাহায্য করার ফন্দি।

সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সবিতার শান্ত-গম্ভীর মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, ঐ স্থির প্রশান্তির অন্তরালে কি বিক্ষুব্ধ ঝটিকাই না বহিয়া চলিয়াছে সংসারে কেহই তাহার সন্ধান জানে না।

সারদা বলিল, মা, শুনেছিলাম রেণুর জন্য একটি ভাল ডাক্তার পাত্রের সন্ধান এনেছিলেন দেব্‌তা। সে সম্বন্ধের কি—

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সবিতা বলিলেন, সে হ'লো না। মেয়ে বিয়ে করবে না পণ করেচে।

সারদা আস্তে আস্তে বলিল, এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়েও সে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সবিতা বলিলেন, সে নাকি বলেচে, হিঁদুর মেয়ের দু'বার গায়ে হলুদ হয় না। বাগ্‌দত্তা মেয়েও বিবাহিতারই সামিল। আমার বিবাহের ব্যাপার বাগ্‌দানের পর অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়েছিল। এখন আবার দু'বার করে সে ব্যাপারগুলো হোক এটা আমি চাইনে। তোমরা আমার বিয়ের চেষ্টা ক'রো না রাজুদা, ওতে আমার মঙ্গল হবে না আমি জেনেচি।

সবিতা চুপ করিলে সারদা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাই যদি মেয়ের মত, তা হলে না হয় সেই পাত্রেই রেণুর বিয়ের চেষ্টা করুন না, যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে ওর গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত শেষ হয়েছিল! ভাগ্যে থাকলে স্বামী হয়তো পাগল না-ও হতে পারে।

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, সেই পাত্রেরই সঙ্গে সাত-আটমাস আগে রেণুর বৈমাত্র-বোন রাণীর বিয়ে হয়ে গেছে।

শুনিয়া সারদা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত সবিতা বলিলেন, আমার ভুলেই এমনটা হ'লো।

সারদা নিষ্পলক-নেত্রে সবিতার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সবিতা মৃদুস্বরে স্বগতভাবেই বলিতে লাগিলেন, এত শীঘ্র গৃহহীন হয়ে হয়তো বা ওদের পথে দাঁড়াতেও হ'তো না, আমি যদি না অমন জেদ করে রেণুর বিয়ে বন্ধ করতাম। অবশ্য পথে ওদের একদিন-না-একদিন নামতে হ'তোই, আমি সেটা

এগিয়ে দিয়েছি মাত্র। অন্ততঃ রেণুর বিমাতা এত সহজেই চট করে সম্পত্তির অংশ ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়ার অছিলা পেতেন না।

শিবুর মা আসিয়া ডাকিল, মা, দাদাবাবু ভিতর-বাড়িতে এসেচেন, তাঁর খাবার দেবেন চলুন। রাত হয়ে যাচ্চে।

সারদা ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনাকে যেতে হবে না মা, আমিই তারকবাবুর খাবার দিচ্চি গিয়ে, আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন।

না সারদা, চলো আমিও যাই। সে ব্যস্ত হবে, খাওয়ার কাছে আমাকে দেখতে না পেলে।

সারদার সহিত সবিতাও নীচে নামিয়া গেলেন।

হরিণপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সবিতা বাসা বদলাইয়াছেন। রমনীবাবুর সেই পুরাতন বাড়িতে প্রবেশ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় নাই। নিয়মিত দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে সুদীর্ঘ বারো বৎসরের অধিককাল যেখানে প্রতি পদে আত্মহত্যার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, আচ্ছন্নতার মধ্যে অর্দ্ধ অচেতনবৎ কাটাইতে হইয়াছে, আজ সেই বাড়ি-খানির দিকে তাকাইতেও আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া ওঠে। অথচ ঐ বাড়ি হইতেই আশ্রয়-চ্যুতির সম্ভাবনায় এই সেদিনও তো তাঁহাকে ভাবনায় দিশাহারা হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল নিজের রুচিকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত করিয়া, স্বভাবের বিপরীত স্রোতে অগ্রসর হওয়ার ফলে যে অপরিসীম শ্রান্তিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে ভার ক্রমেই দিনের পর দিন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল।

বিমলবাবু যে বাড়িখানি ব্রজবাবু ও রেণুর জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সবিতা সেই বাড়িটিতে উঠিয়াছেন। বিমলবাবু কলিকাতায় নাই। ব্যবসায়-সংক্রান্ত জরুরী টেলিগ্রাম আসায় সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সবিতার দেখাশুনার ভার লইয়া রাখালকে এই নূতন বাসায় থাকিবার জন্য বিমলবাবু অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। নতুন-মার তত্ত্বাবধান-ভার লইতে সম্মত হইলেও তাঁহার বাসায় বসবাস করিতে রাখাল অক্ষমতা জানাইয়াছিল। বিমলবাবুর নিকট এ সংবাদ শুনিয়া তারক স্বেচ্ছায় নতুন-মার বাসায় থাকিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

সবিতার আনুকূল্যে তারক বর্দ্ধমানের স্কুল মাস্টারি ছাড়িয়া দিয়া হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস শুরু করিয়াছে। একতলায় বহির্ব্বাটীতে তাহার বসিবার ঘর আইনজীবীর প্রয়োজনীয় উপযুক্ত আসবাবপত্রে নিখুঁতভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমলবাবু নিজে ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলের জুনিয়র করিয়া দিয়াছেন। বিমলবাবুরই ছোট মোটর গাড়িখানিতেই সে আদালতে যাতায়াত করে।

তারকের আবশ্যকীয় পোষাক-পরিচ্ছদ গাউন প্রভৃতি সরঞ্জাম সমস্তই সবিতা কিনিয়া দিয়াছেন।

তারকের আহার শেষ হইলে সবিতা উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে সারদা উপরে আসিয়া বলিল, মা, আজও আপনি কিছুই মুখে দেবেন না?

না সারদা। আমার গলা দিয়ে কিছু গলবে না। তবে যদি আমার জন্য না খেয়ে উপোস করতে চাও, তা হলে আমাকে খেতেই হবে. কিন্তু আমি জানি তুমি তোমার মায়ের 'পরে এমন জুলুম করবে না।

সারদা মলিন-মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, যাও মা তুমি খেয়ে এসো।

সারদা তবুও নত-মুখে দাঁড়াইয়া শাড়ির আঁচলের একটা কোণ দুই হাতে অনাবশ্যক পাকাইতে লাগিল।

সবিতা বলিলেন, মানুষ একবেলা না খেয়ে মরে না সারদা। কিন্তু খাওয়া অনেক সময়ে তার পক্ষে মরণাধিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তবুও যদি তুমি আমাকে আজ খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে চাও, চলো না হয় যাচ্ছি।

সারদা একবার মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, থাক্ মা। আমি একাই যাচ্ছি।

শূন্য কক্ষে আলো নিভাইয়া দরজায় খিল দিয়া সবিতা অনাবৃত মেঝের 'পরে এলাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

দুপুরে আজ রাখাল আসিয়াছিল। সবিতা বিপন্ন স্বামী ও কন্যার সকল সংবাদই জানিতে পারিয়াছেন। সমস্ত দিনটা যেন অসাড়তার মধ্য দিয়া ছায়ার মত কাটিয়া গিয়াছে, রাত্রির স্তব্ধ নির্জন অবকাশে বেদনা-ভারাতুর অন্তরতলে কতকটা যেন সাড় ফিরিয়া আসিতেছে। নিমীলিত নয়নদ্বয়ের অবিরল বিগলিত অশ্রুধারায় কঠিন কক্ষতল, অযত্নবদ্ধ কোমল চুলের রাশি ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। কোনও শব্দ নাই, চাঞ্চল্য নাই, নিস্পন্দদেহে প্রসারিত বাহুর 'পরে মাথা রাখিয়া, মাটিতে একপার্শ্ব হইয়া পড়িয়া আছেন। উপায়হীন ক্ষতির ক্ষোভে তাঁহার সমস্ত হৃদয় মন আজ কাতর ও বিকল। কোনও সান্ত্বনাই আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। আপনার সন্তানের এত দুঃখ ও কৃচ্ছ্রসাধন তাঁহাকে অহরহ যে অগ্নিকণার আঘাতে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত অন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেলেও বেদনায় আর্তনাদ করিবার উপায় কই? বলির পশুর মতো রক্তাক্ত দেহে ধূলায় পড়িয়া ধড়ফড় করা ছাড়া গতি নাই!

আজ তাঁহার তৃষিত মাতৃহৃদয় দুই বাহু বাড়াইয়া যাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য ব্যাকুল, হৃদয়-নিঙড়ানো অফুরন্ত স্নেহরসে যাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়াও তৃপ্তি নাই, সংসারে সেই আজ তাঁহার সবার বাড়া পর, সবার বেশি দূরের মানুষ হইয়া গিয়াছে।

পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত বসন্তদিনে যখন জীবন স্বতঃই আনন্দপিপাসাতুর, তাঁহাকে সেদিন উহা সম্পূর্ণ একাকী নিঃসঙ্গ বহন করিতে হইয়াছে। না মিলিয়াছে অন্তরের অন্তরঙ্গ সাথী, না পাইয়াছেন যৌবনের প্রাণবন্ত সহচর। সেই একান্ত একাকীত্বের মাঝে হঠাৎ একদিন কোথা হইতে কি যে আকস্মিক বিপ্লব হইয়া গেল তাহা নিজেও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। যখন চৈতন্ত হইল, আশে-পাশে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, সমগ্র বিশ্বসংসারে তাঁহার কেহ নাই, কিছু নাই। স্বামী, সন্তান, গৃহ-পরিজন, সংসার-প্রতিষ্ঠা, মানমর্য্যাদা সমস্তই ঐন্দ্রজালিকের ভোজবাজির স্তায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ভয়চকিত-চিত্তে সহসা অনুভব করিলেন, সংসার ও সমাজের বাহিরে নির্ব্বান্ধব নিরবলম্বন তিনি, একা শূন্তের মধ্যে দুলিতেছেন! পা রাখিয়া দাঁড়াইবার মতো মাটিটুকুও পায়ের নীচে আশ্রয় আর নাই।

জীবনের এই আকস্মিক সর্ব্বনাশের ক্ষণে যে অতিপঙ্কিল আশ্রয়ভূমির সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা সামাজিক জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার সম্পূর্ণ অগোচরে। কেবলমাত্র জৈব প্রকৃতির স্বাভাবিক আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশেই জীবন-ধারণের অনিবার্য্য প্রয়োজন; কিন্তু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কলুষিত আশ্রয়ের ক্লেদ ও কদর্য্যতায় তাঁহার দেহ মন প্রতিদিন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, জাগ্রত আত্মচেতনা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুতাপের মর্ম্মান্তিক আঘাতে আহত ও জর্জ্জরিত হইয়াছে। তবুও এই অসহ ও অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করিয়া আরও অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতেও ভরসা পান নাই। নিজের একান্ত নিরুপায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। এমনি করিয়াই তাঁহার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিয়ত-অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে।

জীবনের প্রারম্ভক্ষণে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত পুরুষ কেহ যদি তাঁহার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তাঁহার উজ্জ্বল নারীজীবনের দীপ্তিতে সংসার ও সমাজ আলোকিত হইয়া উঠিত না কি? প্রসন্ন দেহ-মনের, আনন্দিত হৃদয়ের অনুকূল আবেষ্টন প্রভাবে তিনি কি আজ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী, আদর্শ জননী, মমতা মাধুর্য্যময়ী নারী হইয়া উঠিতে পারিতেন না? কিসের জন্ত তাঁহার জীবনের উদয়-উষা এমন অকাল কুজ্ঝটিকায় বিলীন হইয়া গেল? মুহূর্ত্তের অবকাশে এতবড় প্রলয় কেমন করিয়া সংঘটিত হইল, যাহা তাঁহার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর।

সবিতার এই অবাধ অশ্রুনিষিক্ত চিন্তাধারায় সহসা বাধা পড়িল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাতের সহিত তারকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—নতুন-মা—নতুন-মা—একবার দোরটা খুলুন—

সবিতা উঠিয়া বসিয়া নিজেকে একটু সম্বৃত করিতে-না-করিতে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত ও উপর্য্যুপরি ব্যগ্র ডাক শোনা যাইতে লাগিল।

সত্বর মুখ চোখ মুছিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গায়ে মাথায় বসন সুসংযত করিয়া সবিতা দ্বার খুলিলেন। তারকের এই অধীর ব্যস্ততায় তিনি বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে অনুমান করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র তারক বলিল, আপনি নাকি রোজই রাত্রে অনাহারে কাটাচ্ছেন শুনলাম। আজও কিছুই মুখে দেননি। শরীর কি খারাপ হয়েচে?

তারকের প্রশ্ন শুনিয়া সবিতা বিস্ময়ে ও বিরক্তিতে স্তব্ধ হইয়া গেলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

তারক পুনরায় প্রশ্ন করিল।

না, আমি ভালোই আছি.—সবিতা শান্ত গলায় জবাব দিলেন।

তবে কেন রোজ এমন করে উপোস করে থাকেন? না না, সে আমি শুনবো না। কিছু-না-কিছু খাওয়া দরকার। কালই আমি ডাক্তার নিয়ে আসবো। তারকের কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পাইল।

ও-সব হাঙ্গামা ক'রো না তারক। আমি নিষেধ করচি।

তা হলে বলুন, কেন অকারণে উপোস দিয়ে শরীরের উপর এমন অত্যাচার করচেন?

রাত হয়েচে, শোও গে তারক। সবিতার কণ্ঠে নিরতিশয় ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিল।

তারক ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। বলিল, বেশ, আপনার যা খুশি করুন, আমি সিঙ্গাপুরে সমস্ত ব্যাপার লিখে জানাই। তিনি এসে শেষে যদি বলেন, তারক, তোমাকে দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম, আমাকে জানাওনি কেন—তখন কি জবাব দেবো তাঁকে?

সবিতার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ধীরভাবেই বলিলেন, আমি কেন দু'দিন খাইনি কিংবা তিনদিন ঘুমোইনি এর জন্য কারো কাছেই তিনি কৈফিয়ৎ চাইবেন না।

তা হলে এখানে আমার থাকার কি দরকার নতুন-মা? তারকের স্বরে অভিমান প্রকাশ পাইল।

সবিতা অবসন্ন-কণ্ঠে বলিলেন, আজ আমি বড় ক্লান্ত তারক। তর্ক করবার শক্তি নেই। শুতে চললাম।

সবিতা আস্তে আস্তে আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সারদা সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। তারক ফিরবার পথে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা যে প্রতিদিন রাতে উপোসী থাকচেন, এ-কথা আমাকে কেন জানাননি? আজ শিবুর মার মুখে জানতে পারলাম।

আপনি তো তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাননি!

সারদার কণ্ঠে নির্লিপ্ততায় তারক গর্জিয়া উঠিল—কি, এতবড় মিথ্যে অপবাদ! আমি নূতন-মার খবর রাখি না? দেখাশোনার ত্রুটি করি?

অকারণ চেঁচাবেন না। আমি-ও-সব কিছুই বলিনি।

নিশ্চয়ই বলেচেন। আমি বুঝতে পারচি, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলচে। আজ রাত্রেই আমি সব লিখে দিচ্ছি বিমলবাবুকে।

লিখতে আপনি পারেন; কিন্তু নতুন-মা তাতে বিরক্ত হবেন।

আমার কর্ত্তব্য আমি করবোই। সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমার উপরে দিয়ে গিয়েচেন, এ কথা ভুললে তো আমার চলবে না!

নতুন-মার রুচি-অরুচির উপরে জুলুম করতে তিনি কাউকেই বলে যাননি। বলবেনই বা কেন? সে অধিকার কারো নেই।

বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে তারক বলিল, তা হলে সে অধিকারটা কার আছে শুনি? রাখালবাবুর নয় আশা করি?

সারদার দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। নিজেকে প্রাণপণে দমন করিয়া মৃদুকণ্ঠেই বলিল, নতুন মার উপর জোর করবার অধিকার যদি আজ কারো থাকে তো রাখালবাবুরই আছে, আর কারো নেই।

মৃদু-স্বরে কথিত কথাগুলি তীক্ষ্ণাগ্র সূচের ন্যায় তারককে বিদ্ধ করিল।

গূঢ় ক্রোধ সংযত করিতে না পারিয়া তারক বলিয়া উঠিল, তা তো বটে। সেই-জন্য তিনি নতুন-মার অসহায় অবস্থায় দেখা-শোনা করার ভারটুকু পর্য্যন্ত নিতে পারলেন না? নতুন-মার বাড়িতে এসে থাকলে পাছে তাঁর সুনামে কালি লাগে।

শান্ত-গলায় সারদা কহিল, যারা স্বার্থের প্রয়োজনে সব কিছুই করতে প্রস্তুত, রাখালবাবু তাদের দলের লোক ন'ন। নতুন-মাকে দেখা-শোনার ভার নেওয়ার নতুন-মারই পক্ষ থেকে ঢের বড় কর্ত্তব্যভার তিনি নিয়ে রয়েচেন? আপনি তা জানেন না, কাজেই বুঝতে পারবেন না।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সারদা সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিয়া গেল!

দুপুরবেলায় সদ্যঃস্নাতা সবিতা সিক্ত কেশের ঘন পুঞ্জ পিঠের পরে ছড়াইয়া রৌদ্রে পিঠ রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে পত্র লিখিতেছিলেন। পরিধেয় শাড়ির কালো পাড়টি শঙ্খের মত সুন্দর গ্রীবার একপাশ দিয়া লতাইয়া গিয়া পিঠের 'পরে বাঁকিয়া পড়িয়া আছে, উদাস বিষণ্ণ ছায়াশীর্ণ শুভ্র মুখে সকরুণ শ্রী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

সারদা সেইখানেই বারান্দার একধারে বসিয়া নিজের জন্য একটি সেমিজ সেলাই করিতেছিল। পথের দিকে চাহিতে দেখিতে পাইল রাখাল আসিতেছে। সেলাইটা হাতে নিয়াই সে নীচে নামিয়া গেল সদর-দরজা খুলিয়া দিতে।

কড়া নাড়িয়া ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। খোলা দ্বারে সারদা তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে দেখিয়া রাখাল মনের ভিতর ঈষৎ খুশী হইয়া উঠিল। সেটা প্রকাশ না করিয়া বলিল, ঠিক দুপুরবেলায় সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে কেন সারদা?

একজনের জন্ত অপেক্ষা করচি।

কে সে? ফেরিওয়ালা নিশ্চয়ই!

উঁহু, চিনতে পারবেন না।

তুমিই না হয় চিনিয়ে দিলে—

নিজে থেকে চিনে নিতে না চাইলে অন্তে তাকে চিনিয়ে দিতে পারে না যে দেবতা।

কথাটা হেঁয়ালি ঠেকচে—

খেয়ালীমানুষের কাছে সব কথাই হেঁয়ালী ঠেকে শুনেচি। সরুন, দরজা বন্ধ করি।

সারদা দরজায় খিল দিয়া রাখালের সঙ্গে ভিতরের দালানে আসিল।

রাখাল মৃদু হাসিয়া বলিল, অন্তদিনেও এমনি করে নিস্তব্ধ দুপুরে কারো জন্তে দুয়ারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকো নাকি সারদা? কণ্ঠে তাহার স্বচ্ছ পরিহাসের লঘু স্বর।

সারদা মুহূর্ত্তমাত্র রাখালের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল এ বক্রোক্তি কি-না। তারপর সেও হাসিয়া জবাব দিল, হ্যাঁ, সব দিনই থাকতে হয়। যেদিন প্রথম আপনি আমাকে দেখেছিলেন, সেদিনও তো একজনের পথ চেয়ে এমনি করে দুয়ার খুলে অপেক্ষা করছিলাম।

তাই নাকি! কে তিনি বলো তো?

সারদা হাসিয়া বলিল, আমার পরমবন্ধু মরণ-দেবতা। তাঁর আসার দুয়ার তো সেদিন এমনি করে নিজের হাতে খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই খোলা দুয়ার-পথে মরণ-দেবতার বদলে এলেন মর্ত্তোর দেবতা।

রাখালের কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কথাটা হালকা করিবার জন্ত সে বলিল, যাক অপদেবতা যে কেউ এসে পড়েনি এই যথেষ্ট। চলো, উপরে যাই। নতুন-মা কি এখন বিশ্রাম করচেন?

না। চিঠি লিখচেন। এইমাত্র তাঁর খাওয়া হ'লো।

সে কি! এত বেলায়?

প্রতিদিনই তো এমনি হয়। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে শেষ করে স্নান-আহ্নিক সেরে খেতে বসেন যখন, তিনটে বেজে যায়। আজ বরং একটু আগে হয়েচে।

এর মানে কি ? নিজের হাতে ও-সকল কাজ করা তো নতুন-মার অভ্যাস নেই, এমন করলে যে একটা কঠিন অসুখে পড়ে যাবেন ! লোকজন, ঝি, রাঁধুনি এ সব কি আর নেই ? একলা মানুষ উনিই, এমনিই কি ওঁর অভাব—

অভাবের জন্য নয় দেব্‌তা।

তবে ?

এ তাঁর কঠিন আত্মনিগ্রহ।

রাখাল নিরুত্তর রহিল।

সারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বসবেন চলুন।

সারদার মুখের পানে তাকাইয়া রাখাল কহিল, আমি দুপুরবেলায় আসি, নতুন-মার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইনে তো সারদা ?

তা যদি মনে হয় আপনার, এ-সময়ে না এলেই পারেন।

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু এই সময় ছাড়া এখানে আসার যে আমার অবসর নেই সারদা !

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সারদা জবাব দিল, সে আমি জানি।

রাখাল সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, তার মানে ? তুমি এর কি জানো ?

জানি বই কি ! এই সময়ে এ-বাড়ির নতুন উকীলবাবু কোর্টে থাকেন। অতএব, আপনার বন্ধু-সঙ্কট—থুড়ি,বন্ধু-সম্মিলন ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

হুঁ, খড়ি পেতে গুনতে শিখেচ। এখন চলো, উপরে উঠবে, না নীচেই দাঁড় করিয়ে রেখে দেবে ?

সারদা বলিল, ওধারের বেঞ্চিটার ওপরে একটু বসবেন চলুন না দেব্‌তা। মায়ের চিঠি লেখা শেষ হতে এখনও একটু দেরি হবে। সেই অবকাশে আপনাকে আমি গোটা-কয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

চল, উপরে গিয়েই শুনবো।

মার সামনে বলতে পারবো না, আমার বাধবে।

সারদা রাখালকে একতলায় দালানের উত্তরদিকে লইয়া গেল। একপাশে পিঠ-ওয়ালা কাঠের মোটা একখানি বেঞ্চি পাতা আছে। নিজের আঁচল দিয়া বেঞ্চির উপরের ধুলা ঝাড়িয়া সারদা বলিল, বসুন।

রাখাল বসিয়া পড়িয়া বলিল, অতঃপর ? তোমার আসন কৈ ?

না। আমি বেশ আছি। আমার কথা অল্পই। বেশিক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

তথাস্তু। অথ কথারম্ভ হোক।

আপনি এমন করে ঠাট্টা-তামাশা করলে বলবো কি করে ?

আচ্ছা, ঠাট্টা তামাসা দুই-ই প্রত্যাহার করলাম। বলো।

সারদা রাখালের নিকট হইতে একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হাতের অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজটা নতচক্ষে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আমি ঠিক জানি না, এসব জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত কিনা। তারপর অল্প থামিয়া বলিল, আচ্ছা, রেণুর বোন রাণী বিয়ের পরে কেমন আছে জানেন আপনি?

রাখাল সারদার কাছে এ প্রশ্ন আশা করে নাই। তাই বেশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন বলো তো? আমি তো বিশেষ কিছুই জানিনে। তবে সে ভালো ঘরে-বরেই পড়েচে এবং বিয়ের পরে সুখে-স্বাচ্ছন্দে আছে শুনেছিলাম। কিন্তু তুমি এ কথা হঠাৎ জিজ্ঞেসা করচো কেন সারদা?

পরে বলবো। আচ্ছা, রাণী নাকি সন্তান সম্ভাবনা হয়েচে, ওরা চিঠি লিখে কাকাবাবুকে এই সুসংবাদ জানিয়েচে?

হয়তো হবে, কিন্তু আমাদের এ-সব খবরের দরকার কি সারদা? এই সুসংবাদ জানাবার জন্তই কি তুমি ঘটা করে আমাকে এখানে এনে বসিয়েচো?

না। সারদার কণ্ঠস্বর একটু ভারি হইয়া উঠিল। বলিল, আপনি কি জানেন রাণীর বিয়ে হয়েচে সেই পাত্রেই যে পাত্রের সঙ্গে রেণুর বিয়ে ঠিক হয়ে গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল?

রাখাল অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? তা তো কৈ জানতাম না! রাখালের মুখে চোখে চিন্তার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

হাঁ তাই।

অল্প পরে সারদা আবার প্রশ্ন করিল, কাকাবাবু নাকি বৃন্দাবন বাস করবেন মনস্থ করেছেন?

হ্যাঁ।

রেণুও সঙ্গে যাবে?

নইলে কোথায় আর থাকবে সে?

সারদা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কতকটা আপন মনেই বলিল, কিন্তু সেখানে এই বয়সে কুমারী মেয়ে—

রাখাল বলিল, সবই তো বুঝচি। কিন্তু এ-ছাড়া অন্য পথই বা কোথায় দেখিয়ে দিতে পারো সারদা? একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, যার যা অদৃষ্টে ঘটবার তার তাই ঘটে থাকে। এই দুনিয়ার নিয়ম। এ মেনে নিতে না পারলে খালি জটিলতা আর দুঃখ বেড়ে ওঠে মাত্র।

তার মানে, আপনি বলতে চাইচেন, রেণুর অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই ? আমাদের দুশ্চিন্তা নিরর্থক।

নয় তো কি ? ওর ভাগ্যবিড়ম্বনা তো শৈশবেই শুরু হয়েছে ওর জীবনে। তুমি আমি কেন, দেশ-শুদ্ধ লোক এখন ওকে সুখে রাখবার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হবে।

এই কি আপনার অন্তরের যথার্থ বিশ্বাস দেব্‌তা ?

হ্যাঁ। অনেক হোঁচট খেয়ে এই-ই এখন আমি শেষ বুঝেচি।

সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, মা কিন্তু এটা সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।

তার মানে ?

আপনি যাই বলুন দেবতা, সারদাকে ভোলাতে পারবেন না। জোর করে নিষ্ঠুর সাজতে যাওয়া আপনার মতো মানুষের সাধ্য নয়। সমস্তই আপনি জানেন, বোঝেন। আপনার জ্ঞানের কাছে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি তুচ্ছ। রেণুর আজকের অবস্থার জন্ত তার নিজের মা-ই দায়ী ; কিন্তু যা এই সংসারে বহু মানুষেরই জীবনে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটে যায়—তার কি কোনও জবাবদিহি আছে ? নিজেই সে কি খুঁজে পায় তার অর্থ ?

রাখাল ভাবহীন শূন্য দৃষ্টিতে সারদার পানে তাকাইয়া রহিল।

সারদা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তবুও ভেবে দেখুন, সেদিনের মা আর আজকের মা এক মানুষ ন'ন। উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। আর যে-কেউ যাই বুঝুক না কেন দেবতা, মায়ের নতুন-মা পরিচয়টা আপনার চেয়ে ভাল, আপনার চেয়ে বেশী আর কে জানে।

নিরুত্তরে রাখালের মুখে চোখে নিগূঢ় বেদনার বিষণ্ণতা নামিয়া আসিয়াছিল। সারদা অত্যন্ত মৃদু-কণ্ঠে বলিল, মার পানে আর চাওয়া যায় না আজকাল। কি মানুষ কি হয়ে যাচ্চেন দিনের পর দিন! ভিতরে ভিতরে অহরহ তুষের আগুনে পুড়ে পুড়ে দেহ-মন তার খাক্ হয়ে গেল। খাওয়া ছেড়ে, পরা ছেড়ে, সংসারের অনাবশ্যক কাজে দাসী-রাঁধুনীর বাড়া খাটুনি খেটে—মেয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে দেহপাত করে ফেলেচেন, তবুও একবিন্দুও শান্তি পাচ্ছেন না একদণ্ডও।

রাখাল উদাস নেত্রে উঠানের দিকে তাকাইয়া রহিল, কথা কহিল না।

সারদা বলিল, মায়ের উপর আপনি অবিচার করবেন না। আপনিও যদি অভিমানে মাকে ভুল বোঝেন তা হলে পৃথিবীতে সত্যের 'পরে যে আর নির্ভর করাই চলবে না। মানুষ বাঁচে কিসে ?

রাখাল দৃষ্টি নত করিল। কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। জবাব দিবার ছিলও না কিছু।

দেবতা, তা আপনি চলুন একটু মার কাছে। আজকের দিনে তাঁর মনের এই মর্মান্তিক জ্বালা এতটুকু জুড়োতে পারে এমন কেউ নেই আপনি ছাড়া।

এবার থেকে তোমারই কথামত চলতে চেষ্টা করবো সারদা।

গাঢ় কণ্ঠে সারদা বলিল, আপনি শুধু আমার জীবনদাতা দেব্‌তা ন'ন, আমার গুরুও। অন্ধ ছিলাম, দৃষ্টি দান করেছেন আপনিই। অজ্ঞান ছিলাম, জ্ঞান দিয়েচেন আপনি। আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় আমার দৃষ্টি বদলেচে। এ-কথাও একটুও বাড়ানো নয়, অন্তর্যামী জানেন।

২৩

বিমলবাবু সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

তারকের পত্রে সবিতার শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধনের সংবাদ পাইয়া তাহাকে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের নতুন-মা নিজে যাহা করিয়া তৃপ্তি পান, তাহাতে আমার বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়!"

তারক এই পত্র পাইয়া একরূপ বাঁচিয়া গেল। কারণ নূতন আইন প্র্যাক্‌টিস লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত, অন্যদিকে মনোযোগ দিবার মতো অবকাশ এখন তাহার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।

নতুন-মার স্নানাহারের নিত্য অনিয়ম, উপবাস ও পরিশ্রমের কঠোর অত্যাচার, কোনও কিছুর জন্যই সে আর এখন একটিও শব্দ উচ্চারণ করে না। গম্ভীর মুখে ও যথাসম্ভব নীরবে নিজের স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া যায়।

সবিতা হাসেন। একদিন কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তারক, মায়ের উপর রাগ করেচো বাবা?

মুখ অন্ধকার করিয়া তারক জবাব দিল, সে অধিকার তো আমার নেই নতুন-মা। আমি একজন পথের কাঙাল বই তো নয়।

সবিতা সস্নেহে বলেন, ছিঃ, ও-কথা বলতে নেই।

তারক আরও গোটা-কয়েক বাঁকা বাঁকা কথা ঠেস দিয়া শুনাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সারদাকে আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সে ভালই জানে, নতুন-মা কিছু না বলিলেও সারদা ইহা সহ্য করিবে না। এমন অনেক অপ্রিয় সত্য হয়তো এখনও অসঙ্কোচে সুস্পষ্ট বলিয়া বসিবে যাহা সহ্য করা তারকের পক্ষে একান্ত কঠিন, প্রতিকারেরও উপায় নাই।

বিমলবাবু তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের সংবাদ সবিতাকে পত্র-দ্বারা এবং

তার যোগেও জানিইয়াছিলেন। সবিতার নিকট সে সংবাদ শুনিয়া তারক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকালে উঠিয়াই জাহাজ-ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। গিয়া দেখিল, বিমলবাবুর ছোট ও বড় দুইখানি মোটরগাড়ি লইয়া তাঁহার ম্যানেজার সরকার ও দারবানেরা উপস্থিত রহিয়াছে। বিমলবাবু তাহাকে দেখিতে পাইয়া নিজের গাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইলেন।

মোটরে বিমলবাবু তারককে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন করিলেন, রাজু ভাল আছে তো তারক?

বিস্মিত হইয়া তারক জবাব দিল, কেন, তার কি হয়েচে?

না এমনি জিজ্ঞাসা করচি। আমি তাকে লিখেছিলাম কিনা যদি তার অসুবিধা না হয়, যেন জেটীতে আমার সঙ্গে এসে দেখা করে!

তারকের মুখের দীপ্তি মুহূর্ত্তে নিভিয়া গেল। শুষ্ক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কোনও জরুরি প্রয়োজন ছিল বোধ হয়?

হ্যাঁ। আসেনি দেখে মনে হচ্চে হয়তো বা অসুস্থ হয়ে পড়েচে, কিংবা কলিকাতার বাইরে গেছে। আমার চিঠি পায়নি।

তারক বলিল, না. পরশু সন্ধ্যাতেও তাকে আমাদের বাসায় দেখেচি।

বিমলবাবু বলিলেন, তা হলে সম্ভবতঃ কোনও কাজে আটকে পড়ে আসতে পারেনি। ড্রাইভারকে বলিলেন, শিউচরণ, পটলডাঙায় চলো।

তারক বলিল, একটু আগে আমাকে নামিয়ে দেবেন বিমলবাবু, আমার আজ একটা জরুরী কন্‌সাল্‌টেশন আছে এ-পাড়ায়।

তোমার প্র্যাক্‌টিস তা হলে বেশ জমে উঠেছে বলো?

তা আপনার আশীর্ব্বাদে নেহাৎ মন্দ নয়। প্রায় রোজই এন্‌গেজড আছি।

বেশ, বেশ, তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

তারক বিনম্রহাস্তে বিমলবাবুর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া গেল।

পটলডাঙায় আসিয়া দেখা গেল, রাখালের বাসা ডবল তালায় রুদ্ধ। সংবাদ পাইবারও কোনও উপায় সেখানে নাই।

বিমলবাবু সেখান হইতে ফিরিয়া সবিতার বাসায় আসিয়া নামিলেন। তাঁহার কণ্ঠের সাড়া পাইয়া সারদা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে প্রণাম করিল। বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া বলিল, আপনি ভারি রোগা হয়ে গেছেন। কালোও হয়েচেন খুব। সে-দেশের জল-হাওয়া বুঝি ভাল নয়?

বিমলবাবু সহাস্যে জবাব দিলেন, দুনিয়ার মায়েদের নজর চিরকাল ধরে এই একই কথা বলে আসচে। ছেলে কিছুদিন ঘরের বাইরে ঘুরে ঘরে ফিরলে, মায়েরা তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলবেনই, আহা বাছা, আমার

আধখানা হয়ে ফিরেচে। আমি যে এর চেয়ে কম কালো ছিলাম বা বেশি মোটা ছিলাম তার উপযুক্ত প্রমাণ কৈ সারদা-মা?

সারদা লজ্জিত হইয়া পড়িল। বিমলবাবু কথা এড়াইয়া বলিল, বসুন, মাকে ডেকে দিচ্চি।

ডাকিতে হইল না। রান্নাঘর হইতে সবিতা বাহির হইয়া আসিলেন। পরিধানে আধময়লা মোটা মিলের শাড়ি, শুভ্র ললাটের 'পরে ও কানের পাশে কেশগুচ্ছ রুক্ষ রেশমের ন্যায় দুলিতেছে। চেহারা আগের চেয়ে অনেক শীর্ণ। আয়ত নয়নদ্বয়ের নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে চাপা বিষণ্ণতার ছায়া।

সবিতার শরীর এত বেশি খারাপ দেখিবেন বিমলবাবু বোধহয় আশা করেন নাই, তাই চকিত হইয়া বলিলেন, এ কি, তোমার শরীর এত বেশী খারাপ হয়ে পড়লো কি করে? অসুখ করেনি তো?

ভোরের অন্ধকার আকাশে পাণ্ডুর আলোর মতো মৃদু হাসিয়া সবিতা বলিলেন, অসুখ করেনি; কিন্তু তুমি যে আমাকে লিখেছিলে জাহাজ থেকে নেমে নিজের বাড়িতেই উঠবে। সেখানে স্নানাহার সেরে বিকেলের দিকে এখানে আসবে। অথচ এ তো দেখচি একেবারে ধুলো-পায়েই উত্তরণ।

সারদা অন্যত্র চলিয়া গেল। গমনশীলা সারদার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্ঠস্বর একটু নিম্নে নামাইয়া বিমলবাবু বলিলেন, ধূলো-পায়েই দেবীদর্শন যে শাস্ত্রের বিধি।

তাই নাকি?

বিশ্বাস না হয় পঞ্জিকা খুলে দেখতে পারো। কিন্তু সে-কথা থাক্। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

কি প্রশ্ন?

শরীর এত বেশি খারাপ হ'লো কেন?

ঠোঁটের কোণে সবিতার চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিল। বিমলবাবুরই ক্ষণপূর্ব্বে সারদাকে বলার অবিকল ভঙ্গিতে কহিলেন, দুনিয়ার দয়াময়দের নজর অসহায় দীন-দুঃখীদের সম্বন্ধে চিরকাল ধরে ঐ একই কথা বলে আসচে।

সবিতার মুখে আপনার কথার অনুকৃতি শুনিয়া বিমলবাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। সবিতাও হাসিতে লাগিলেন। অস্পষ্ট বেদনা-ছায়াছন্ন গৃহের আকাশ-বাতাস যেন বহুদিন পরে আজ উন্মুক্ত হাসির স্বচ্ছ-ধারায় মালিন্যহীন হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার কাছে হার মানচি সবি—রেণুর মা।

'সবিতা' বলিতে গিয়া বিমলবাবু যে তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইয়া 'রেণুর মা'

বলিলেন, সবিতা তাহা লক্ষ্য করিয়াই শুধু একটু হাসিলেন। বলিলেন, কোথায় স্নানাহার করবে? এখানে না বাড়িতে?

তুমি যেখানে বলো।

বাড়িই যাও।

সেখানে আমার জন্ম অপেক্ষা করে বসে থাকবার কেউ নেই তুমি জানোই। আছে শুধু চাকর-বাকর আর কর্মচারীর দল। দূর সম্পর্কের এক মাসিমা থাকেন বটে তাঁর জড়বুদ্ধি ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু তার কাছে আমার আসাটা প্রীতির ব্যাপার কিংবা ভীতির ব্যাপার সঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

তা হোক, বাড়ি যাও। যাঁরাই থাকুন সেখানে, সকলেই যে তাঁরা তোমার আসার প্রতীক্ষা করচেন এটা সঠিক; তা প্রীতিতেই হোক বা ভীতিতেই হোক সরাসরি এখানে এসে ওঠা ভাল দেখাবে না।

নিন্দে হবে বুঝি? কার হবে? তোমার না আমার?

কার মনে হয়?

হয় যদি দুজনেরই নামে জড়িয়ে হবে।

তা হলে আর দেরি করচো কেন?

ভাবচি, মনের অবস্থাবিশেষে নিন্দাও অনেক সময়ে প্রশংসার চেয়ে বেশি প্রলুব্ধ করে।

দার্শনিক তত্ত্ব থাকুক। বাড়ি যাও এখন।

যাচ্চি। কিন্তু তুমি দেখচি আমাকে—

বিমলবাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা বলিলেন, তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচি। কেমন তো? হ্যাঁ, তাই। এখন তারই সাধনা করচি যে দয়াময়। কণ্ঠস্বর শেষের দিকে ভারি হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বিচলিত হইলেন। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে এই অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁহারই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—সবিতা!

সকরুণ হাস্তে বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া সবিতা কহিলেন, পরে সব বলবো এখন আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না।

না, আমি সমস্ত না জেনে বাড়ি যাবো না। তোমাকে বলতে হবে কি হয়েচে?

বলবো। বিকেলে এসো। রাতে বরং এখানে খেয়ো। আমি এখন নিজের হাতেই রাঁধচি।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই হবে। কিন্তু দেখো, তখন যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কথায় ভুলিয়ো না।

ভয় নেই। জীবনে একমাত্র নিজেকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কাউকে দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। সবিতার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

বিমলবাবু লক্ষ্য করিলেন, সবিতা আজ সহজ পরিহাসের উত্তরেও কি যেন গুরু বেদনায় গম্ভীর হইয়া উঠিতেছিল। ইহা যে তাহার অন্তর্গূঢ় কোনও একটা বিক্ষোভেরই বহির্লক্ষণ, ইহা বুঝিতে ভুল হইল না। তাই আর কোনও কথা না কহিয়া বিকালেই আসিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিমলবাবু যখন আসিলেন, সবিতা এবেলার রন্ধন শেষ করিয়া সন্ধ্যাস্নান সমাপনান্তে পরিচ্ছন্নবাসে তেতলার ছাদে একখানি ডেক্-চেয়ারে বসিয়াছিলেন। সামনে আর একখানি চেয়ার পাতা। শুভ্র আবরণে ঢাকা একটি ছোট টিপয়ের উপর স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে চাপা দেওয়া পরিষ্কার পানীয় জল, সম্ভ ঢাকনি খোলা এক-টিন বিলাতি সিগারেট, যে ব্রাণ্ডের সিগারেট বিমলবাবু সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। টিপয়ের 'পরে একবাক্স নূতন দেশলাই ও ছাই ঝাড়িয়া ফেলিবার একটি পিতলের ঝক্‌ঝকে ক্ষুদ্র আধার।

বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলে, মৃণালদণ্ডের মত দেহলতা নত করিয়া সবিতা বিমলবাবুর দুই পায়ে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

কি পাগলামি—

আয়ত চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল করিয়া সবিতা বলিলেন, পাগলামি নয়, তোমার প্রধান প্রশ্নের উত্তর যে আমার এই। প্রভাতে করেছি আমন্ত্রণ, সন্ধ্যায় নিবেদন করলাম প্রণাম। আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না তো দয়াময়?

সবিতার কণ্ঠস্বরে এমনই এক অশ্রুতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ক্ষরিত হইল যে, বিমলবাবু অল্পক্ষণ অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল, এ যেন তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিতা সে-সবিতা নয়, যে অসহায়কে তিনি রমণীবাবুর সুসজ্জিত অট্টালিকায় দিনের পর দিন নিগূঢ় বেদনায় মৌন ছায়াতলে বিষণ্ণ প্রতিমার মত বারংবার দেখিয়াছেন। আজও সকালে রান্নাঘরের সম্মুখে যাহার ম্লান ক্লিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া বুকের মধ্যে বেদনা মোচড় দিয়া উঠিয়াছিল—এ যেন সে সবিতাও নয়। সুগৌর শীর্ণমুখে একটি প্রশান্ত কোমল স্নেহময়তা। সে মুখে হৃদয়াবেগের আতিশয্যজনিত উচ্ছ্বাসদীপ্তি নাই, সলজ্জ প্রেমিকের প্রণয়সুলভ সরমরাগের রক্তিমাভা নাই।

সুকুমার ওষ্ঠাধরে প্রীতিস্নিগ্ধ সংযত হাস্যের মাধুর্য্যময় সুষমা। বিষাদ-শান্ত নয়ন-যুগলে বিচ্ছুরিত হইতেছে সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি। সকল অঙ্গভঙ্গির রেখায় রেখায়

বিকশিত হইয়া উঠিতেছে আজ এমন একটি সুচারু-সুন্দর অথচ সম্ভ্রমসূচক অভিব্যক্তি যাহাতে স্নেহ ও শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্মিলিত ব্যঞ্জনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নারীর এ মূর্ত্তি সংসারে একান্তই দুর্লভদর্শন। বিমলবাবুর বিচিত্র জীবনে এমনটি তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

সবিতার মহিমময়ী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া আজ সর্ব্বপ্রথম বিমলবাবুর মনে হইল তিনি এ-জগতে যে স্তরের মানুষ, সবিতা তাহার অনেক উর্দ্ধলোকের অধিবাসিনী। মানবজীবনের যে অন্তরতম অনুভূতি, চরম দুর্য্যোগের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দুঃখের দুর্গম পথে বিক্ষত পদযাত্রীর যে ভূয়োদর্শন আজ তাঁহার অন্তর-বাহির ঘিরিয়া এমন একটি মহিমাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে যাহাকে শুধু যথেষ্ট ব্যবধান হইতে মাথা নত করিয়া প্রণাম করাই চলে, পাশে দাঁড়ানো চলে না।

বিমলবাবুর এই অভিভূত ভাব লক্ষ্য করিয়া সবিতা মনে মনে কুণ্ঠিত হইলেও সহজ-মুখেই সম্ভাষণ করিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ব'সো।

বিমলবাবু নিঃশব্দে নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তখনও সবিতার পানে অপলক-নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সে চাহনিতে আজ আর বিমুগ্ধের বিহ্বল আকুলতা নাই, আছে অনুরাগীর সশ্রদ্ধ বিস্ময়। এ যেন বাঞ্ছিত দেবমূর্ত্তির প্রতি ভক্তের বন্দনা-সুন্দর সন্দর্শন।

সবিতা সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌চো কি?

তোমাকেই দেখচি।

আমাকে কখন দেখোনি?

আজকের তোমাকে সত্যিই কখনও দেখিনি! যাকে দেখ্‌চি সে এ-তুমি নও।

সে কোন্ আমি দয়াময়?

সে অন্য তুমি। দুঃখের পীড়নে বিচলিতা, অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ভাবনায় কাতর তুমি। আত্মচিন্তায় আত্মহারা অসহায় তুমি।

আর আজকের আমি?

এ তুমি আর এক নতুন মানুষ। আজই প্রথম দেখা পেলাম। এর সাথে সত্যিই আমার পরিচয় ঘটেনি এতদিন। সিঙ্গাপুরে লেখা তোমার চিঠি-গুলির মধ্যে এর চরণধ্বনি শুনতে পেয়েচি বটে; আজ এসে দেখলাম অনস্যুপূর্ব্ব আবির্ভাব।

সবিতা হাসিলেন। সে হাসি উদার। গোধূলির রক্তিম আলোকে দূরাগত বাঁশির পূরবী সুর যেমন মানুষের চিত্তকে ক্ষণকের জন্যও অকারণ উদাস করিয়া

তোলে, সবিতার এই হাসিতে সেই মুহূর্ত্তের উদাস করিয়া তোলার আশ্চর্য্য মায়া নিহিত। বলিলেন, কি জানি হতেও পারে! এক জন্মেই যে কত জন্মান্তর ঘটে যায় মানুষের, তার কি হিসাব আছে?

বিমলবাবু কথা কহিলেন না। বিস্মিত নয়নে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, সবিতার পরিধানে একখানি খয়েরীপাড় দুধেগরদ শাড়ি। কার্য্যোপলক্ষে একবার কাশী গিয়া বিমলবাবুই এই গরদের শাড়িখানি পূজা-আহ্নিকে ব্যবহারের জন্ম সবিতাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। শাড়িখানি পরিবার জন্ম অনুরোধ করিলে সবিতা হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, এখন থাক। সময় হলে পরবো।

আজ সেই শাড়িখানি পরিয়াই তিনি বিমলবাবুর জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিমলবাবু বলিলেন, জন্মান্তর মানতাম না, কিন্তু তুমি আমায় মানালে। সত্যি বটে ওটা এই জীবনেই ঘটে। তাই এতদিন পরে তোমার তো সময় হয়েচে আমার এ-জন্মেই আমার দেওয়া শাড়ি পরবার।

সবিতাকে নিরুত্তর দেখিয়া বিমলবাবু বলিলেন, হয়তো ভুল বলচি। সময় হয়েচে না বলে সময় ফুরিয়েচে বলাই উচিত ছিল আমার না সবি—রেণুর মা?

বিমলবাবুর প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু তুমি এই বিড়ম্বনা আরও কতদিন ভোগ করবে বল তো? ভিতর থেকে যে ডাকটা আপনা হতে বেরিয়ে আসচে, তাকে বারে বারে গলা টিপে ঠেলে সরিয়ে অন্তের মুখের ডাক আওড়াতে চেষ্টা করচো! কতবারই তো ঠোক্কর খেলে! তবু ছাড়বে না?

বিমলবাবু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

সবিতা বলিতে লাগিলেন, আগে ডেকেচো নতুন-বৌ, সেটা তোমার নিজের মুখের ডাক নয়। ও নামে প্রথম যিনি ডেকেচেন তাঁরই মুখে ওটা মানায়। তোমার মুখে বেসুরো শোনালো। তার পরে ডাকতে চেষ্টা করেচো 'রেণুর মা', সেও তোমার মুখে বার বার বাধা পাচ্ছে, স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারেনি, পারবেও না কোনদিন।

তবে কি বলে তোমায় ডাকবো বলে দাও তুমি!

কেন 'সবিতা'! যে ডাক আপনা হতে সহজে মুখে আসচে।

তাই না হয় ডাকবো। কিন্তু 'রেণুর মা' বলে ডাকতে তুমিই যে আমাকে বলেছিলে একদিন। আচ্ছা সত্যি করে বলো, না জেনে কোনোদিন অমর্য্যাদা ঘটিয়েচি কি সে-ডাকের?

ও-কথা মনেও এনো না। তোমাকে ও-নামে ডাকতে বলা আমারই ভুল হয়েছিল। তোমার কাছে আমার তো ও-পরিচয় নয়। কোনদিনই ও-ডাকটা তাই তোমার কণ্ঠে সজীব হয়ে উঠলো না। দেখো, অনেক দুঃখ পেয়ে, একটা কথা

আমি এখন বেশ বুঝেচি, যার যা, তার তাই ভালো। তোমার মুখে সবিতা ডাক যত সহজ-সুন্দর, এমন অন্য কিছুই নয়।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, আমার অন্তরের আনন্দ-নির্ঝরে যে নামের বুদ্‌বুদ্‌গুলি আপনা হতেই রামধনু রং নিয়ে ফুটে উঠে আপনি ভেঙে ভেঙে বিলীন হয়ে যাচ্চে, সেই নাম দিয়েই এবার থেকে ডাকতে অনুমতি দাও তাহলে ; কিন্তু বুদ্‌বুদের ভাঙা-গড়ার বিরাম নেই জানো তো!

জানি।

তুমি কি সইতে পারবে রেণুর মা? হোক না সে জলবিন্দুর বুদ্‌বুদমাত্র, তবুও তোমাকে হয়তো বিঁধবে, আমার ভয় করে।

সবিতার মুখে ছায়া নামিয়া আসিল। বলিলেন, ঐ তো তোমাদের দোষ। মেয়েদের সম্পর্কে কোনদিনই সহজ হতে পারো না তোমরা। হয় অতিভক্তি অতিশ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে বহু সম্ভ্রমে উঁচুতে তুলে ধরতে চাইবে, না হয় একেবারে নর-নারীর আদিম সম্পর্ক পাতিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে বসবে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে মানুষের সহজ-সুন্দর সম্বন্ধ পাতানো যায় না সত্যিই?

বিমলবাবু শান্ত গলায় বলিলেন, তোমার আমার সম্বন্ধের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠবার সময় যদিও আজও আসেনি সবিতা, তবুও তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি, বলতে পারো কি, কেন এমন হয়?

একটু চিন্তা করিয়া সবিতা বলিলেন, ঠিক জানিনে। তবে অনুমান হয়, সমাজ-বিধির মনের নীচেই এর বীজ পোঁতা আছে হয়তো। নইলে সর্ব্বত্র সকলক্ষেত্রেই একই বিষময় ফল ফলে ওঠে কি করে? দেখো, সমাজের বাইরে এসে আজ আমার চোখে সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের দুটো দিকই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেচে। ওর ভেতরে থাকতে এমন করে দোষ ও গুণ দুটো দিক দেখতে পাইনি!

বিমলবাবু নিবিষ্টচিত্তে সবিতার কথা শুনিতেছিলেন, নিজে কথা কহিলেন না। সবিতা বলিতে লাগিলেন, মানুষ নিজের মন নিয়ে কতই না বড়াই করে, কিন্তু কতটুকুই বা তার পরিচয় সে জানে? জীবনের প্রতি অঙ্কে অঙ্কেই তার রূপ বদলাচ্চে।

এই তো সেদিন পর্য্যন্ত মনে ভেবেচি, আমার মত স্বামীকে ভক্তি জগতে বুঝি আর কোনও মেয়েই কখনও করেনি। স্বামীকে আমার মত এতটা ভালবাসতেও হয়তো অন্য কোনও কেউ পারবে না। বাইরের পৃথিবী বিপরীত সংবাদ জানলেও, আমার আপন অন্তরের খবর আমি তো ভাল করেই জানি ; কিন্তু এতদিন পরে আজ সে-ধারণা বদলে গেছে আমার। আপন অন্তরের যথার্থ অর্থ এতকাল বাদে বুঝতে পারচি।

আশ্চর্য্য হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, কি বুঝচো সবিতা ?

কতকটা আত্মগতভাবে সবিতা বলিলেন, ঠিক স্পষ্ট করে সেটা বলা শক্ত। আজ শুধু এইটুকু আমি বেশ বুঝতে পারচি, অন্তরের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সংস্কারগত ধারণা আর হৃদয়ের প্রেম একই বস্তু নয়।

কিন্তু আমি শুনেচি অনেক সময় শ্রদ্ধা-ভক্তিই তো হয়ে দাঁড়ায় প্রেমের ভিত্তি।

হাঁ, তা হয়। করুণা মমতা বা সমবেদনাও অনেকক্ষেত্রে হয়তো প্রেমকে গড়ে তোলে ; কিন্তু আমার বিশ্বাস নারী ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে ভিতর ও বাহিরে স্বাভাবিক মিল না থাকলে প্রেম স্ফূর্ত্ত হলেও সুসার্থক হয় না। তা ছাড়া, আরও একটা কথা। অনেক সময়ে শ্রদ্ধা-ভক্তিকে কিংবা স্নেহ-মমতাকে মানুষ প্রেম বলে ভুলও করে।

তুমি কি বলতে চাও, স্নেহ বা মমতা হতে যে প্রেমের উদ্ভব তা সত্য কিংবা সার্থক নয় ?

এমন কথা কেন বলবো ? নিশ্চয় তা সত্য, এবং সত্য হলেই সার্থক না হয়ে পারে না। আমি বলছি স্নেহ-মমতা যথার্থই যদি প্রেমে পরিণত হয়, তবেই সত্য। সাগরে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে তখন সকল জলই এক, ঝর্ণার জলও যা, বৃষ্টির জল, বন্যার জলও তাই।

বিমলবাবু সবিতার পানে স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এ-সকল কথা তুমি জানলে কেমন করে ?

অল্পক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া সবিতা মুক্ত আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কহিল, নিজেরই বিড়ম্বিত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি দয়াময়।

বিমলবাবু প্রশ্নপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

সবিতা বলিলেন, বলবো তোমাকে একদিন আমার সমস্ত কথাই।

বিমলবাবু অনুযোগের সুরে বলিলেন, তুমি সমস্ত কথাই অন্য একদিন বলবো বলে সরিয়ে রেখে দাও। কবে তোমার সেই অন্য একদিন আসবে সবিতা ? একদিন বলেছিলে, তোমাকে আমার স্বামীর সমস্ত কথা শোনাবো, সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ নয়।

সবিতা বলিলেন, বলতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বলা হয়ে উঠে না। নিজেকে সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে ; কিন্তু সে সব কথা শুনে লাভই বা কি ? স্বেচ্ছায় স্বামী ত্যাগ করে যে-মেয়ে অকূলে ভেসেচে—স্বামীর প্রতি আজও তার মনোভাব কেমনতরো, জানতে বুঝি কৌতূহল হয় ?

ছি—ছি—পরিহাস করেও এমন কথা আমাকে বলা তোমার উচিত নয়, এ কি তুমি জানো না সবিতা ?

জানি। মাপ করো। তোমাকে অকারণ আঘাত করলাম, আমার অপরাধের শেষ নেই। তারপর অন্যমনস্কচিত্তে সবিতা কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

বিমলবাবু নীরবে একদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

বিমলবাবু ডাকিলেন, সবিতা—

কি বলচো?

সত্যি করে বলো, তুমি কি আমায় ভয় করো?

কি জন্য ভয়? সবিতার কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইল।

বিমলবাবু জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে ভয়ের তো আমার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কি ক্ষতি বাকী আছে এখনও যার জন্য ভয় করবো!

বিমলবাবু বলিলেন, জীবনের উপর এত বড় অভিমান আর যে করে করুক তোমাকে করতে দেবো না। মানুষের যা-কিছু মর্য্যাদা জীবনের একটা কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায় না। যতক্ষণ বেঁচে থাকে মানুষ, ততক্ষণ তার সবই থাকে। কোন কিছুই ফুরিয়ে যায় না।

সবিতা মৌন রহিলেন। কতক্ষণ পরে স্থির-গলায় বলিলেন, তোমাকে ভয় একটুও করিনে। বরং তোমার সম্বন্ধে নিজের এই একান্ত নির্ভরতাকে ভয় করেচি এতদিন। এখন সে ভয়ও কেটেচে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, সংসারে আর বুঝি কোনও মেয়েই এমন কোনও নিঃসম্পর্কীয় পুরুষকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অল্প থামিয়া কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া সবিতা আবার বলিলেন, আমি জানি তুমি কোনদিন আমাকে নীচে নামাতে পারো না। পুরুষদের কাছে মেয়েদের অপমান ও অবহেলা যা হতে ঘটে, তা তুমি কখনও ঘটতে দেবে না। সবার চেয়ে বড় কথা, আমাকে বুঝতে তোমার ভুল হয়নি।

বিমলবাবু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, মানুষ মানুষই, দেবতা তো নয়। তার সমস্ত ভালো মন্দ দোষ গুণ; বলিষ্ঠতা দুর্ব্বলতা নিয়েই তার সমগ্র রূপ। সুতরাং তার উপরে কি এতটা বেশি বিশ্বাস রাখা সঙ্গত?

কি সঙ্গত আর কি অসঙ্গত জানিনে। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে জানতে চাইওনে। যা নিজের অন্তরের মধ্যে একান্তভাবে অনুভব করেছি তাই বললাম মাত্র।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার সংস্পর্শে এসে কি আমার লাভ হয়েছে জানো সবিতা? আমি সর্ব্বপ্রথম অনুভব করেছি, অকল্যাণের ভিতর দিয়েও পরমকল্যাণ এসে জীবনকে স্পর্শ করে।

সবিতা বলিলেন, মানি এ-কথা আমি। অকল্যাণের পথেই আমার দীর্ঘ চলার ক্লান্ত সাঁঝে তোমার সঙ্গে হয়েছিল হঠাৎ সাক্ষাৎ। হয়েছিল বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে অবাঞ্ছিত পরিচয়। ভাগ্যে জোর করে তুমি সেদিন দেখতে এসেছিলে আমাকে!

বিমলবাবু আহত হইয়া অকৃত্রিম দুঃখিত স্বরে বলিলেন, এ ধারণা তোমার সত্য নয় সবিতা। জীবনের অজ্ঞাত পথে মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় পরিচয় কবে কোনদিন কোথা দিয়ে কেমন করে ঘটে যায়, কেউই জানে না। কথাটা আমি আমার নিজের দিক থেকেই বলেছিলাম। এতদিন নিজেরও অতীতের অপরিচ্ছন্ন অংশটার পানে তাকিয়ে হয়েচে বিতৃষ্ণা, হয়েছে ঘৃণা, ক্ষোভ, লজ্জা। কতবার ভেবেচি, জীবনের অশুচি অংশটাকে যদি কোনও উপায়ে ধুয়ে সাদা করে ফেলা যেতো! ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করা যেতো স্মৃতির খাতা থেকে ঐ গ্লানিময় দিনগুলির পৃষ্ঠা! কিন্তু আজ সর্ব্বপ্রথম মনে হচ্চে, ভগবান মঙ্গলই করেছেন, ঐ দিনগুলির দুরপনেয় কালির দাগ এঁকে দিয়ে এ জীবনে।

বিস্মিত সবিতা মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, তার মানে?

বুঝতে পারলে না? আজ আমার লোভের অশুচিস্পর্শ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। নিজের জীবনের এই কলঙ্কিত আঙিনায় তোমাকে এনে দাঁড় করাতে পারবো না আমি। এখানে তোমার উপযুক্ত আসন নেই যে!

সবিতা অস্ফুট-স্বরে কহিলেন, সোনায় কলঙ্ক লাগে না দয়াময়! কলঙ্কের কণামাত্র স্পর্শেই চিরমলিন হয়ে যাই আমরাই নিকৃষ্ট ধাতু।

বিমলবাবু গম্ভীর-কণ্ঠে বলিলেন, আমি তা একটুও মানিনে। দেখ সবিতা, আর যার কাছে যাই হও, আমার জীবনে পরম কল্যাণরূপিণী তুমি, এ-কথা মিথ্যা নয়। জীবনে ঘটেছে আমার বহু বিচিত্র নারীর সাক্ষাৎ; কিন্তু তোমার সাথে হ'লো সন্দর্শন। আমার মধ্যে যে সত্যি মানুষটা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল, তুমি তার ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তুললে সেদিন, তোমার স্বতঃ অভিজাত প্রকৃতির আপন স্বরূপ, সেই বিষণ্ণ ম্লান অনুতাপদগ্ধ অথচ সহজ মর্য্যাদামহিম রূপের প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম। রমণীবাবুর প্রমোদ-আমন্ত্রণে দেখতে গিয়েছিলাম এক, দেখলাম তার বিপরীত। তোমার জীবনের ইতিহাস আজ আমার নিজের জীবনের ভোগ ভুলিয়ে দিয়েচে সবিতা। সংসারে আমারই অনুরূপ অনুভূতি ঘটেচে এমন মানুষ এই প্রথম দেখলাম, সে তুমি—যে নিজের প্রকৃতি হতে বিভিন্ন হয়ে অবাঞ্ছিত অন্তর জীবন অনিচ্ছাসত্ত্বেও —স্বেচ্ছায় যাপন করতে বাধ্য হয়েচে। নিজের স্বভাবকে চাপা দিয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাবী মিটিয়ে, আয়ুকে কোনও গতিকে শেষের পানে টেনে চলা বৈ তো নয়। অনুভূতির ক্ষেত্রে তুমি আর আমি এইখানে একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

হয়তো বা এইজন্যই তোমার অন্তরের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা যা সম্ভবপর ছিল না, তা সম্ভব শুধু নয়, সহজও হয়েচে।

সবিতা নত-নেত্রে নীরবে শুনিতেছিলেন। এখনও অবনত নয়নে মৌন রহিলেন।

বিমলবাবু ধীর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আজ আমার কাছে জীবনের অর্থ গেছে বদলে। মনের পুরনো ধারণাগুলির উপর থেকে বহুদিনের সঞ্চিত পুরু ধুলো নিঃশেষে যাচ্ছে মুছে। দীর্ঘকাল উপেক্ষায় পড়ে থাকা আয়নার উপরে জমাট ময়লা তার যে স্বচ্ছতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সে যেন আজ কোন নব-গৃহলক্ষ্মীর সযত্ন-মার্জনায় একেবারে নির্মল হয়ে উঠেচে। সমস্ত পৃথিবী আমার কাছে অভিনব ঠেকচে আজ। এ যৌবনের উদ্দাম হৃদয়াবেগ নয়, দেহের শিরায় শিরায় তরুণ রক্তের চঞ্চল-নৃত্য নয়। এ আমার হিমকঠিন অন্তরলোকে মূর্চ্ছিত আত্মার জাগরণ, হৃদয়ের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে নবচেতনার প্রথম সূর্য্যোদয়!

স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী বিমলবাবু যে এমন করিয়া আপন অন্তরের গভীর অনুভূতি-গুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, সবিতার কল্পনাও ছিল না। সংসারে বুঝি সব-কিছুই সম্ভব। তাই অত্যন্ত ধীরে, প্রায় অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মতোই সবিতা বলিতে লাগিলেন, এ তো তোমার নিজের মনের রচনা করা—আমি। ওর সঙ্গে সত্যিকার আমার মিল কতটুকু, সে সন্ধান তুমিও জানো না, আমিও জানিনে। নাই থাক্ সে জানাজানি, ভগবান করুন, তুমি যে-আমাকে দেখেচো সে যেন তোমার কাছে মিথ্যা না হয়।

২৪

বিমলবাবু যখন রাখালের খোঁজ করিতেছিলেন, সে তখন কলিকাতার বাহিরে। রেণু ও ব্রজবাবুকে বৃন্দাবন পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া বিমলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিমলবাবু অভিযোগ করিলেন, একটা দিন অপেক্ষা করলেই আমার সঙ্গে ব্রজবাবুর দেখা হতো। তুমি কেন তার ব্যবস্থা করলে না রাজু? তোমাকে তো আমি চিঠি লিখেছিলাম।

ওঁরা যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবেন বলেই তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন।

তার কারণ?

তা জানি না। তবে কাকাবাবুর চেয়ে রেণুই বেশি ব্যস্ত হয়েছিল।

বুঝেচি।

বিমলবাবু কতক্ষণ মৌন রহিয়া পরে বলিলেন, বৃন্দাবনে কোথায় ওদের রেখে এলে?

গোবিন্দজীর মন্দিরের কাছাকাছি একটি গলিতে। বাড়িখানি বড়, অনেক ঘর ভাড়াটে থাকে। এঁরা নিয়েচেন দুখানি শোবার ঘর, একটু রান্নার জায়গা। ভাড়া সামান্যই।

বিমলবাবু চিন্তিত-মুখে বলিলেন, তুমি ছাড়া ওদের দেখাশোনার কেউই রইলো না। আমার মনে হয়, অন্ততঃ কিছুদিনও এ-সময়ে বৃন্দাবনে গিয়ে তোমার থাকা দরকার।

কিন্তু তার ফলে আমার জীবিকা যে এখানে অচল হয়ে দাঁড়াবে!

বিমলবাবু নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। রাখাল বলিল, আপনি অদৃষ্ট মানেন কি-না জানি না, আমি কিন্তু মানি।

রাখালের কথার উত্তর না দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, তুমি বোধ হয় শুনেচো—তারক হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। প্র্যাকৃটিশ মন্দ হচ্চে না। মনে হয় ওর উন্নতি হবেই। ছেলেটির বড় হবার আকাঙ্ক্ষা খুব। অনেক আশা করেছিলাম, ওর হাতে রেণুকে দেবো। কিন্তু ব্রজবাবুর সঙ্গে তো এ-বিষয়ে আলোচনারই সুযোগ হ'লো না।

রাখাল বিস্মিত হইয়া বিমলবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

বিমলবাবু পুনরায় বলিলেন, তোমার নতুন-মারও তাই ইচ্ছে ছিল। শুনলে হয় তো ব্রজবাবুও রাজি হতেন।

রাখাল মৃদু-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তারক কি রাজি হয়েচে?

তাকে এখনও বলা হয়নি। তবে তোমার নতুন-মা তাকে আভাসে কতকটা জানিয়ে রেখেচেন।

রাখাল আবার বলিল, আপনার কি মনে হয়, সে এ-প্রস্তাবে সম্মত হবে?

বিমলবাবু বলিলেন, সম্মত না হবার তো কোন কারণ দেখি না। রেণু সকল দিক দিয়েই যোগ্যপাত্রী। একটিমাত্র ত্রুটি তার বাপ এখন দরিদ্র। কিন্তু মায়ের যা কিছু আছে রেণুই পাবে। তারক নিজে তোমার নতুন-মাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করে, তাঁরই কাছে সে রয়েচে, সুতরাং কোনদিক দিয়েই তার অমত করার কারণ দেখা যায় না।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল।

বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।

রাখাল বলিল, কি বলুন!

তারকের কাছে এই বিবাহের প্রস্তাবটা তোমাকে তুলতে হবে।

১২শ—৩০

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনি কি শোনেননি রেণু বিবাহ করতে একেবারেই অসম্মত?

তাকে রাজি করবার ভার আমার। তুমি তারকের কাছে কথাটা উত্থাপন করে তার মতামতটা আমাকে জানালে, আমি নিজে বৃন্দাবনে গিয়ে রেণুকে সম্মত করিয়ে আনতে পারবো।

রাখাল বলিল, আপনি ভুল করছেন। রেণু বা তারক কেউই এ বিবাহে সম্মত হবে মনে হয় না।

বিমলবাবু বলিলেন, রেণুর কথা থাক্। তারক কেন রাজি হবে না বল তো?

সে আমি—কি করে বলবো? তবে সম্ভবতঃ হবে না বলেই মনে হয়।

তুমি একবার প্রস্তাব করেই দেখ না।

আচ্ছা।

বাসায় ফিরিয়া বাহিরের পরিচ্ছদ না ছাড়িয়াই বিছানার উপর লম্বা হইয়া রাখাল শুইয়া পড়িল। চক্ষু বুজিয়া সম্ভব অসম্ভব কত কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, খেয়াল রহিল না।

বুড়ি নানী কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছে, কাজ করিতে আসিতে পারে না, তার দৌহিত্রকে কাজে পাঠায়। নানীর নাতির বয়স বেশি নয়। বছর তেরো-চৌদ্দ হইবে। নাম নীলু। খুব হাসিখুশি ফুর্ত্তিবাজ ছেলেটি, সর্ব্বদা কণ্ঠে গুন-গুন করিয়া গানের সুর লাগিয়াই আছে। কাজকর্ম্ম বেশ চটপট করিতে পারে, তবে প্রায় প্রতিদিনই রাখালের দুটা-একটা চায়ের পেয়ালা পিরিচ, না হয় কাচের প্লেট বা গ্লাস তার হাতে ভাঙিয়া থাকে। যখনই সে অপ্রতিভ মুখে লম্বা জিভ কাটিয়া রাখালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, রাখাল তাহার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারে আজ আবার কাচের জিনিস একটা গেল। কাচের ভাঙা টুকরাগুলি সাবধানে ফেলিয়া দিতে বলিয়া রাখাল তাহাকে ভবিষ্যতে কাচের সামগ্রী সতর্কভাবে নাড়াচাড়া করিবার সদুপদেশ দেয়। তৎক্ষণা প্রবলভাবে মাথা হেলাইয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া আবার তিন লাফে নীলু ছুটিয়া চলিয়া যায়। রাখাল তাহার নানী বুড়ির নাতিকে আদর করিয়া ডাকে নীলুখুড়ো!

বেলা চারটার সময় নীলু আসিয়া যখন রাখালকে ডাকিয়া জাগাইল, চোখ রগড়াইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তাহার খেয়াল হইল, আজ খাওয়া হয় নাই। বিমলবাবুর সহিত দেখা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া কাপড়-জামা না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়াছিল, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে টের পায় নাই।

পানে চাহিয়া রাখাল নিজের 'পরে বিরক্ত হইল। আজকাল তাহার যেন কি হইয়াছে! ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, বেশভূষা, শরীর-স্বাস্থ্য কোনদিকে আর মনোযোগ নাই। এমন কি সবদিন খাওয়া-দাওয়ারও খেয়াল থাকে না তার। এ ভাল নয়। গরীব মানুষ সে। এ-রকম খামখেয়াল বড় মানুষদেরই সাজে। যাহাদের প্রতিবারের পেটের অন্ন প্রতিদিনের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে, তাহাদের এ অন্যমনস্কতা শোভা পায় না। বারংবার সুদীর্ঘ কামাই করার দরুণ তাহার টিউশনিগুলি একে একে গিয়াছে। কেবল একটিমাত্র টিউশনি আজও কোনক্রমে টিকিয়া আছে, সে কেবল রাখাল তাহাদের সময়-অসময়ের একমাত্র বিশ্বস্ত কাজের মানুষ বলিয়া টিউটররূপে তার মূল্য না থাকিলেও, বন্ধু হিসাবে, বিশ্বস্ত কাজের লোক হিসাবে মূল্য আছে। নিজের লেখাপড়ার কাজও এইসব ঝঞ্ঝাটে বন্ধ রহিয়াছে। যাত্রার পালা লেখা ও বেনামীতে নাটক রচনায় বহুদিন আর হাত দিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের ও পোস্টঅফিসের পাশ বহিতে জমার ঘর শূন্য হইয়া আসিয়াছে। খাবারের দোকানে, মুদির দোকানে এবং গোয়ালার কাছে কিছু টাকা বাকী পড়িয়াছে। যদিও সে আজকাল আর নিজের পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদের সৌখিন বিলাসে একেবারেই মনোযোগী নয়—তবুও দর্জ্জি ও ধোবার বিল বোধহয় বেশ কিছু জমিয়াই আছে।

নীলুর ডাকে রাখাল উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, নীলুখুড়ো, স্টোভটা ধরিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মতো চায়ের জলটা চড়িয়ে দাও দিকি।

নীলু ঘরের সম্মুখে দালানে এঁটো বাসন দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া রাখালের নিকটে আসিয়াছিল। উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, আপনার কি অসুখ করেচে?

রাখাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, কে বললে রে?

কিচ্ছু খাননি যে!

রাখাল হাসিয়া বলিল, না, অসুখ করেনি। এমনিই আজ খাইনি। তুমি এখন একটা কাজ কর তো নীলুখুড়ো। চায়ের জলটা দিয়ে ঐ মোড়ের দোকান থেকে গরম সিঙাড়া কিছু নিয়ে এসো, চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে।

নীলু স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল বসাইয়া খাবার আনিতে চলিয়া গেল। রাখাল চা তৈয়ার করিতে বসিল। একবার মনে হইল, এত হাঙ্গামা না করিয়া সারদার কাছে গিয়া বলিলেই তো হয়—আজ অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাত খাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে। ব্যস্, তারপরে আর কিছু ভাবিতে হইবে না।

কল্পনায় সারদার স্তম্ভিত ক্রুদ্ধ মুখের অন্তরালে যে ব্যাকুল স্নেহের সংগুপ্ত রূপ রাখালের চোখে ভাসিয়া উঠিল, তাহা স্মরণ করিয়া বুকের ভিতর হইতে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল; না, সারদার নিকট যাওয়া উচিত নয়। বেচারী নিরুপায় বেদনায় মর্ম্মাহত হইবে মাত্র! রাখাল জানে, সারদার কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা,

দেব্‌তাকে নিজের হাতে সেবা-যত্ন করিবার। উন্মনা চিত্তে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া রাখাল চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

সারদা ও সবিতাতে আলাপ চলিতেছিল। সবিতা বলিলেন, তোমাদের সোনার-পুরের গল্প বলো সারদা, শুনি।

সারদা হাতে সেলাইয়ের কাজ করিতে করিতে জবাব দিল, আপনাকে যে একবার দেখেচে মা তাকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না যে, রেণু আপনারই মেয়ে! কেবল চেহারাতেই সে আপনার মেয়ে হয়নি; বুদ্ধিতে, মর্য্যাদাশীলতায়, মনের আভিজাত্যে সে আপনারই প্রতিচ্ছবি।

সবিতা বলিলেন, সারদা, এমন করে কথা কইতে শিখলে তুমি কার কাছে? এ তো তোমার নিজের ভাষা নয়!

সারদা লজ্জিত হইয়া মাথা অবনত করিল।

রেণুর সম্বন্ধে এ সকল কথা তুমি আর কারও সাথে আলোচনা করেচো বুঝি?

সারদা সলজ্জ সঙ্কোচে বলিল, হ্যাঁ সোনারপুরে দেব্‌তার সঙ্গে রেণুকে নিয়ে আমাদের আলোচনা হ'তো।

সবিতা হাসিয়া সারদার মাথায় পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি জানি।

সারদা উৎসাহিত হইয়া বলিল, সত্যি মা, এত বেশী সাদৃশ্য বড় দেখা যায় না। রেণু যেন একেবারে আপনারই ছাঁচে গড়া।

সবিতা ত্রস্তগলায় বলিয়া উঠিলেন, না না, অমন কথা মুখে এনো না সারদা, আমার মতন যেন কিছুই না হয় তার।

সারদা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আচ্ছা, ও-কথা থাকুক এখন। কাকাবাবুর গল্প করি, কেমন?

সবিতা বলিলেন, বলো।

কাকাবাবু মানুষটি বড় ভাল, কিন্তু মা, সংসারে থেকেও তিনি সংসার-উদাসীন। গোবিন্দ গোবিন্দ করেই পাগল। ইহ-সংসারে গোবিন্দ ছাড়া কিছুরই প্রতি তাঁর আসক্তি আছে বলে মনে হয় না।

সবিতা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজের মেয়ের প্রতিও না?

সবিতার শঙ্কাকুল মুখের পানে তাকাইয়া সারদা কৈফিয়তের সুরে বলিল, তিনি সংসারের সকল ভাবনা ইষ্টদেবের পায়ে সঁপে দিয়েচেন। তাঁর মেয়েও বোধ হয় তার বাইরে নয় মা।

সবিতা পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় রহিলেন।

সারদা সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আকুলি-ব্যাকুলি করেও তো মানুষ নিজে কিছুই পারে না। তার চেয়ে ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকাই তো ভালো মা!

সবিতা আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিলেন, তুমি বুঝবে না। তুমি নিজে সন্তানের মা হওনি যে! সন্তান যে কি, তা পুরুষমানুষ বোঝে না, যে-মেয়েরা মা হয়নি তারাও ঠিক বুঝতে পারে না। রেণুর সম্বন্ধে আজ আমি কি করে তোমার কাকাবাবুর মতো নিশ্চিন্ত থাকবো? চব্বিশ ঘণ্টা ওই গোবিন্দ গোবিন্দ করে দিনপাত করাতেই তো সংসারের সর্ব্বনাশ ঘটেছে, ব্যবসার সর্ব্বনাশ ঘটেছে! কখনও কি চৈতন্য হ'ল না? মেয়েটার মুখ চেয়েও ধর্ম্মের ঝোঁক থেকে এখনও একটু নিবৃত্ত হতে পারলেন না।

সারদা ভীত-চক্ষে সবিতার আরক্তিম মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সবিতা উত্তেজিত অথচ অত্যন্ত মৃদুগলায় বলিতে লাগিলেন, এতকাল ভাবতাম আমার স্বামীর মতো স্বামী বুঝি কখনো কারও হয়নি, হবে না। এখন আমার সে ভুল ভেঙেচে। এখন বুঝেচি আমার স্বামীর মতো আত্মসর্ব্বস্ব মানুষ সংসারে অল্পই। নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তানের প্রতিও যে-মানুষ অচেনার মতো উদাসীন, এমন মানুষের কি প্রয়োজন ছিল বিবাহ করার! বিবাহও করেচেন ওঁর গোবিন্দরই জন্য। বুঝলে সারদা, তোমরা যাকে ওঁর মহত্ত্ব বলে ভাবো, সেটা ঠিক তার উল্টো।

কার মহত্ত্ব উল্টো নতুন-মা? রাখাল ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে হাসি-মুখে প্রশ্ন করিল।

সবিতা ঘাড় ফিরাইয়া শান্ত-গলায় বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাখালের হাস্যপ্রসন্ন মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সবিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমার রাজু তার কাকাবাবুর এতটুকু নিন্দে সইতে পারে না।

রাখাল গম্ভীর-মুখেই বলিল, সেটা তো একটুও আশ্চর্য্য নয় মা। সংসারে কাকাবাবুরও যে নিন্দে হতে পারে, এইটেই কি সবচেয়ে আশ্চর্য্য নয়?

সবিতা বলিলেন, রাজু, আমি তোমার কাকাবাবুর নিন্দে করিনি। কিন্তু আজও যে—

রাখাল হাতজোড় করিয়া বলিল, আর কিছু বলবেন না মা। আমি আগেকার মানুষ, আজকের খবর জানিনে জানতে চাইওনে। যেটুকু আগের খবর জানি সেটুকু পাছে ভেঙে যায় সেই ভয়েই এখন সশঙ্ক হয়ে আছি।

সবিতা ক্ষণকাল রাখালের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, পাগল ছেলে, এককালের জানা কখনও চিরকালের হতে পারে না। জোর করে তা করতে গেলে, হয় চোখ বুজে অন্ধ হয়ে থাকতে হয়, না হয় চরম ক্ষতির দুঃখ ভোগ করতে হয়। সংসারের এই নিয়ম। সবিতার কণ্ঠস্বরে গভীর স্নেহ উৎসারিত হইল।

রাখাল আর কথা কহিল না। সারদা উঠিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তারক এখন বাড়ি আছে কি জানো সারদা?

সারদা বলিল, আজ তো কাছারি নেই। সম্ভবতঃ নীচে তাঁর অফিস-কামরাতেই আছেন।

রাখাল বলিল, তারকের সঙ্গে একটু দরকারী কথা আছে। আমি চললাম, নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, চা খেয়ে যেয়ো রাজু। সারদা, তুমি যে কচুরী তৈরী করেচো, রাজুকে চায়ের সঙ্গে দিতে ভুলো না।

সারদা হাসি-মুখে বলিল, সে তো উনি খেতে চাইবেন না মা, খেলেও নিন্দেই করবেন।

রাখালের মন আজ ভাল ছিল না। অন্য সময় হইলে সারদার এই কথা লইয়াই হয়তো তাহাকে ক্ষেপাইবার জন্য অনেক কিছু বলিত। চিত্ত আজ অপ্রসন্ন বলিয়াই বোধ হয় বিরসকণ্ঠে বলিল, না, ঘরের তৈরি খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস নেই সারদা, ইচ্ছেও নেই। যাঁদের জন্য তৈরী করেচো, তাঁদেরই খাইয়ো।

সারদা বিস্মিত-নয়নে রাখালের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ামাত্র রাখালের মনের মধ্যে বেদনা ধ্বক্ করিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথা না কহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা সারদার পানে তাকাইয়া সস্নেহ সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, ওর কথায় মনে দুঃখ পেয়ো না সারদা। আমার 'পরে রাগ করেই ও তোমাকে কঠিন কথা শুনিয়ে গেল। নানা কারণে রাজুর মনের অবস্থা এখন ভালো নেই মা।

অকারণে আকস্মিক ভর্ৎসিত হইয়া সারদা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সবিতার সান্ত্বনাবাক্যে রুদ্ধ বেদনা সংযম মানিল না। হঠাৎ ঝর্ ঝর্ করিয়া দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অশ্রুপ্লাবিত সারদা আকুল স্বরে বলিল, আমি কি দোষ করেচি মা, দেব্‌তা যখনই যার উপরে রাগ করেন, আমাকেই বিঁধে কঠিন কথা শুনিয়ে চলে যান।

সারদাকে কাছে টানিয়া সবিতা বলিলেন, ও যে তোমাকে আপন জন বলেই মনে করে মা। তোমাকে সত্যিকারের স্নেহ করে বলেই না তোমার 'পরেই ওর যত আঘাত। ওর যে আপন বলতে সংসারে কেউ নেই সারদা।

সারদার উদ্বেলিত অশ্রুধারা তখনও সংযত হয় নাই। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অভিমানের সুরে বলিল, আমারই যেন সংসারে সব-কেউ আছে মা। আমি তো কই যখন তখন কাউকে এমন করে কথার খোঁচায় বিঁধিনে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, সকলের প্রকৃতি তো সমান হয় না মা।

সারদা বলিল, উনি জানেন, আমি সব-কিছু সইতে পারি, কিন্তু ওঁর ঐ একটা বিদ্রূপ কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে! এ জেনে-শুনে তবুও উনি আমাকে অমন করে বলেন।

সারদা চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

রাখাল তারকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখের চেয়ারে উপবিষ্ট তারক মোকদ্দমার কাগজ-পত্র দেখিতে অভিনিবিষ্ট। রাখালের জুতোর আওয়াজে অল্প মাথা তুলিয়া তাকাইতে গিয়া চকিত হইয়া বিস্মিত-কণ্ঠে বলিল, এ কি! রাখাল যে!

টেবিলের কাছাকাছি একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে রাখাল বলিল, কেন, আসতে নেই নাকি?

থাকবে না কেন, আসো না বলেই তো আসায় আশ্চর্য্য হচ্চি।

আসি তো প্রায়ই।

তা জানি; কিন্তু সে তো আমার কাছে নয়, অন্দর মহলে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, অন্দরেই ডাক পড়ে, তাই সেখানে আসি।

তারক রহস্যতরল-কণ্ঠে কহিল, আজ কি সদর থেকে ডাক পেয়েচো না-কি?

না, আজ সদরকে আমারই প্রয়োজন।

নিশ্চয় কোনও মামলার ব্যাপার নয় আশা করি।

মামলাই বটে। দুনিয়ার কোন ব্যাপারটা মামলার অন্তর্গত নয় বলতে পারো?

তারক হাসিতে লাগিল।

রাখাল বলিল, শুনলাম, বেশ ভালো-রকম প্র্যাক্‌টিস্ হচ্ছে তোমার!

মৃদু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তারক বলিল, তোমাকে কে বললে?

যেই বলুক, কথাটা তো সত্যিই। এবার ইতর জনদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা করো একদিন।

তারক বলিল, পাগল হয়েচো তুমি। কোথায় প্র্যাক্‌টিস্? এখন তো শুধু সিনিয়রের দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকা, আর তাঁর যত-কিছু খাটুনির বোঝা গাধার মত বওয়া।

রাখাল বলিল, তাই নাকি? তা হলে বিমলবাবু ভুল বলেচেন বোধ হয়?

তারক চকিত হইয়া বলিল, বিমলবাবু তোমাকে এ-কথা বলেচেন নাকি?

হ্যাঁ।

তাঁর সঙ্গে কবে দেখা হ'লো? কি বলেচেন বল তো? তারকের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে অনেক কথা। তুমি এখন ব্যস্ত রয়েচো। শোনবার সময় হবে কি ?

হবে—হবে। তুমি বলো।

তারকের চোখে-মুখে ব্যগ্র কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া রাখাল মনে মনে হাসিলেও মুখে নির্বিকার ভাব বজায় রাখিয়া বলিল, চলো সামনের পার্কে বসে কথা কই গে।

তারক বলিল, বেশ, তাই চলো।

ত্রীকের তাড়া ক্ষিপ্র-হস্তে গুছাইয়া ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে তারক বলিল, বোসো, বাড়ির ভিতর গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। চা খেয়ে একেবারে বেরুনো যাবে।

রাখাল বলিল, আমি যে এইমাত্র বাড়ির ভিতরে বলে এসেচি, চা খাবো না।

তারক সংক্ষেপে বলিল, তা হোক। চায়ের ব্যাপারে 'না' কে 'হ্যাঁ' করলে দোষ নেই।

তারক দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, রাখাল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

গায়ে মুগার পাঞ্জাবি, পায়ে গ্রিসিয়ান্ স্লিপার চড়াইয়া তারক ফিরিয়া আসিল। তার পিছু পিছু ঝি ট্রেতে করিয়া চা এবং দুই প্লেট কচুরী লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রাখাল বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের পেয়ালা ও কচুরীর প্লেট লইয়া সদ্ব্যবহার শুরু করিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্লেট শূন্য করিয়া বলিল, তারক, তোমাদের চা-দায়িনীকে একবার স্মরণ করতে পারো ?

তারক চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাঁকিল, শিবুর মা—এদিকে শুনে যাও।

ঝি আসিলে রাখাল বলিল, বাড়ির ভিতরে গিয়ে বলো, রাজুবাবু আরও খানকয়েক কচুরী খেতে চাইলেন।

ঝি চলিয়া গেল। তারক খাইতে খাইতে হাসিয়া বলিল, রাজুবাবু খান-কয়েক কচুরী খেতে চাইচেন শুনলে এক-ঝুড়ি কচুরী এসে পড়বে কিন্তু বাড়ির ভিতর থেকে।

রাখাল দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল, আর তারকবাবু খেতে চেয়েচেন শুনলে একগাড়ি কচুরী আসবে বোধ হয় ?

কচুরীর 'ক'ও আসবে না। শুধু সংবাদ আসবে ফুরিয়ে গেছে। বাজার থেকে গরম কচুরী এখুনি কিনে আনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

রাখাল হাসিল, ভ্রূকুটি করিল। বলিল, তাই নাকি ?

তারক বলিল, একটুও বাড়িয়ে বলিনি।

আধঘোমটা টানা প্রৌঢ়া দাসী শিবুর মা অহেতুক অতি-সঙ্কোচে জড় সড় হইয়া

এক প্লেট গরম কচুরী আনিয়া রাখালের সামনে ধরিয়া দিল। তারক হাসিয়া বলিল, দেখলে তো? একেবারে ভজন হিসেবে এসে গেছে।

রাখাল মৃদু হাসিয়া শিবুর মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমি তো রাক্ষস নই বাছা! এতগুলো কচুরী এনেচো কেন? তা এনেচো যখন, খাচ্ছি সবগুলিই। কিন্তু কচুরী তুমি বাপু ভালো তৈরী করতে পারোনি, বুঝলে? যা ঝাল দিয়েচো—পেটের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করচে। একটু ঝালটা কম দিলেই ভালো করতে।

শিবুর মা অবগুণ্ঠনটি আরও খানিক টানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, কচুরী তো আমি তৈরী করিনি। দিদিমণি করেচেন।

ও! তাই কচুরীতে এত ঝাল।

তারককে লইয়া রাখাল যখন পার্কে গিয়া বসিল, অপরাহ্ণ হইয়াছে।

তারক বলিল, বহুদিন বাদে তোমার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে আসা হলো আজ।

প্রত্যুত্তরে রাখাল একটু শুষ্ক হাসিল। তারক তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলেও বাহিরে সহজভাব বজায় রাখিয়া বলিল, হ্যাঁ, কি বলবে বলছিলে? বিমলবাবুর কাছে তুমি কি শুনেচো আমার সম্বন্ধে?

রাখাল বলিল, শুনেচি তুমি খুব ভালো কাজকর্ম্ম করচো। তোমার ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল। তোমার মত উদ্যোগী ও পরিশ্রমী যুবার জীবনে উন্নতি অনিবার্য্য।

রাখালের কণ্ঠে বিদ্রূপের সুর না থাকিলেও তাহার বলিবার ভঙ্গিতে তারক উহাকে উপহাস বলিয়াই মনে করিল। ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া গেলেও বাহিরে শান্তভাবেই বলিল, তোমাকে ডেকে বিমলবাবুর হঠাৎ এ-সব কথা বলার মানে কি?

তা কি করে জানবো!

তারক গম্ভীর হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর কিছু বলবার আছে কি?

রাখাল বলিল, আছে।

সেটা বলে ফেলো। বিকাল-বেলায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পার্কে হাওয়া খাওয়ার উপযুক্ত বড়মানুষ আমি নই। দেখেইচ তো তুমি, কাজ ফেলে রেখে উঠে এসেচি।

তারকের উষ্মায় রাখাল হাসিল। বলিল, ওকালতি পেশা যাদের, তাদের অতো অধৈর্য্য হতে নেই হে। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে আনলাম তারক!

তারক নির্ব্বাক রহিল।

রাখাল গম্ভীর-মুখে বলিল, তোমার বিয়ের প্রস্তাব এনেচি।

রাখালের মুখের পানে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া তারক বলিল, পরিহাস করচো?

পরিহাস করবার জন্য তোমার কাজের ক্ষতি করে এখানে ডেকে আনিনি। সত্যিই আমি তোমার বিবাহের প্রসঙ্গ তুলতে এসেচি।

তা হলে ওটা আর না তুলে এইখানেই সাঙ্গ করে ফেলা ভালো। কারণ বিবাহ করার মত সঙ্গতি ও সুমতি কোনটাই আমার হয়নি, দেরি আছে।

রাখাল বলিল, ধরো এ বিবাহে যদি তোমার সঙ্গতির অভাব পূর্ণ হয়ে যায়?

তা হলেও নয়। কারণ, আমি নিজে উপার্জ্জনশীল না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহের দায়িত্ব নিতে নারাজ।

ধরো, এ-বিবাহ দ্বারা যদি তোমার উপার্জ্জনের দিক দিয়েও সত্বর উন্নতি ঘটে?

তা হলে তো আপত্তি নেই।

তারক সন্দিগ্ধ-নয়নে রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, পাত্রী কে? কোন উকীল-ব্যারিস্টারের মেয়ে বুঝি?

না। নিতান্ত সঙ্গতিহীন নিরাশ্রয়ের কন্যা।

তবে যে বললে—এ বিবাহে—

হ্যাঁ, ঠিকই বলেচি। দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করেও সম্পত্তিলাভ একেবারে বিচিত্র নয়। ধরো, তার কোনও ধনী আত্মীয়ের যাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে—

কে সে মেয়েটি?

তুমি রাজী কি না আগে বলো।

পরিচয় না জেনে বলতে পারবো না।

কি পরিচয় চাও জিজ্ঞেসা করো। মেয়ের বংশ পরিচয়, রূপ, গুণ, শিক্ষা?

তারক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভাবী পত্নী সম্বন্ধে সবই জানা দরকার।

রাখাল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, পাত্রী সুন্দরী বললে অল্প বলা হবে, পরমাসুন্দরী। গুণবতী, বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেচে। পিতা এককালে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, বর্ত্তমানে কপর্দ্দকশূন্য। পিতৃ-সম্পত্তি না পেলেও পাত্রী মাতৃধনের অধিকারিণী। সে ধনের পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নয়। কুলে মেলে গোত্রে তোমাদের পাল্‌টি ঘর। সকল দিক দিয়ে যে কোনও সুপাত্রের যোগ্য পাত্রী।

পাত্রীর পিতার নাম, ধাম ও উপস্থিত পেশা কি জানতে পারি?

তারই উপরে কি তোমার মতামত নির্ভর করচে?

না—হ্যাঁ, তা সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা নির্ভর করে বৈকি!

রাখাল আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে আস্তে আস্তে বলিল, পাত্রীর পিতা তোমার অচেনা নয়। আমি ব্রজবিহারীবাবুর মেয়ের কথা বলচি—

তারক চমকাইয়া উঠিল, সে কি? তুমি কোন মেয়েটির কথা বলচো?

রেণুর।

তুমি কি উন্মাদ হয়েছো রাখাল? তারকের কণ্ঠে তীব্র বিস্ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

রাখাল তারকের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, উন্মাদ হলে তো ভালো হ'তো; কিন্তু হতে পারচি কই?

উত্তেজিত কণ্ঠে তারক বলিল, হতে আর বাকিই বা কি? নইলে, নতুন-মার মেয়ে রেণুর সঙ্গে কখনো আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারো?

রাখাল বলিল, তা, এতে তোমার এত বিস্মিত বা উত্তেজিত হওয়ার কি আছে?

যথেষ্ট আছে। এ নিশ্চয় তোমার ষড়যন্ত্র! তুমি নতুন-মাকেও বোধ হয় এই পরামর্শ দিয়েছো?

রাখাল নির্লিপ্তভাবেই বলিল, না। আমার পরামর্শের অপেক্ষা রাখেননি। ওঁরা বহুপূর্ব্ব থেকে রেণুর জন্য তোমাকে পাত্র নির্ব্বাচন করে রেখেছেন। আমি জানতাম না এ-খবর।

তারক দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হতেই পারে না—মিথ্যে কথা।

রাখাল স্থির-কণ্ঠে বলিল, দেখ তারক, তুমি বেশ জানো, আমি মিথ্যে কথা বলিনে।

তারকের চড়া গলা এবার নিম্নগ্রামে নামিয়া আসিল, বলিল, তুমি কেন রেণুকে বিবাহ করো না।

রাখাল উত্তর দিল, আমি যোগ্য পাত্র নই। রেণুর অভিভাবকেরা এ-কথা জানেন।

তারক সবিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিল, আর হতভাগ্য আমিই বুঝি হলাম সব-রকমে তাঁদের কন্যার সুযোগ্য পাত্র?

তুমি পাশ করা বিদ্বান ছেলে— বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান।

হ্যাঁ, অনেকগুলি বাণ ছুঁড়ে মারলে, কিন্তু এটা কি বিবেচনায় এলো না, যে, ঐ মেয়েকে আমি আমার পিতৃবংশের কুলবধূরূপে গ্রহণ করতে পারিনে! গরীব হতে পারি, কিন্তু মর্য্যাদাহীন এখনও হইনি।

রাখাল ক্রোধস্তম্ভিত কণ্ঠে হাঁকিল, তারক—

সত্য বলতে ভয় করো কিসের জন্য? তুমি নিজে ঐ মেয়েকে বিয়ে করে আনতে পারো—

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারকের পানে তাকাইয়া রাখাল বলিল, সেই মেয়েরই মায়ের আশ্রয়ে থেকে, তাঁরই সাহায্য নিয়ে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বুঝি তোমার বংশমর্য্যাদা ও কৌলীন্যের গৌরব উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে? তারক নিজের মনুষ্যত্বকে দলিত করে যদি উন্নতির রাস্তা তৈরী করো, তোমাকে অবনতির অতলেই ঠেলে নিয়ে যাবে জেনো।

তারক ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিল। বলিল, শাট্ আপ্। মুখ সামলে কথা কও রাখাল! তুমি জানো কি এদের প্রত্যেকটি পয়সা আমি হিসেব করে শোধ করে দেবো? এই সর্ত্তেই আমি কর্জ্জরূপে এ সাহায্য গ্রহণ করেছি ওদের কাছে।

রাখাল হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও, তাই নাকি? তবে আর কি? কর্জ্জ শোধ যখন করে দেবে, ওদের সঙ্গে তোমার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক আর কি থাকতে পারে! কি বল? না হয় কিছু সুদ ধরে দিলেই হবে!

তারক রুক্ষ-গলায় বলিল, দেখো রাখাল, এ-সব বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করো না। নিজে যা পারো না, অন্যকে তা করবার জন্য বলতে তোমার লজ্জা করে না?

সে-কথার জবাব না দিয়া রাখাল বলিল, তোমার সম্বন্ধে তা হলে দেখছি ভুল করিনি। আমি জানতাম তুমি এই রকম কিছু বলবে। তবু যখন শুনলাম, নতুন-মা নাকি তোমাকে এ-সম্বন্ধে আগেই একটু জানিয়ে রেখেচেন, তখন আশা করেছিলাম হয়তো বা তোমার অমত না-ও হতে পারে!

তারক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নতুন-মা কোনদিন এমন কথা আমাকে বলেননি, বলতে সাহসও করবেন না জেনো। তিনি জানেন, তারক রাখাল নয়। এ প্রস্তাব রাখালের কাছে করতে পারেন, কিন্তু তারকের কাছে নয়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তারক দ্রুতপদে হন্ হন্ করিয়া পার্ক হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৎসর ঘুরিয়া নূতন বৎসর আসিয়াছিল ; তাহাও আবার শেষ হইতে চলিল। সংসারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে অনেক।

বিমলবাবু শেষবার সিঙ্গাপুরে গিয়া প্রায় দেড় বৎসর আর কলকাতায় ফিরেন নাই। এই বছর দুইয়ের মধ্যে রাখালকে প্রায় বার-সাতেক ছুটিতে হইয়াছে বৃন্দাবনে। ইহাতে তাহার নিজের কাজ-কর্ম্মের ক্ষতি হইয়াছে যথেষ্ট। দিনের দিন সে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছে, অথচ উপায় কিছু নাই।

রেণুদের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্ম সবিতা নানা উপায়ে বহু চেষ্টাই করিয়াছিলেন, সক্ষম হন নাই। প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা মূল্যের যে সম্পত্তি মাত্র একষট্টি হাজার টাকায় রমণীবাবুর সাহায্যে তিনি নিজের নামে খরিদ করিয়াছেন তাহা রেণুর উদ্দেশ্যে। ঐ সম্পত্তি খরিদকালে নয় হাজার টাকা রমণীবাবুর নিকট হইতে সবিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সর্ত্তে যে, সম্পত্তিরই আয় হইতে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হইবে। উচ্চ হারের সুদ সমেত নয় হাজার টাকা রমণীবাবুকে সম্পত্তির আয় হইতে একযোগে পরিশোধ করাও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহার জন্ম এত আয়োজন, সে-ই যখন সম্পত্তি স্পর্শ করিল না এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন যে স্পর্শ করিবে এরূপ আশাও রহিল না, তখন সবিতা একেবারেই ভাঙিয়া পড়িলেন। তিনি নিজের সমস্ত অলঙ্কার, ব্রজবাবুর শিলমোহর-করা সেই গহনার বাক্স সমেত ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছেন রেণুরই নামে ; কিন্তু আকাশ-কুসুম রচনার ন্যায় সমস্তই যে তাঁহার বৃথা হইতে চলিয়াছে।

মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষিত, চরিত্রবান, স্বাস্থ্যসবল যুবকের হস্তে কন্যা অর্পণের ব্যবস্থা করিয়া, আপনার সমস্ত অর্থ-সম্পদ যৌতুক দান করিবেন। সে তো রেণুরই পিতৃধন। তাহারই পিতৃ-প্রদত্ত ও মাতামহ-প্রদত্ত যে বহুমূল্য অলঙ্কাররাশি দীর্ঘকাল ধরিয়া বাক্সেই আবদ্ধ রহিল, কোনদিন সবিতার অঙ্গে উঠিল না—এতদিন আশা ছিল, তাহা বুঝি সার্থক হইবে নবোঢ়া রেণুকে অলঙ্কৃত করিয়া। বড় আকাঙ্খা ছিল, তাঁহার প্রাণাধিক রেণু পরিপূর্ণ দাম্পত্য সৌভাগ্যে সুখী হইয়া সচ্ছলতার মধ্যে পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করিবে। দূর হইতে দেখিয়া তাঁহার অভিশপ্ত মাতৃজীবন চরিতার্থ হইবে। কিন্তু ভাগ্য যার মন্দ, সকল ব্যবস্থাই বুঝি এমন করিয়া তার ব্যর্থ হয়।

এতদিনে সবিতা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছেন, স্বামী ও কন্যার জীবনে তাঁহার তিলমাত্রও স্থান নাই—না অন্তরে, না বাহিরে।

আজ যৌবনের অস্তাচলে, দেহকামনা-বিরহিত প্রেম আপনি আসিয়া উপনীত হইয়াছে দুয়ারে। সবিতা জানে ইহার মূল্য, জানে ইহা কত দুর্লভ। ইহাকে উপযুক্ত সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি বুঝি আর নাই। আজ তাহার সমস্ত হৃদয়-মন মাতৃত্বের মমতা-রসে সিক্ত হইয়া সন্তানের আনন্দ-তৃষ্ণায় তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কোথায় সে স্নেহপাত্র ?

অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও বিক্ষোভে সবিতার স্বাস্থ্যে ইদানিং ভাঙন ধরিয়াছিল। তাহার উপরে দেহের প্রতি ঔদাসীন্য ও অযত্নের অন্ত নাই।

সারদা প্রায়ই অনুযোগ করিত। কিন্তু তাহার নিজের হাতে প্রতিকারের উপায় নাই। তারক কিছু বলে না। তাহার প্র্যাক্‌টিস উত্তরোত্তর জমিয়া উঠিতেছে, আপনার উন্নতির একান্ত চেষ্টা লইয়াই সে অহোরাত্র নিমগ্ন।

সেদিন বিকেলবেলায় সবিতা ভাড়ার-ঘরে কুট্‌না কুটিতে বসিয়া একখানি ডাকের চিঠি খুলিয়া নীরবে পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময় ও বেদনাবিমিশ্র সকরুণ হাসির রেখা। বিমলবাবু সিঙ্গাপুর হইতে লিখিয়াছেন—

"সবিতা, সারদা-মায়ের সংক্ষিপ্ত পত্রে জানিলাম তোমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়াছে। অথচ এ-সম্বন্ধে তুমি নাকি সম্পূর্ণ উদাসীন। সারদা-মা জানাইয়াছেন সময় থাকিতে সাবধান না হইলে সত্বর কঠিন ব্যাধিতে তোমার শয্যাশায়িনী হওয়ার সম্ভাবনা।

তুমি তো জানো, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া অকর্ম্মণ্য জীবন বহন করার দুঃখ মৃত্যুর অধিক। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এভাবে চলিলে তুমি হয় তো সেই অতি দুঃখময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইবে।

কাহারও ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করা আমার প্রকৃতি নয়। তোমার ইচ্ছার উপর তাই আমি নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই। হিতার্থী বন্ধু হিসাবে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—অতিরিক্ত মানসিক সংঘাতে তুমি এতদূর বিচলিত হইয়াছ যে, জীবিত মনুষ্যের পক্ষে স্বাস্থ্য যে কত বেশি প্রয়োজনীয়, তাহাও বিস্মৃত হইয়াছ। অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনায় আত্মসংবিৎ হারাইয়া দেহের উপর অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। এ ভুলও ভবিষ্যতে একদিন মানুষ আপনি বুঝিতে পারে; কিন্তু তখন হয়তো এত বিলম্ব হইয়া যায় যে, প্রতিকারের উপায় থাকে না। তাই আমার অনুরোধ, শরীরের অযত্ন করিও না।"

সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন—"তারকের বিবাহের কথা সম্ভবতঃ সে তোমাকে জানাইয়া থাকিবে। এ বিবাহে তোমার মতামত কি জানিতে ইচ্ছা করি। আমার সম্মতি এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সে পত্র লিখিয়াছে। পাত্রীটি তারকের সিনিয়র উকিল

শিবশঙ্করবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। এই বিবাহ তাহার প্র্যাক্‌টিসের উন্নতির অনুকূল হইবে সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।

সবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া কুটনা কুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অন্তর অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈকালে সারদা মহিলা শিক্ষা-মণ্ডলীর স্কুল হইতে বাটি ফিরিলে সবিতা বলিলেন, একটা সুখবর শুনেচো সারদা?

আগ্রহে উন্মুখ হইয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল, কি সুখবর মা?

আমাদের তারকের বিয়ে।

উৎসুক হইয়া সারদা কহিল, কবে মা? কোথায়? কনেটি কেমন দেখতে?

তা ত কিছু জানিনে মা। শুনলাম হাইকোর্টের মস্ত উকীল শিবশঙ্করবাবু—যাঁর জুনিয়ার হয়ে তারক কাজ শিখচে, পাত্রী তাঁরই ভাইঝি।

সে কি? আপনি এর কিছুই জানেন না? তবে জানে কে মা? সারদার কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, সময় হলেই সকলে জানতে পারে সারদা। আমি সিঙ্গাপুর থেকে খবর পেলাম তারকের বিয়ে।

সারদা মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, উঃ কি অদ্ভুত মানুষ এই তারকবাবু!

সবিতা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, ও আমার একটু লাজুক ছেলে। তুমি দোষ নিয়ো না সারদা। বরং উদ্যোগে লাগো এখন থেকে।

সারদা নিরুত্তরে মুখ হাঁড়ি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বছর দেড়েক হইল সারদাকে একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুলে সবিতা ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে সে লেখাপড়া, নানাবিধ অর্থকরী গৃহশিল্প, পশুপালন ও শুশ্রূষা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কাজ শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক একটি বিষয় শিখিবার নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর বা কয়েক মাস করিয়া সময় আছে, বর্ত্তমানে লেখাপড়া ও দর্জ্জিকর্ম্ম বিভাগে সারদার দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। বেলা নয়টার সময় স্কুলের গাড়ী আসে, ফেরে বেলা পাঁচটায়। অপরাহ্ণে সবিতা তাহার খাবার লইয়া বসিয়া থাকেন। সারদা ফিরিলে দ্রুত তাড়া দিয়া তাহাকে কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধোয়াইয়া, নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করিয়া তবে তাঁহার স্বস্তি। তারকের সম্বন্ধেও তাহাই। কোর্ট হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে তাহার বিশ্রামের ও জলযোগের ব্যবস্থা নিজ-হাতে করিতে না পারিলে সবিতা তৃপ্তি পান না।

তারক প্রতিবাদ করে, অনুযোগ করে, কিন্তু সবিতা কর্ণপাত করেন না। সারদা

বলে, মা, আপনার সেবার ভার নিতে আপনার কাছে এলাম, কিন্তু আপনিই যে শেষে আমার সেবা হাতে তুলে নিলেন। আমি সত্যই এ সইতে পারিনে। আপনার ঘাড়ে পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে স্কুলে যেতে আমার বাধে।

সবিতা হাসিয়া বলেন, মা, এই কাজেই আমার বেশি তৃপ্তি। স্কুল তোমার কোনমতেই ছাড়া হবে না, আমি বেঁচে থাকতে। জীবনে তোমার অবলম্বন তো চাই। শিক্ষা না পেলে আত্মনির্ভরতার শক্তি পাবে কোথা থেকে? একদিন হয়তো তোমাকে একলা বেঁচে থাকতে হবে এই পৃথিবীতে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না শিখলে দুঃখের অবধি থাকে না মেয়েদের, এ তো তোমার অজানা নেই সারদা!

সেদিন রাত্রে তারক খাইতে বসিলে, সবিতা নিত্যকার মতো খাওয়ার তদারক করিতে সামনে বসিয়া ছিলেন, সবিতা একসময় বলিলেন, তুমি নাকি বিয়ে করচো বাবা?

তারক চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কার কাছে শুনলেন?

সবিতা শান্ত হাসিয়া বলিলেন, সিঙ্গাপুরের চিঠি এসেচে আজ।

সারদা মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতেছিল। কহিল, আমাদের বাড়ির বিয়ের খবর আমাদেরই কাছে পৌছায় তারকবাবু, সমুদ্র পারের ডাক মারফত।

সারদার বিদ্রূপে হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলেও তারক তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না। সবিতার পানে তাকাইয়া কৈফিয়তের সুরে কহিল, আমার সিনিয়র উকিল শিবশঙ্করবাবু পীড়াপীড়ি করে ধরেচেন তাঁর ভাইঝিকে বিয়ে করার জন্যে। আমি এখনও মতামত জানাইনি। এ বিয়ে হবে কি না তার কিছুই ঠিক নেই। কাউকেই এখনও বলিনি। কেবলমাত্র বিমলবাবুকে লিখেছিলাম, পরামর্শ চেয়ে।

সবিতা বলিলেন, সম্বন্ধ তো তোমার পক্ষে ভালো বলেই মনে হচ্চে বাবা! তুমি আত্মীয়-বন্ধুহীন, এ রকম মুরুব্বি শ্বশুর পাওয়া ভাগ্যের কথা। পাত্রী যদি তোমার অপছন্দ না হয়, শুভকর্মে দেরী না করাই ভালো।

তারক সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, কিন্তু এ বিয়েতে নানা বাধা আছে মা। আমি মনে করেচি, শিববাবুকে জবাব দেবো, এ বিয়ে সম্ভব হবে না।

সবিতা বলিলেন, বাধা কিসের?—আমাকে জানাতে তোমার সঙ্কোচ আছে বাবা?

তারক ব্যস্ত হইয়া কহিল, না না, আপনার কাছে বলতে আবার বাধা কি? আপনি আমার মা। আমি জানাবো-জানাবো ভাবছিলাম, আজই আপনাকে নিজেই এ সকল কথা বলতাম।

সারদার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, মা, আমি তা হলে এখন উপরে চললাম।

সারদা চলিয়া গেল।

তারক কণ্ঠস্বর নীচু করিয়া বলিল, আমার সঙ্গে শিবশঙ্করবাবু তাঁর ভাইঝির বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হয়েচেন। কিন্তু তাঁর কয়েকটি সর্ত্ত আছে। সেই সর্ত্তে আমি এখনও সম্মতি দিতে পারিনি। যদিও শিবশঙ্করবাবুর সাহায্যে আমি এই অল্পদিনের মধ্যেই 'বারে' এতটা নাম করতে পেরেচি এবং তিনি সহায় থাকলে আমি যে খুব শীঘ্রই উন্নতির মুখে এগিয়ে যেতে পারবো এও ঠিক, কিন্তু—

তার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করিল।

সবিতা তারকের পানে জিজ্ঞাসু-নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারক আস্তে আস্তে বলিল, শিববাবুর প্রধান ও প্রথম সর্ত্ত বিবাহের কিছুদিন, অন্ততঃ বছরখানেক আমাকে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে হবে।

কেন?

তাঁর ভাইঝিটি পিতৃহীনা। শিববাবুর নিজের মেয়ে নেই, কাজেই—

বুঝেচি, ভাইঝিকে নিজের মেয়ের মতন মানুষ করেচেন। কাছ-ছাড়া করতে চান না বোধ হয়—

হ্যাঁ, নিজের মেয়ের অধিক ভালবাসেন তাকে তাই বলেছিলেন—তুমি আমার বাড়িতে এসে থাকো, তোমার কাজকর্ম্মের অনেক সুবিধা হবে। পরে তোমার পৃথক সংসার পেতে দেওয়ার দায়িত্ব আমার রইলো।

সবিতা বলিল, এতে তোমার অসুবিধা কি আছে?

তারক আমতা আমতা করিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, অসুবিধা ঠিক আমার নিজের নেই বটে, বরং সর্ব্বদা তাঁর কাছ থেকে কাজকর্ম্ম শেখা ও পৃথক কেস্ পাওয়ার দিক দিয়ে সুবিধাই হবে বলে মনে হয়; কিন্তু আমি যাই কি করে মা? ধরুন, আপনার দেখাশোনা—

সবিতা হাসিয়া বলিল, ওঃ, এইজন্ত? আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু ভেবো না তারক। আমি তো আজই সকালে ভাবছিলাম—কিছুদিন বাইরে কোথায় গেলে হয়। জীবনে এ-পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ ঘটেনি। ভাবছি এবার তীর্থে বেরুবো।

একলা যাবেন?

আমি যদি যাই, সারদাকেও সঙ্গে নেবো, কিংবা ওদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বোর্ডিং-এ ওকে রেখে যাবো!

তারক অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, ফিরবেন কতদিনে?

সবিতা ম্লান হাসিয়া বলিলেন, হয়তো কলকাতায় আর নাও ফিরতে পারি। যদি ও অঞ্চলে কোনও দেশ ভালো লাগে, সেইখানে একখানি ছোটখাটো বাড়ি কিনে বাস করবো ভেবেচি।

তারক চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, ওদের পাকা কথা দিয়ে দিয়ো।

তারকের খাওয়া শেষ হইয়াছিল। আসন হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল, ভেবে দেখি।

সেদিন রাত্রে সবিতা শয়ন করিলে সারদা যখন তাঁহার মশারীর ধারগুলি বিছানার তলায় গুঁজিয়া দিতেছিল, সবিতা বলিলেন, সারদা, তোমার স্কুলের পরীক্ষা কবে?

সারদা বলিল, আড়াই মাস পরে।

সবিতা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি কিছুদিন তীর্থভ্রমণে বেরুবো মনে করচি—তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

সারদা উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ মা—যাবো। একমাত্র কাশী ছাড়া আমি জীবনে আর কোনও তীর্থে যাইনি। গয়ায় একবার গিয়েছিলাম বটে, সে খুব ছোট্টবেলায়, এগারো-বারো বছর বয়সে। স্বামীর পিণ্ডদান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সারদা বলিল, কবে আমাদের যাওয়া হবে মা?

তারকের বিয়েটা চুকে যাক। তার পরে কলকাতার বাসা একেবারে তুলে দিয়ে চলে যাবো ভাবচি।

সারদা বলিয়া উঠিল, আমাকে সঙ্গে রাখবেন তো?

না মা, তোমাকে কলকাতায় আবার ফিরতে হবে।

কেন মা? সারদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তুমি যে প্রয়োজনে শিক্ষা নিচ্চো সে যে শেষ হয়নি মা! ফিরে এসে বোর্ডিং-এ থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তার পরে আমার কাছে গিয়ে থাকবে।

সারদা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ম্লানকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, আমার তীর্থভ্রমণে গিয়ে কাজ নেই মা।

সবিতা বলিলেন, কেন? দেশ-দেশান্তরে ঘুরে এলে অনেক-কিছুই জানতে পারবে, শিখতে পারবে।

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, যাবো না। তারা যদি আমায় দেখে ফেলে?

সবিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি! সে আবার কারা?

সারদা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, আমার বাপের বাড়ির লোকেরা।

সবিতা বুঝিলেন সমস্তই। প্রশ্ন করিলেন না কিছু। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তা নাই গেলে তীর্থে। এখানে থেকেই পড়াশুনা ক'রো।

কপট ব্যাকুলতায় সারদা বলিয়া উঠিল, আপনার কাছ ছাড়া হতে আমার একটুও ভরসা হয় না মা। বোর্ডিং-এ একলা থাকতে ভয় করবে না তো?

ভয় কিসের? সেখানে তোমার মতো ক—ত মেয়ে রয়েচে—আমার রাজু কলকাতায় রইলো, তারকও থাকলো, ওদের বলে যাবো তোমার খোঁজ-খবর নেবে। যখন যা দরকার হবে ওদের জানাতে পারবে।

প্রায়ান্ধকার গৃহে সবিতার শয্যাপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সারদা নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অস্ফুট-স্বরে ডাকিল, মা—

বলো সারদা, আমি জেগেই আছি, বিছানার ভিতর হইতে সবিতা জবাব দিলেন।

আমার নিজের কথা সমস্ত আজ বলতে ইচ্ছে আপনার কাছে।

আজ অনেক রাত হয়ে গেছে মা। তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে।

যাই—আমি বিধবা হয়েছিলাম মা এগারো বৎসর বয়সে। শ্বশুরবাড়ি আর যাই নি। ছোটবেলাতেই মা মারা গিয়েছিলেন। বাপ আবার বিয়ে করে—

সবিতা বাধা দিয়া বলিলেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না সারদা, আমি সমস্তই শুনেচি।

পরদিন সবিতা বিমলবাবুকে পত্র লিখিতেছিলেন—"বহুদূরে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্ম আমার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। অনেক চিন্তা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তীর্থভ্রমণে বাহির হইব স্থির করিয়াছি। এখানে ফিরিবার আর রুচি নাই। অনির্দ্দিষ্ট ঘুরিতে ঘুরিতে যে দেশ ভালো লাগিবে, সেইখানেই বাস করিব মনে করিতেছি। কলকাতার বাসা আর রাখিবার প্রয়োজন নাই। তারকের ভাবী শ্বশুর তারককে নিজের বাটীতে রাখিতে চাহেন। তাহার আইন ব্যবসায়ের সকলরকম সাহায্য এবং ভবিষ্যতে সংসার পাতিয়া দিবার দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত। আমি তারককে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পরামর্শ দিতেছি।

সারদার শিক্ষা যতদিন না সমাপ্ত হয়, সে উহাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বোর্ডিং

হাউসেই থাকিবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, সে যদি ইচ্ছা করে, আমার নিকটে গিয়া বাস করিতে পারে।

ব্যবস্থা কিছুই করিতে পারিলাম না আমার রাজুর। জানিতে পারিয়াছি, সে কিছুদিন হইতে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আমার কিংবা অন্য কাহারও সাহায্য-গ্রহণে সে একেবারেই প্রস্তুত নয়। তাহাকে অনুরোধ করিতেও ভরসা পাই না। প্রত্যাখ্যানের দুঃখ আর সর্ব্বত্র বাড়াইয়া লাভ নেই। রাজুকে যে সঙ্গে লইয়া যাইব তাহারও উপায় নাই, কারণ তাহাকে প্রায়ই বৃন্দাবনে যাইতে হয়। কখন যে বৃন্দাবন হইতে ডাক আসিবে কিছুই ঠিক নাই।

তারকের পক্ষে এ সময় কোর্ট কামাই করা যে অসম্ভব, তুমি জানো। সুতরাং পুরাতন দরওয়ান মহাদেব ও শিবুর মা ঝিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। কিছুদিন তো ঘুরিয়া বেড়াই, তাহার পর যেখানে হোক স্থির হইয়া বসিব।"

কি যেন একটা উপলক্ষে সারদাদের স্কুল সেদিন মধ্যাহ্নেই বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সারদা বাড়ি ফিরিয়া আসিল বেলা একটায়। সবিতা তখন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। তারক কোর্টে। সারদা একা বাড়িতে বসিয়া ইতিহাসের পড়া তৈয়ারী করিতে লাগিল।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজের সঙ্গে ডাক শোনা গেল—নতুন-মা—

বই মুড়িয়া দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া সারদা দুয়ার খুলিয়া দিল।

রাখাল বলিল, এ কি? তোমার স্কুল নেই আজ?

সারদা জবাব দিল, ছিল। ছুটি হয়ে গেছে।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্য ছুটি?

সারদা দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি আজ এখানে আসবেন বলে।

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, এ সব কথা বলতে মুখে কি একটুও বাধে না?

সারদা চপল কণ্ঠে উত্তর দিল, একটুও না।

সারদার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে রাখাল বলিল, নতুন-মা কি করচেন? তাঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

সারদা বলিল, তা হলে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কেন? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। আজ উপোস করে আছেন কি-না।

কিসের উপোস?

তা তো বলেন না কিছু। বলেন ব্রত আছে।

এত ব্রতই বা আসে কোথা থেকে? পাঁজিগুলো পুড়িয়ে না ফেললে আর রক্ষে নেই দেখচি।

আমি জানি দেব্‌তা, আজ মায়ের কিসের উপোস।

কিসের বলো তো?

আজ তাঁর মেয়ের জন্মতিথি।

তাই নাকি? তোমার নতুন-মা বলেছেন বুঝি?

পাগল হয়েচেন! সেই মানুষই বটে! অনেকদিন আগে মাকে বলতে শুনেছিলাম মাঘী পঞ্চমী রেণুর জন্মতিথি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সুতরাং এদিনে নতুন-মার উপবাস অনিবার্য্য!

সারদা বলিল, হ্যাঁ। শুধু তাই নয়—লক্ষ্য করে দেখেচি, এই দিনটিতে মা গরীব দুঃখীদের প্রচুর দান করেন। টাকা-পয়সা, নতুন কাপড়, কম্বল, আলোয়ান, এ-সব তো দেনই, তা ছাড়া পছন্দসই সুন্দর সুন্দর রঙীন শাড়ি, ডুরে শাড়ি, ব্লাউজ, সেমিজ এই-সব কিনে ভিখারী মেয়েদের বিলিয়ে দেন। বাড়ি থেকে এ-সব কিছু করেন না, অন্য কোথাও গিয়ে দিয়ে আসেন। যেমন কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর কিংবা গঙ্গার ঘাট এই রকম কোথাও।

রাখাল কিছু বলিল না। গম্ভীর-মুখে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল।

সারদা বলিল, শুনেচেন কি, মা যে কলকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য অন্যত্র চলে যাচ্চেন?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, কোথায় যাচ্চেন?

সারদা বলিল, আপাততঃ তীর্থভ্রমণে। তার পরে যে কোনও দেশে হোক্ থাকবেন।

রাখাল প্রশ্ন করিল, কবে যাবেন?

সারদা বলিল, তারকবাবুর বিয়েটা চুকে গেলেই।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তারকের বিয়ে নাকি? কোথায়?

সারদা সবিস্তারে তারকের বিবাহ-সংবাদ রাখালকে জানাইল।

রাখাল বলিল, তারক ঘরজামাই থাকতে রাজী হ'লো?

বছর-দুই মাত্র। তার পর শিববাবু ওকে আলাদা একখানি বাড়ি দিয়ে পৃথক সংসার করে দেবেন কথা দিয়েচেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে তারক শুধু এক রাজকন্যাই নয়, অর্দ্ধেক রাজত্ব-সুদ্ধ পাচ্ছে বলো?

সারদা পরিহাসের সুরে বলিল, শুনে আপনার নিশ্চয়ই আপশোষ হচ্চে—না দেব্‌তা?

রাখাল সে-পরিহাসের জবাব না দিয়া অন্যমনস্কচিত্তে কি যেন ভাবিতে লাগিল। সারদা হঠাৎ মিনতির সুরে বলিল, দেব্‌তা, আপনিও কেন বিয়ে করুন না?

রাখাল এবার উচ্চ হাসিয়া বলিল, তারকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিয়ে করবো নাকি?

সারদা বলিল, বাঃ, তা কেন? চিরকাল কি এমন একলা মেসে পড়ে থাকবেন? সংসার পাতাবার কি সাধ হয় না?

রাখাল বলিল, সাধ থাকলেও সকলেই কি সংসার করতে পারে সারদা?

কেন পারবে না? দীন-দুঃখীরাও তো তাদের নিজের মতন সংসার পেতে নেয়।

কিন্তু এও তো দেখা যায় সারদা, গরীব দুঃখী হয়তো অভাব অনটনের মধ্যেও সংসার করবার সুযোগ পেলো, কিন্তু মহাধনী প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও সে সুযোগ পেলো না। সকলের ভাগ্যে সব সুখ-সাধ পূর্ণ হয় না। ধরো না, তোমারও তো চেষ্টার ত্রুটি হয়নি, কিন্তু তুমিই কি সংসার করতে পাচ্ছো?

স্বচ্ছন্দ-স্বরে সারদা জবাব দিল, আমার কথা ছেড়ে দিন। অত অল্প বয়সে বিধবা যদি না হ্‌তাম, আজ তো আমার মস্ত সংসার হ'তো। তার পরেও তো আবার খোদার উপরে খোদকারীর দুর্ব্বুদ্ধি নিয়ে নতুন সংসার পেতেছিলাম। সইল না, তা কি করবো!

রাখাল বলিল, তা হলেই বোঝ—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রম্!

সারদা রাখালের যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, আপনি বিয়ে করার পরে যদি সংসার গড়ে না উঠতো, অথবা সংসার পাতবার মুখে বৌটি যদি মারা যেতো বা অন্য কিছু হ'তো—তা হলে ও কথা মানতাম। আপনি তো আজ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা করেননি!

রাখাল বলিল, চেষ্টা করলেই কি হয় নাকি? বিয়ে হওয়া-না-হওয়াটাও যে ভাগ্যেরই উপর নির্ভর করে এটা বুঝি তুমি মানতে চাও না? দেখ সারদা, ঐ-সব ইতিহাস ভুগোল পড়া, আর গালচে-সতরঞ্চির টানা-পড়েন শেখা দিন-কতক বন্ধ রেখে তোমার একটু লজিক পড়া দরকার।

কিচ্ছু দরকার নেই। করুন দেখি তর্ক, কেমন না আপনাকে হারিয়ে দিতে পারি, দেখে নিন্।

রাখাল হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি হার স্বীকার করে নিচ্ছি। একে স্ত্রীলোক, তায় অল্পবিদ্যা—এ যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তা সকলেই জানে। তর্কশাস্ত্রপ্রণেতাগণ স্বয়ং এলেও হার মানবেন, আমি তো তুচ্ছ; ওকথা রেখে কাজের কথার জবাব দাও দেখি? নতুন-মা যে কলকাতার বাসা উঠিয়ে

দিয়ে তীর্থযাত্রা করচেন, তোমার ব্যবস্থা কি হচ্ছে? তুমিও কি নতুন-মার সঙ্গেই যাচ্চো?

সারদা হাসিয়া বলিল, ধরুন, তাই যদি যাই—তাতে খুশী হবেন না অখুশী?

রাখাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, খুশী না হলেও অখুশী হবারই বা আমার কি অধিকার?

অধিকার যদি পান তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, ও জিনিসটা অত তুচ্ছ নয়! অধিকার এমন বস্তু, যা দানের সাহায্যে এলে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে; কাজেই মর্য্যাদা হারায়। অধিকার যেখানে আপনি সহজভাবে জন্মায়, সেইখানেই তার জোর খাটে।

সারদা বলিল, তবে আর আমারও অনধিকার-চর্চ্চায় কাজ নেই। কিন্তু মোটের উপরে এটা বেশ বোঝা যাচ্চে যে, আমি মার সঙ্গে বিদেশে গেলে আপনি একটুও খুশী হন না।

সে শুধু তোমারই ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। বলিল, এতে আমার নিজের কিছু স্বার্থ আছে মনে করো না।

সারদা উদাসভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, সংসারে কার যে কোথায় স্বার্থ, কি করে বুঝবো বলুন?

রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিল, আমি মিথ্যে বলিনি সারদা—

সারদা এবার হাসিয়া ফেলিল। স্নিগ্ধ মধুর সে হাসি। বলিল, শুনুন, নতুন-মা বলেচেন, যতদিন না পড়াশুনো শেষ হয়, আমাকে স্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে যাবেন।

রাখাল বলিল, সে বেশ সুব্যবস্থা।

সারদার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। অনুযোগের সুরে বলিল, কিন্তু আমার যে এ ইস্কুল-ফিস্কুল মোটে ভালো লাগে না দেব্‌তা!

কি ভালো লাগে বলো?

সারদা নতমুখে নিরুত্তর রহিল।

রাখাল বলিল, মোটা মোটা বই পড়ে থিওরিটিক্যাল জ্ঞান লাভের চেয়ে প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে হাতে-কলমে কাজ শেখা তো বেশ ইন্টারেষ্টিং; ওটা তোমার ভালো লাগা উচিত।

সারদা নতচোখেই বলিল, আমার কিছুই শিখতে ভালো লাগে না।

রাখাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কি তোমার ভালো লাগে সারদা।

বিষণ্ণ-স্বরে সারদা বলিল, সে বলে লাভ নেই। আপনি শুনে হয়তো ঠাট্টা করবেন।

রাখাল বলিল, সারদা, তোমার জীবনের সুখ-দুঃখের কথা নিয়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবো এতবড় পাষণ্ড আমি নই।

অপ্রতিভ হইয়া সারদা বলিল, দেবতা তা নয়। আমার কি যে ভালো লাগে আমি নিজেই তা বুঝতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, নির্দ্দিষ্ট সময় যন্ত্রের মতো ইস্কুলে গিয়ে পড়াশুনা, শিল্পকর্ম্ম বা ধাত্রীবিদ্যা শেখার চেয়ে, বাড়িতে ঘর-সংসারের কাজ করতে আমার অনেক ভালো লাগে। সংসারকে নিখুঁত শৃঙ্খলায় সাজিয়ে, গুছিয়ে পরিপাটি রাখতে আমার উৎসাহের অন্ত নেই। এজন্য আমি সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার সবচেয়ে আনন্দের সামগ্রী। দেখেচেন তো নতুন-মার পুরোনো বাড়িতে থাকতে, ভাড়াটেদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আমার কাছেই থাকতো, খেলা করতো, ঘুমাতো, পড়াশুনা করতো।

অল্পক্ষণ থামিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সারদা বলিল, নিজের হাতে আপনজনদের সেবা যত্ন করার মধ্যে যে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ, তা মেয়েমানুষ ভিন্ন আর কেউ বুঝবে না।

রাখাল ব্যথিত হইয়া বলিল, সারদা, তুমি নিজের সংসার বলতে কিছু পাওনি বলেই সংসারের দিকে তোমার এত আকর্ষণ।

সারদা বলিল, হয়তো তাই হবে। সেই জন্যেই তো মিনতি করে বলচি দেবতা আপনি বিয়ে করুন, সংসারী হোন। আমি আপনার সংসার নিয়ে থাকবো। আপনাদের দুজনকে প্রাণ ঢেলে সেবা-যত্ন করব। নিজের হাতে এমন সুন্দর করে ঘর-সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবো, দেখবেন লোকে সুখ্যাতি করে কি না। তারপর খোকা-খুকুদের মানুষ করার ভার পুরোপুরিই নেবো আমার হাতে। এই যে সেলাই, বোনা, শিশুপালন এত কষ্ট করে শিখচি, এ কি সত্যিই হাসপাতালে বা লোকের দোরে দোরে চাকরি করে বেড়াবো বলে? তা মনেও করবেন না।

রাখাল-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সারদার কথাগুলি শুনিতেছিল।

সারদা বলিতে লাগিল, ইস্কুলের এত কড়া নিয়ম আমার আদপেই বরদাস্ত হয় না। তবুও জোর করে শিখচি কেন জানেন? সংসার করবো বলে। আমি আপনার বিয়ে দেবোই। নিজে মেয়ে পছন্দ করবো। সংসার পাতবো নিখুঁত করে। মানুষ করবো ছেলে-মেয়েদের—ভগবান না করুন—যদি সংসারে অভাব অনটন ঘটে, তার জন্য কারো কাছে গিয়ে হাত পাততে হবে না, নিজেই সেটুকু পূর্ণ করে নিতে পারবো।

রাখাল বলিল, তুমি কি এই কল্পনা নিয়েই শিক্ষায় প্রবেশ করচো, সারদা?

রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া সারদা বলিল, আপনি থাকতে সত্যই কি আমি

অন্নের জন্ত পরের দুয়ারে হাত পেতে চাকরি করতে বেরুবো ভেবেচেন? কি দুঃখে যাবো? বয়ে গেছে আমার—

সারদার কণ্ঠের প্রগাঢ়তায় রাখালের অবিশ্বাস করিবার মত কিছুই রহিল না।

সারদার মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া রাখাল ধীরকণ্ঠে বলিল, সারদা, তুমি কি বলতে চাও—সমস্ত জীবনটা তোমার এমনি করে পরের সংসারেই বিলিয়ে দিয়ে যাবে? নিজের সংসার, নিজের স্বামী, নিজের সন্তান না পেলে জীবনে সংসারের সাধ কি সম্পূর্ণ সার্থক হয়?

সারদা মৃদুস্বরে বলিল, এ আমি আপনাকে তর্ক করে বোঝাতে পারবো না দেব্‌তা—আমি জেনেচি, স্বামী, গৃহস্থালী, সন্তান মেয়েদের জীবনে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী। যে মেয়ে সত্যি করে একে ভালবাসে, সে কখনো এতে এতটুকু কালি লাগতে দিতে পারে না। কোন মেয়েই চায় না, তার নিজের সন্তানের কপালে বাপ-মায়ের কোনরকম কলঙ্কের ছাপ থাকুক। যে জন্যই হোক, আর যার দোষেই হোক এ কথা তো কোনদিন ভুলতে পারিনে যে আমার জীবনে অশুচির ছোঁয়া লেগেচে। নিজের স্বামী-পুত্রকে খাটো করে নিজে স্ত্রী হবো—মা হবো—ততবড় স্বার্থপর আমি নই। নাই বা পেলাম স্বামী, সন্তান, যাকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি, ভক্তি করি, তাঁর সন্তান কি নিজের সন্তানের চেয়ে কম স্নেহের? তাঁর সংসার কি নিজের সংসারের চেয়ে কম আনন্দের?

রাখাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সারদা আস্তে আস্তে বলিল, দেব্‌তা, আমি নির্ব্বোধ নই। আপনি বিয়ে করুন। আপনার বৌকে আমি ভালবাসতে পারবো। আমি ঈর্ষাকে ঘৃণা করি। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? সে-ই যে আমাকে সব দেবে। আপনার সংসার—আপনার সন্তান—আমার আনন্দের সকল অবলম্বন যে তারই হাত থেকে পাবো!—আমার জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা সে যে তারই দান!

নিরুত্তর রাখাল একইভাবে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে রাখাল নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মুখ তুলিয়া অস্ফুট-কণ্ঠে বলিল, তোমার অনুরোধ আজ সত্যই আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুললে সারদা! আমি দেখবো চিন্তা করে—আজ চললাম। নতুন-মা এলে ব'লো আমি এসেছিলাম।

তারকের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

বিমলবাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন। সবিতা প্রস্তুত হইয়াছেন বিমলবাবুর সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইবার জন্য। আগামী কল্য তাঁহারা রওনা হইবেন। পুরাতন দরওয়ান মহাদেও ব্যতীত বিমলবাবু দাসী ও রাঁধুনী সঙ্গে লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাখালকে ডাকাইয়া সবিতা তাহার হাতে ব্রজবিহারীবাবুর শিলমোহর করা গহনা সমেত বাক্সটি তুলিয়া দিয়া বলিলেন, এ গহনা রেণুর। সে না নিতে চায়, সংসারে মাতৃহীনা মেয়েদের মধ্যে এ তুমি বিলিয়ে দিয়ো রাজু। এ-সমস্ত আটকে রেখেছিলাম যার জন্য, সেই যখন চরম দারিদ্র্য মাথায় তুলে নিলো, আমি আর এ বোঝা বয়ে মরি কেন? দেড় লক্ষ টাকা দামের যে সম্পত্তি আমার নামে ছিল—সে কেনা হয়েছিল রেণুরই বাপের উপার্জ্জনের টাকায়। সে সম্পত্তি রেণুর নামে ট্রান্সফার করে রেজেস্ট্রি করে দিয়েছি, এই নাও সেই দলিল ও কাগজপত্র। সে না গ্রহণ করে এ সম্পত্তির যে ব্যবস্থা তুমি নিজে ভাল বুঝবে তাই ক'রো। আর এই হাজার-কয়েক টাকার কোম্পানীর কাগজ ও আমার এই হার, বালা, চুড়ি যা বিয়ের সময় আমার বাপের দেওয়া, এ আমি তোমার ঘর করতে যে আসবে, অর্থাৎ আমার বৌমাকে—আমার যৌতুক দিয়ে গেলাম। এ তার শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদী। ফিরিয়ে দিয়ো না বাবা।

সারদা দূরে দাঁড়াইয়া রাখালের মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল।

রাখাল বিপন্ন হইয়া বলিল, নতুন-মা, আপনার ছেলের বিদ্যে-বুদ্ধির খবর আপনার অজানা নয়। এতবড় গুরু দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে যাচ্ছেন কেন? আমি কি পারবো এ-সবের ব্যবস্থা করতে? তার চেয়ে বরং তারকের কাছে এ-সব গচ্ছিত রেখে যান; সে আইনজ্ঞ মানুষ, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বোঝে-সোঝে ভালো, তার হাতে থাকলে সুব্যবস্থা হতে পারে।

সবিতা বলিলেন, আমাকে কি তুই নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে দিবিনে রাজু? তার পরে গাঢ়-স্বরে বলিলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে—তোমার কাকাবাবুর হাত থেকে এ-সমস্ত একদিন নিজের হাতে নিয়েছিলাম তা সার্থক হ'লো না। তোমার কাকাবাবুর ডুবে যাওয়া কারবারের তলায় এগুলিও সেদিন তলিয়ে গেলেই ভালো হ'তো। হয়তো এর চেয়ে সান্ত্বনা পেতাম তাতে।

রাখাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, কিন্তু সে যাই বলুন নতুন-মা, আমি কিন্তু এ-সব আর্থিক ব্যাপারে নিতান্তই অজ্ঞ। আমাকে দিয়ে—

সবিতা ধীর কণ্ঠে বলিলেন, ভয় পেয়ো না রাজু। তুমি এ-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই করবে, সেইটাই হবে সুব্যবস্থা। আর শুভ ব্যবস্থা।

সবিতারা প্রথমেই যাত্রা করিলেন দ্বারকা। সেখান হইতে বহু স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে গুজরাট রাজপুতনা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিলে, বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মথুরা-বৃন্দাবন দেখবে না সবিতা? এখান থেকে খুব কাছে—

সবিতা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রভাস দেখলাম, দ্বারকা দেখলাম, মথুরা-বৃন্দাবনই বা বাকি থাকে কেন—চলো যাই।

মথুরায় বিমলবাবুর পরিচিত এক ধনী শেঠের প্রাসাদে তাঁহারা আসিয়া উঠিলেন। শেঠজী কারবার-সূত্রে বিমলবাবুর সহিত বিশেষ পরিচিত। তাঁহার সুরম্য 'গেস্ট হাউসে' বা অতিথি-ভবনে বিমলবাবুদের থাকিবার বন্দোবস্ত তো করিয়া দিলেনই, নিজের একখানি মোটরকারও বিমলবাবুর সর্ব্বদা ব্যবহারের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলেন।

মথুরা হইতে মোটরযোগে বৃন্দাবন গিয়া বিমলবাবু বলিলেন, সবিতা, ব্রজবাবুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে নাকি?

সবিতা বলিলেন, পাগল হয়েচো! আমরা দেবদর্শন করতে এসেচি, তাই দেখে ফিরে যাবো।

সমস্তদিন বৃন্দাবনের নানা স্থানে ঘুরিয়া ক্লান্ত বিমলবাবু বৈকালে বলিলেন, চলো এইবার মথুরায় ফেরা যাক।

সবিতা বলিলেন, শুনেচি, বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর আরতি ভারি সুন্দর, আরতিটা দেখে গেলে হয় না।

বিমলবাবু বলিলেন, আরতি দেখেই ফেরা যাবে। বিস্তৃত একটি মাঠের পাশে গাছতলায় মোটর রাখিয়া তাঁহারা সতরঞ্চি বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। মহাদেও দরওয়ান বিমলবাবুর চায়ের সরঞ্জামপূর্ণ বেতের বাক্স গাড়ি হইতে নামাইয়া স্টোভ জ্বালিয়া গরম জল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সবিতা চা খান না, কিন্তু নিজ হস্তে চা তৈয়ারী করেন। এলুমিনিয়ম কেটলী হইতে ফুটন্ত জল চীনামাটির চা-পাত্রে ঢালিয়া, চিনি, চা, দুধ প্রভৃতি মহাদেও সবিতার সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল।

ক্লান্তকণ্ঠে সবিতা বলিলেন, মহাদেও, তুমিই আজ চা তৈরী করো। আমি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েচি।

বিমলবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তোমার শরীর খারাপ ঠেকচে নাকি? তা হলে আজ আর মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

সবিতা বলিলেন, না এমন কিছুই হয়নি। আরতি দেখবো সঙ্কল্প যখন করেছি, না দেখে যাবো না।

প্রান্তরের প্রান্তে সূর্য্য অস্তাচলে নামিয়া গেলেন। গাঢ় রাঙা আলোয় নীল আকাশ, সবুজ মাঠ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কুলায়গামী পাখীর কলকোলাহলে বৃন্দাবনের গাছপালা ও কুঞ্জ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সবিতা স্তব্ধ হইয়া মাঠের প্রান্তে অন্যমনস্ক দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছেন। বিমলবাবু নীরবে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বিমলবাবু বলিলেন, চলো, এইবার মন্দিরে যাই। পরে গেলে ভিড়ে হয়তো তোমার ঢুকতে কষ্ট হতে পারে।

সবিতা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, চলো।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিলেন, দেখো, একটু পরেই না হয় মন্দিরে যাবো আমরা। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠুক আগে। ভিড়ে এমন আর কি কষ্ট হবে?

বিমলবাবু প্রতিবাদ করিলেন না। গাড়ি এদিক সেদিক খানিক ঘুরিবার পরই আলোকিত গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। বিমলবাবুরা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দজীর আরতি হইতেছে। সবিতা বিগ্রহ-মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্রে আরতি দর্শন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বিগ্রহের প্রতি স্থির নয়, আশে-পাশে চঞ্চল।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, সেই বারান্দারই এককোণে ব্রজবাবু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নিষ্পলক নয়নে আরতি দর্শন করিতেছেন। ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, নাম জপ করিতেছেন সম্ভবতঃ।

আরতি সমাপ্ত হইলে ভিড় কমিয়া গেল। বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া ব্রজবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সর্পদষ্টবৎ সরিয়া গিয়া ব্রজবাবু বলিয়া উঠিলেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ! এ কি! প্রভুর মন্দিরে আমাকে প্রণাম! মহাপাপে পাপী হলাম যে!

বিমলবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমি জানতাম না মন্দিরে প্রণাম করতে নাই। ক্ষমা করুন।

গোবিন্দ, গোবিন্দ, আপনি আমাদের বিমলবাবু না? চলুন চলুন, আঙিনায় তুলসীকুঞ্জের দিকে গিয়ে বসি।

বিমলবাবু বলিলেন, চলুন।

ব্রজবাবু বিগ্রহ-মূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে শুইয়া পড়িয়া বারংবার আপনার নাসাকর্ণ মলিয়া হয়তো বা বিমলবাবুর প্রণাম-জনিত অপরাধেরই মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সবিতা স্থিরনয়নে ভূপতিত ব্রজবাবুর পানে তাকাইয়া নিস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুদীর্ঘ প্রণাম অন্তে উঠিয়া ব্রজবাবু সবিতা ও বিমলবাবু-সহ মন্দিরের অন্তদিকে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবুর চেহারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখমণ্ডল ও মস্তক ক্ষৌর-মুণ্ডিত। শীর্ষে দুগ্ধধবল শিখাগুচ্ছ ছাড়া কেশের চিহ্নমাত্র নাই। কণ্ঠে তুলসীকাঠের গুচ্ছবদ্ধ মালা। নাসিকা ও ললাটে তিলকরেখা, হাতে হরিনামের ঝুলি, গায়ে নামাবলী। গৌরবর্ণ দীর্ঘছন্দ দেহ রৌদ্রদগ্ধ তামাটে হইয়া বার্দ্ধক্যভারে সম্মুখে অনেকটা নত হইয়া পড়িয়াছে।

বিমলবাবুর কুশল প্রশ্নের উত্তরে ভাবগাঢ়-কণ্ঠে ব্রজবাবু বলিলেন, বিমলবাবু, গোবিন্দ এই দীনহীনকে অনেক কৃপা করেছেন। যে-জন ব্রজধামে এসেচে, ব্রজরেণু মেখেচে, যমুনায় অবগাহন করে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন স্পর্শ করেচে, তার কি আর কোনও অকুশল থাকে? বৃন্দাবনে সবই কুশল। ইহলোকে আর আমার কোনও কামনাই নাই। এখানে আমি কৃষ্ণানন্দে বিভোর হয়ে আছি।

সবিতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, রাজুর কাছে শুনেচি তুমি এখানে নাকি কোন বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়ায় দীক্ষা নিয়েছো? সদাসর্ব্বদা বোধ হয় তাদের নিয়েই মেতে আছো মেজকর্ত্তা?

আমতা আমতা করিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, তা কতকটা বটে। কি জানো নতুন-বৌ, আমার শেষের দিনগুলি গোবিন্দ তাঁর চরণ-ছায়ায় টেনে এনে বড় করুণাই করেচেন। এখানে সংসারের সকল দুঃখ-তাপ সত্যিই জুড়িয়েচি।

সবিতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে ব্রজবাবুর পানে তাকাইয়া বলিলেন, মেজকর্ত্তা, এ যে তোমার রেসে হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মদের নেশায় মশগুল থাকা। এ আনন্দের দাম কি তা জানো?

মন্দিরের অন্তধারে খোল-করতাল যোগে একদল কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছিল—

"প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্তি না সঞ্চারে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ তনু-মন,
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরম রতন॥
কুল, শীল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোকলজ্জা, ভয়,
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয়,
মদিরা-মদান্ধ যেন কটির বসন
আছে কি না আছে তারা নাহি বিবেচন॥"

ব্রজবাবুর দুই চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিহ্বলকণ্ঠে কহিলেন, নতুন-বৌ, এ মদের নেশা যেন আর না ছোটে এই কামনাই ক'রো।

সবিতা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, তোমার মেয়ে? আমার রেণু?

কে আমার মেয়ে? আর আমিত্বের মোহ রেখো না নতুন-বৌ। সমস্তই তুহুঁ তুহুঁ। 'আমার' বলে কিছুই নাই। সেই একমাত্র 'আমি' ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এখানে সব। রেণুকে তাঁরই চরণে অর্পণ করেচি। যতদিন ওকে নিজের বলে ভেবেচি, ভাবনায় হয়ে পড়েচি দিশেহারা। এবার দিন-দুনিয়ার মালিক যিনি, তাঁর হাতে তোমার রেণুকে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচি। তিনি যে ব্যবস্থা করবেন, কারো সাধ্য নেই তা রদ করবার। ধরো না কেন আমাদের কথাই। মানুষের ব্যবস্থা, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের মালিকানা খাটলো কি? আড়াল থেকে সেই পরম রসিক হেসে যেদিকে অঙ্গুলি হেলালেন, সেইদিকেই উল্টে গেল পাশা। পুতুল-বাজীর পুতুল আমরা, নিজেদের কোনও ইচ্ছাই মানুষের খাটতে পারে না, একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ছাড়া।

সবিতা কি যেন জবাব দিতে যাইতেছিল, কে ডাকিল, বাবা—

কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া সবিতা পিছন ফিরিয়া দেখিলেন,—রেণু। শীর্ণ মুখ, রুক্ষ কেশ, চেহারায় দারিদ্র্যের রুক্ষতা সুস্পষ্ট। পরণে একখানি আধময়লা ছাপা বৃন্দাবনী শাড়ি, তারও কণ্ঠে তুলসীর কণ্ঠী—ললাটে ও নাসিকাগ্রে চন্দন-তিলক।

সবিতা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া নিথর হইয়া গেলেন।

রেণু সবিতার দিকে না তাকাইয়া ডাকিল, বাবা, ঘরে চলো, রাত হয়ে যাচ্ছে।

ব্রজবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তোর মাকে চিনতে পারলিনে রেণু?

মাথা হেলাইয়া রেণু বলিল, দেখেচি। মন্দিরে তো প্রণাম করতে নেই।

মায়ের মুখের পানে একবার শান্ত নির্লিপ্ত দৃষ্টিপাত করিয়া আবার ব্রজবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, চলো বাবা। একদশীর উপবাস করে রয়েচো সারাদিন, কখন একটু প্রসাদ পাবে?

কন্যার আকৃতি দেখিয়া সবিতার অন্তরে যে আর্ত্তক্রন্দন গুমরিয়া উঠিতেছিল, কন্যার কথাবার্ত্তার ভঙ্গিতে তাহা যেন আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল।

মাতার প্রতি কন্যার এই পরের মত আচরণে ব্রজবাবু মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিলেন। হয়তো বা সেইজন্যই সবিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, নতুন-বৌ গোবিন্দর কুটীরে একদিন তোমরা সেবা করতে পারবে কি?

সবিতা রেণুর নির্লিপ্ত মুখের পানে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রজবাবুকে জবাব দিলেন, না মেজকর্ত্তা, তোমার গোবিন্দের কুটীরে আমার মতন মহাপাপীর প্রবেশের উপায় নেই।

জিভ কাটিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ! দীনদয়াল দীনবন্ধু—পতিত-পাবন তিনি। তিনি যে অশরণের শরণ নতুন-বৌ—

উচ্ছ্বসিত কান্না প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সবিতা বলিলেন, শুধু তোতাপাখীর মত মুখেই এ-সব আওড়ে গেলে মেজকর্ত্তা! তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের যা তৈরি করেচে সে তোমরা নিজচক্ষে দেখতে পাচ্ছো না তাই রক্ষে। যে ধর্ম্মে ক্ষমা নেই, সে ধর্ম্ম অধর্ম্ম থেকে কতটুকু আর উঁচু? সবিতা ত্বরিতপদে মন্দিরের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিমূঢ় ব্রজবাবুর সামনে আসিয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল, কখন আপনার সুবিধা হবে জানতে পারলে।

ব্রজবাবু বলিলেন, যখন আপনার সুবিধা হবে তখনই।

বিমলবাবু বলিলেন, বেশ, কাল দুপুরে আমি আসব। আপনার বাসাটা—

এই মন্দির থেকে বেরিয়ে বাঁ-হাতি রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাইনে গলিতে। ঘনশ্যামদাস বাবাজীর কুঞ্জ বললে সকলেই দেখিয়ে দিতে পারবে।

রেণু বলিল, বাবা, কাল যে শ্রীগুরু কুঞ্জে মহারাজের অহোরাত্র নামকীর্ত্তন আর বৈষ্ণব সেবা আছে। কাল সারাদিন আমরা তো সেইখানেই থাকবো।

ব্রজবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েচিস মা। বিমলবাবু, কাল আমায় মাপ করতে হবে; কাল আমি সারাদিন আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠ দাস বাবাজীর শ্রীকুঞ্জে থাকবো। আপনি পরশু সকালে এলে অসুবিধা হবে কি?

বিমলবাবু বলিলেন, কিছু না। তা হলে পরশু সকালেই আমি আপনার কাছে আসবো। নমস্কার।

ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ!

মোটরে উঠিয়াই আসনের উপর ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া সবিতা বলিলেন, আর নানা স্থানে ছুটে বেড়াতে ভালো লাগচে না। এইবার বিশ্রাম চাই দয়াময়।

বিস্মিত বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, বৃন্দাবনেই থাকবে স্থির করলে নাকি?

না—না—না! এখানে আমি একদণ্ড টিকতে পারবো না! কণ্ঠস্বরে একটু জোর দিয়াই বলিলেন, আমাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চলো।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, সে কি?

হ্যাঁ—কাল সকালেই যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলো। একদিনও আর বিলম্ব না—সবিতার কণ্ঠে আকুল মিনতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, এমন অধীর হয়ো না সবিতা। কাল তো যাওয়া হতে পারে

না। এ রেলের পথ নয়, জাহাজের পথ। কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া—ব্রজবাবুকে কথা দিয়ে এলাম, পরশু সকালে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবো। সুতরাং কালকের দিনটা অপেক্ষা না করে তো উপায় নেই। অবশ্য রাতের ট্রেনেই আমরা মথুরা ছাড়তে পারবো—

সবিতা বালিকার ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, না না, আমি পারবো না। আমার দম আটকে আসচে এখানে। এদেশ থেকে আমাকে তুমি চিরদিনের মতো বহু দূরদেশে নিয়ে চলো। বহুদূরে—যেখানে রীতি, নীতি, সমাজ, মানুষ সবই অন্যরকম। আমি মুছে ফেলবো আমার সমস্ত অতীত! তাকে এমন করে আমার জীবন দখল করে থাকতে আর দেবো না আমি—

বিমলবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। সবিতার মনের অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতে বিমলবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, সবিতার শয়ন-কক্ষের দ্বার তখনও বন্ধ। বিমলবাবু চিরদিনই একটু বেশি বেলাতে ওঠেন। কিন্তু সবিতার ভোরে ওঠাই অভ্যাস। এত বেলাতেও সবিতার শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বারে ধাক্কা দিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় দুয়ার খুলিয়া সবিতা বাহির হইলেন। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি ও কালিমা চোখে-মুখে নিবিড় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মরণাপন্ন রোগী লইয়া সুদীর্ঘ রজনী মৃত্যুর সহিত যুঝিবার পর প্রভাতে নারীর মুখের চেহারা যেমন বদলাইয়া যায়, এক রাত্রিতেই সবিতার মুখে যেন সেই ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিমলবাবু একবার সবিতার পানে তাকাইয়া ব্যথিত দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। কিছুই প্রশ্ন করিলেন না।

সবিতা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখচি। তুমি চা পাওনি নিশ্চয়। কাপড় কেচে এসে আমি তৈরি করে দিচ্ছি এখুনি।

বিমলবাবু বলিলেন, ঠাকুর চা করে দিক না আজ সবিতা?

সবিতা বলিলেন, না না, সে ভালো তৈরি করতে পারে না। আমার দেরি হবে না বেশি।

তার পরে নিজেই কৈফিয়তের ভঙ্গিতে সহজ গলায় কহিলেন, রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। কাল মেজাজ এমন বিগড়ে গেছলো, মাথা ধরে ওঠে, রাত্তিরের ঘুমটি মাঝে থেকে মাটি হলো আর কি। যাই চট্ করে স্নানটা সেরে আসি।

সবিতা গামছা হাতে লইয়া স্নানকক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন। বিমলবাবু অন্যমনস্ক চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, কতখানি নিদারুণ হতাশা ও মর্মবেদনায় মানুষের চেহারা একরাত্রের মধ্যে এতখানি ম্লান ও বিশুষ্ক হইতে পারে!

চা ঢালিতে ঢালিতে সবিতা অত্যন্ত সহজভাবে বলিলেন, কাল বেশ ভালো করে ভেবে-চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেচি। বুঝেচো?

বিমলবাবু বলিলেন, কিসের?

ওই ওদের সম্বন্ধে।

এই অনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনাম যে কাহার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হইল বিমলবাবু বুঝিতে পারিলেন। কতখানি গভীর বেদনার ফলেই অতি প্রিয় নাম আজ সর্ব্বনামে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। বলিলেন, কি স্থির করলে সবিতা?

সিঙ্গাপুরে যাওয়াই স্থির করলাম।

আরও দিনকতক তীর্থভ্রমণে বেড়ানো যাক—তারপরেও যদি ইচ্ছে করো, যাবে। কেমন?

না, আর তীর্থে নয়। মানুষের হাতে গড়া এই পুতুল খেলার তীর্থে ঘুরে ঘুরে শুধু ঘোরার নেশায় খানিক সময় কাটে মাত্র, অন্তরের প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে না। এ খেলায় আর যারই মন ভুলুক, যে সত্য চায়, তার মন ভোলে না। এবারে বিশ্রাম চাই।

বিমলবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, কিন্তু যেখানে বিশ্রামের আশায় যেতে চাইচো, সেখানে গিয়ে যদি তা না পাও?

সে ভয় করো না। এবার আর আমার ভুল হবে না। তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমার জীবনের দিনান্তে যে সামগ্রী আমাকে পাঠিয়েচেন, তা সামান্য নয়। বোঁটা থেকে যে ফুল ছিঁড়ে পড়ে গেছে মাটিতে, সে ফুল আর কখনো শাখার বাঁধনে ফিরে আসে না। আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়ানো যে শুধু দুঃখই বাড়ানো—এবার তা আমি বুঝতে পেরেচি।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে টেলিগ্রাম করে দিই, সিঙ্গাপুরের জাহাজে দুটো কেবিন রিজার্ভের জন্য?

সবিতা মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

পরদিন সকালে বিমলবাবু মথুরা হইতে মোটরযোগে যখন বৃন্দাবনে রওনা হইলেন, সবিতাকে বলিলেন, ব্রজবাবু তোমাকে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একবার ঘুরে আসবে নাকি?

সবিতা অসম্মত হইলেন। বিমলবাবু একাই বাহির হইয়া গেলেন। বৃন্দাবনে ব্রজবাবুর ঠিকানা খুঁজিয়া বাসায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, রেণু পূর্ব্বদিন রাত্রি হইতে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসা ও শুশ্রূষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত কিছুই হয় নাই। রোগীকে হরিনাম-সংকীর্ত্তন শোনান হইতেছে। ব্রজবাবু ঠাকুর-ঘরে হত্যা দিয়া

পড়িয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আসিয়া মুমূর্ষু কন্যার ওষ্ঠাধরে একটু করিয়া চরণামৃত দিতেছেন, পুনরায় ব্যাকুলচিত্তে ছুটিয়া গিয়া বিগ্রহের সম্মুখে আছড়াইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার গুরুদেব ঠাকুরদাস বাবাজীর কুঞ্জে সংবাদ পাঠানোয় তিনি আশ্রমের একজন বৈষ্ণব সেবাদাসী পাঠাইয়া দিয়াছেন রোগিণীর শুশ্রূষার জন্য। সে মথুরা জেলার যুবতী। বাঙলা ভাষা ভাল বুঝিতে পারে না। শুশ্রূষা-সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই। অসাড়প্রায় রোগিণীকে পিপাসায় জলদান এবং বৈকুণ্ঠদাস বাবাজী দত্ত কবিরাজী বড়ি ও ঠাকুরের চরণামৃত সেবন করাইতেছে। রোগিণীর শয্যা ও বস্ত্রাদিতে উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতার অভাব বিমলবাবুর চোখে পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া বিমলবাবু সত্বর সবিতাকে আনিবার জন্য মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রেণুর অবস্থা যে শঙ্কাজনক তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বিমলবাবু তাঁহাকে লইয়া কাল বিলম্ব না করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে ছুটিলেন।

সংবাদ পাইয়া সবিতা যেন পাথর হইয়া গেলেন।

মোটরে উপবিষ্টা সবিতার মুখের পানে তখন তাকানো যায় না। তাঁহার মধ্যে যেন একটা বিরাট ঝড় শুব্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ পরে, জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে একবার সবিতা বলিয়া উঠিলেন, উঃ, গাড়িখানা এত আস্তে চলচে কেন? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে যে! বিমলবাবু দুই-একটি সময়োপযোগী কথা কহিলেও তাহা সবিতার কানে পৌঁছিল না। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, দয়াময়, তোমরা তো অনেক দেশের অনেক ইতিহাস পড়েচো। নিজের মা তার সন্তানের এমন দুর্গতির কারণ হয়েছে, পড়েচো কি কোথাও?

বিমলবাবু নিরুত্তর রহিলেন।

পথে এক জায়গায় একটি কূপের সামনে মোটর থামিল, রেডিয়েটরে জল ভরিয়া লইবার জন্য। পথিপার্শ্বে দূরে কৃষিজীবীদের কুটির হইতে বালক-কণ্ঠের কাতর ক্রন্দন ভাসিয়া আসিল।

সবিতা আচমকা ভীষণ শিহরিয়া উঠিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো, কি হ'লো ওদের? ও যে কান্নার শব্দ—না? শুনতে পাচ্ছো কি?

বিমলবাবু সবিতার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, ও কিছু নয়। ছোট ছেলে এমনিই কাঁদচে বোধ হয়। কিন্তু তুমি যদি এমন নার্ভাস হয়ে পড়ো সবিতা, কি করে সেখানে রোগীর শুশ্রূষার দায়িত্ব নেবে?

সবিতা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না, না, আমি একটুও অস্থির হইনি। যেটুকু হয়েচি, সেখানে গেলে—তাকে একবার বুকে পেলে আমার সব ঠিক হয়ে যাবে। এই পনেরো বচ্ছর আমার বুকের ভিতরটা খালি হয়ে রয়েচে যে! করুক সে আমার উপর রাগ, করুক ঘৃণা। করবারই তো কথা। যতোই যা-কিছু ভুল করে

থাকি না, তবু আমি তার মা। এটা কি আর সে বুঝবে না? নিশ্চয়ই বুঝবে, দেখে নিও! ও তার রাগ নয়, ঘৃণা নয়, মার উপর অভিমান? মেয়ে যে আমার ছোট-বেলা থেকেই ভারী অভিমানী।

বিমলবাবু দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহারা বৃন্দাবনে ব্রজবাবুর বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

বাটীর সম্মুখে দড়ির খাটিয়া ও গেরুয়াধারী বৈষ্ণবের দল দেখিয়া বিমলবাবু শঙ্কিত নেত্রে সবিতার পানে তাকাইলেন। স্থির ধীর মুখের 'পরে আর সে চাঞ্চল্য ও উদ্বেগ-ব্যাকুলতার লেশমাত্র নাই। সেখানে গাঢ় বিষণ্ণতা অথচ অতিশয় কঠিন একটি যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে। বিমলবাবু চমকিয়া উঠিলেন। মনে পড়িল, সর্ব্বপ্রথম যেদিন তিনি সবিতাকে দেখিয়াছিলেন, সেদিন সবিতার মুখে একরকম আশ্চর্য্য কঠিন অথচ নিগূঢ় বিষাদব্যঞ্জক ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন।

সবিতা এতটুকুও অস্থিরতা প্রকাশ করিলেন না। মোটর হইতে নামিয়া বাসার ভিতর চলিয়া গেলেন। সদ্য শোকাহত ব্রজবাবু অশ্রুভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, এসেচো নতুন-বৌ। এঁরা সব ব্যস্ত হয়েচেন রেণুকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি বলচি, তা হয় না। যার ধন সে আসুক, তারপর তোমরা যা খুশি ক'রো। তোমার গচ্ছিত সামগ্রী আমি রাখতে পারলাম না, হারিয়ে ফেললাম। আমাকে মাপ করতে পারবে কি?

সবিতা কথা কহিলেন না। কম্পিত অধর প্রাণপণে দাঁতে চাপিয়া নির্ব্বাকমুখে অপরিচ্ছন্ন মেঝের একপাশে বিছানাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ভূমিতলে মলিন শয্যায় বস্ত্রাবৃত শীতল নিস্পন্দ দেহ পড়িয়া আছে। আশে পাশে জলের লোটা, চরণামৃতের ভাণ্ড, কবিরাজী বড়ি, খল নুড়ি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

সবিতা অগ্রসর হইয়া কম্পিত-হস্তে শবদেহের মুখ হইতে মলিন আচ্ছাদন উঠাইলেন। অতিশয় শীর্ণ, বিবর্ণ, রক্তলেশহীন মুখ, কালিমালিপ্ত নিমীলিত চক্ষু গভীরভাবে কোটরে বসিয়া গিয়াছে। চোয়ালের কণ্ঠার হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তৈলহীন রুক্ষ কেশের রাশি ঘাড়ের নীচে স্তূপীকৃত। স্নেহময়ী জননীর চোখে যেন সে-মুখ বিশ্বের গভীরতম দুঃখ ও বেদনার নিগূঢ় ছায়ায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মৃত্যু-মলিন মুখখানার পানে বহুক্ষণ অশ্রুহীন নিষ্পলক-নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া সবিতা অবনত হইয়া কন্যার তুষার-শীতল ললাটে গভীর চুম্বন আঁকিয়া দিলেন।

শববাহী দল অগ্রসর হইয়া আসিলে আপনা হইতেই তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রজবাবু তাঁর আজীবনের সংযম, সাধনা ও ভগবদ্‌জ্ঞান ভুলিয়া, আজ শিশুর

স্বার কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন, মাগো, তোর এ বুড়ো বাপকে কার কাছে রেখে গেলি—

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে রাজু আসিয়াছে।

তার পাওয়া গিয়াছে ব্রজবাবুর কনিষ্ঠা পত্নী অর্থাৎ রেণুর বিমাতা আসিবেন। সম্ভবতঃ ব্রজবাবুর ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্তই তিনি আসিতেছেন, এইরূপ সকলের অনুমান।

এই কয়েকদিনেই সবিতার দেহে আকস্মিক বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চোখে-মুখে অনিদ্রা ও গভীর শোকের ঘন কালি পড়িয়াছে। শুষ্ক ওষ্ঠাধরে লাবণ্যের লেশমাত্র নাই। মুখভাব অসাড়।

শোকজীর্ণ ব্রজবাবুর সেবার সকল ভার সবিতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া অহোরাত্র সেই কাজের মধ্যেই আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছেন।

ঘরের মেঝেয় বসিয়া সবিতা কুলায় করিয়া খই বাছিতেছিলেন ব্রজবাবুর নৈশাহারের জন্ম। পরণের শাড়ীখানি অতিশয় মলিন, স্থানে স্থানে তেল, ঘি, কালি ও কাদার দাগ লাগিয়াছে। মাথার সিঁথি এলোমেলো অস্পষ্ট রুক্ষ, একপাশে ছোট ছোট জট বাঁধিয়াছে।

বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সবিতা মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যতদিন বলো।

সবিতা বলিলেন, ছোটগিন্নী আসছেন আজ। বোধ হয় তাঁর আসার আগেই আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কি বলো?

বিমলবাবু বলিলেন, সে তুমি বিবেচনা করে দেখ।

সবিতা বলিলেন, কিন্তু আমি যে বুঝতে পাচ্ছি, তারা এঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। এখান থেকে একে কলকাতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার মতলবেই আসচে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাতে ক্ষতি কি?

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না। এই অসহায়, অক্ষম, রোগে-শোকে-জীর্ণ মানুষটাকে তার শেষ আশ্রয় বৃন্দাবন থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো নিষ্ঠুরতা আর হতে পারে না। অন্তরের টান থাকলে ছোটগিন্নী এইখানে থেকেই স্বামীর সেবা করতেন।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সবিতা বলিলেন, এই ধূলোময়লার দেখে তোমায় খুবই কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও। আমি এখানেই রয়ে গেলুম।

বিমলবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

বিমলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছন হইতে সবিতা ডাকিলেন, শোনো।

বিমলবাবু ফিরিলে সবিতা তাঁহার পানে বেদনাবিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন, একটা কথার উত্তর দিয়ে যেতে পারবে আমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, বলো।

জন্ম-জন্মান্তরেও কি আমাকে এই ক্ষমাহীন গ্লানির বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে?

সবিতার কণ্ঠ বাষ্পারুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিলেন, কিন্তু রেণু যে বড় হয়েও একদিন আমাকে 'মা' বলে ডেকেছিল, আপন হাতে সেবা-যত্ন আদর করেছিল, তাতেও আমার কালি মুছে যায়নি?

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার মনই এর সঠিক উত্তর দেবে সবিতা।

আচ্ছা, আর একটা কথা। মানুষের অন্তরের প্রধান অবলম্বন যখন এমনি করে ভেঙে যায় মানুষ তখনও বেঁচে থাকে কেমন করে—কি নিয়ে জানো?

আমার মনে হয় তুমি যা হারিয়েছো সংসারের সকল অভাগাদের মধ্যে, সকল দুঃখীজনের মধ্যে তা খুঁজে পাবে।

সবিতা যাহা বলিয়াছিলেন হইলও ঠিক তাহাই। ছোটগিন্নী তাঁহার এক বোন-পোকে লইয়া আসিয়াছিলেন ব্রজবাবুকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য। ব্রজবাবু কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বে সবিতা বলিলেন, ওঁর এই দেহ-মন নিয়ে আর কলকাতায় ফেরা সম্ভব নয়। শেষ-বয়সের শোকার্ত্ত দিনগুলো এইখানে তবু কতকটা শান্তিতে কাটাবে।

ছোটগিন্নী বলিলেন, এখানে একজন তো বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারালো। অসুখ হলে দেখবে কে, সেবা করবে কে? তা ছাড়া পাঁচজনেই বা আমাকে বলবে কি?

সবিতা বলিলেন, সেবার জন্য তুমি নিজে এখানে থাকতে পারো। ওঁকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

ছোটগিন্নী বলিলেন, আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারচিনে!

সবিতা বলিলেন, আমি তোমাদের শ্বশুরবাড়ির লোক, আত্মীয় হই। তুমি আমাকে কখনও দেখোনি। চিনবে কেমন করে?

ছোটগিন্নী লোকটি নেহাত খারাপ নয়। একটু নির্ব্বোধ, সাদাসিদা আরামপ্রিয় মানুষ। সূক্ষ্মভাবে কোনও কিছু বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

ছোটগিন্নী বলিলেন, দাদার মোটে মত নয় আমি বৃন্দাবনে থাকি। এই কয়েক-দিনের জন্য এখানে এসেচি কত তাঁর হাতে-পায়ে ধরে। ওঁকে নিয়ে যাওয়াই কিন্তু আমার পক্ষে সব দিক দিয়ে সুবিধা।

সবিতা বলিলেন, তা জানি; কিন্তু সেটা ওঁর নিজের পক্ষে যে খুবই অসুবিধার।

ছোটগিন্নী বলিলেন, উনি যদি আমার সঙ্গে না যান, এখানে ওঁর দেখাশুনা করবে কে? আমার তো কালকের মধ্যে ফিরতেই হবে।

সবিতা বলিলেন, যখন তোমরা কেউই ওঁর আপনার ছিলে না, ওঁকে চিনতেও না, তখন যে-লোক ওঁর সব-কিছু দেখাশোনার ভার নিয়ে থাকতো, সেই লোকই ওঁর ভার নিয়েচে। তোমার দাদাকে বলো।

ছোটগিন্নী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তিনি কে?

তুমি চিনবে না ভাই, তোমার দাদাকে বললে তিনি ঠিক চিনবেন।

ছোটগিন্নী বোনপোর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।

বিমলবাবুও সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা করলেন।

যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে সবিতা আসিয়া প্রণাম করিলেন। শোকশীর্ণা সবিতার পানে চাহিয়া বিমলবাবু অস্ফুটে কি শুভকামনা করিলেন বোঝা গেল না।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে অপরাধীর মতোই বলিলেন, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না! জীবনে বারে বারে আশ্রয়-ভ্রষ্ট হওয়াই বোধহয় আমার নিয়তি।

বিমলবাবুর বৃহৎ মোটর বৃন্দাবনের রক্তিম ধূলিজালে দিক আচ্ছন্ন করিয়া সবিতার দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। শুষ্কমূর্ত্তি সবিতার রক্তলেশহীন মুখের পানে চাহিয়া রাখাল ভীতকণ্ঠে ডাকিল, মা—মা—নতুন-মা—

রাখালের আহ্বানে দৃষ্টি ফিরাইয়া সবিতা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। বলিলেন, রাজু, আমার রেণু যখন আমাকে ক্ষমা করেনি, তখন বেশ জেনেচি, সংসারে কারো কাছেই আমি ক্ষমা পাবো না।

মাস-খানেক পরে এডেন বন্দরের পোস্ট অফিসের মোহরাঙ্কিত একখানি পত্র সবিতার নামে বৃন্দাবনে আসিল। বিমলবাবু লিখিয়াছেন—

রেণুর মা,

তোমার দেশ-ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। আমি পৃথিবী-ভ্রমণে চলিয়াছি। তোমার প্রতি বিন্দুমাত্র দুঃখ বা ক্ষোভ অন্তরে রাখিয়াছি, এ সন্দেহ করিও না। সমস্ত জীবন,

বৃহৎ ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান জীবনের এই স্বল্পপরিসরতা আমাকে যেন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে, তাই এই যাত্রা।

অন্তরের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া তোমার সহিত আমার পরিচয়ের মূল্য অনেক; কিন্তু যাহা পুরুষের জীবনকে বাহিরেও যথেষ্ট বিস্তৃত, উন্নত ও উন্মুক্ত করিয়া তুলিতে পারে না, তাহা পুরুষের পক্ষে কল্যাণকর নহে। জীবনে কখনও গৃহ লাভ করি নাই। অর্থ ও ঐশ্বর্য্যই লাভ করিয়াছি মাত্র। পথিকবৃত্তিতেই সারা কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে। আজ প্রৌঢ়ত্বও শেষ হয় হয়। জীবনের এই অবেলায়, গৃহের আনন্দ উপলব্ধি তোমার নিকট হইতে লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। সেজন্য অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই।

তোমার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও অসীম শ্রদ্ধা অন্তরে লইয়া তোমা হইতে বহুদূরে সরিয়া চলিলাম। এইটুকু ভরসা রহিল, আজিকার এই যাত্রা-তরী যে সুদূর অকূলে ভাসিয়াছে, তাহার কূলের নোঙর রহিলে তুমি।

যেদিন যখনই, যে-কোনও কারণে আমাকে তোমার প্রয়োজন হইবে, টমাস কুক্ কোম্পানীর কেয়ারে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়ো। জীবিত থাকিলে, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকি, বিমানযোগে সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

আর ইহাও জানি, এমন একজন মানুষ পৃথিবীতে রহিল, আমার শেষ বিদায়-দিন সমাগত হইলে, যে সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া আমার পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারে। এই জানাটাই কি অস্তাচলমুখী একটি জীবনের পক্ষে যথেষ্ট সম্বল নহে!

ছবি

১

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজরাণী ছিল, পাত্র-মিত্র ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল; তখন পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন সহরে গিয়া বসবাস করিতেন।

এমনি বোধ হয় একজন কেহ বহুকাল পূর্ব্বে পেগুর ক্রোশ-পাঁচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকা-কড়ি, মস্ত জমিদারী। এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছে ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশি বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষু খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্ব্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটিকে তাঁহার যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুর লেশমাত্র বাধিল না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এতবড় সুযোগই তিনি এ-জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কোকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাঁরও ও-পারের শমন আসিয়া পৌঁছিল এবং সেই মহামান্য পরওয়ানা মাথায় করিয়া বৃদ্ধ বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভার সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহারা ইহার মৃত্যু-উৎসব শুরু করিয়া দিল।

বা-কোর মৃতদেহ মাল্য-চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান রহিল এবং নীচে খেলা-ধূলা, নৃত্য-গীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোনমতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জ্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকাইয়া ফিরিয়া দেখিল,

মা-শোয়ে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ওড়নার প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

২

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন এবং খুশী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছিলেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, বা-থিন, জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকার-সূত্রে মা-শোয়েই তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ-কথায় সে সকলের চেয়ে বেশি লজ্জা পাইল। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এতবড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজ-কাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। জাতক হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া-গুছাইয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানি দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এতদিন দেশের রাণী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসি-মুখে বলিল, কেন বল ত ?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁহার অনেক রাণী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁহাদের কাহারও আছে ? এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের মনে পড়িতে লাগিল, মান্দালেতে সে যখন ছবি আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এমনি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্ব্বল, নারীর মত কোমল, তাহাদের মতই সুন্দর—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

৩

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমেদিন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়-দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামান্তের মাঠে বহু জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ।

বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজ-সজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়-দৌড়? যে জয়ী হইবে সে ত আজ আমাকেই মালা দিবে!

কই, তা ত শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ নেই। কিন্তু তুমি ওঠ—আর কত দেরি করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী—হয়ত বা-থিন দুই চারি মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে—আর ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মুকুরে দুটি মুখ ততক্ষণ দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটির পানে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেগে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, কানে কানে বলিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক।

বা-থিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের

কলঙ্ক নও—কারও কলঙ্ক নও—তুমি চাঁদের কৌমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেমনি দু'চক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয়তো এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর-নারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে!

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন?

এই ছবিখানি পাঁচদিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতরাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন এ কথায় উত্তর দিল না। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, আমাকে বিক্রী করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু করিবে কি?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুনি আছে সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইয়া, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তার পর?

তার পরে যেদিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তার পরে?

তারপরে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নীচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চ কণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিবে, কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গিয়াছে—শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাইব না।

যাইবে না? কথা দিয়াছ, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো?

মা-শোয়ে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তি-ভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই—আমি যাইব না!

ছিঃ—

তবে তুমিও চল?

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্য ভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানি মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল, তুমি নিজের সুবিধার জন্য আমাকে দূর করিতে চাও। দূর আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

একমুহূর্ত্তে বা-থিনের কর্ত্তব্যের দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল, সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এতবড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে—আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিষণ্ণ-মুখেই উত্তর দিল, আমি না আসিলে খাওয়া-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, আমি সইতে পারিব না জানো বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

প্রায় অপরাহ্ণবেলায় মা-শোয়ের রূপা বাঁধানো ময়ূরপঙ্খী গো-যান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহু মানবের আসনটি তাহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে আজ পুষ্পমাল্য বিতরণ করিবে। তাহার পর যে ভাগ্যবান এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্ব্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্টই আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোষাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়াছিল। দেখিলে মনে হয়; আজ সংসারে তাহাদের কিছুই নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল এবং যে কয়জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষণেক পরে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া কয়জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বীরত্ব, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্দ্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই যখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক আরক্তদেহে, কম্পিত-মুখে, ক্লেদ-সিক্ত হস্তে তাহার শিরে জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পার্শ্বে গাড়িতে স্থান দিল এবং সজল-কণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছে, অত বড় বড় উঁচু প্রাচীর কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়।

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল, কিন্তু এই অসমসাহসী বলিষ্ঠ বীরের সহিত মা-শোয়ে মনে মনে তাহার সেই দুর্ব্বল, কোমল ও সর্ব্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো-থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইল জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহু লোক ভিড় করিয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

৫

সান্ধ্য-ভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল, কাল সন্ধ্যাটা আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেষ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, তাহাই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উল্টা রকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে-সকল ছোটখাটো কাজগুলি সে করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল—একবার বা-থিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমন অবকাশ নাই।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, আজ আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাইবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে, একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে, কিন্তু মুখ খুলিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

মাটীতে পা দিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্ত ধন্তবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাহার রাজদ্বারে সম্ভ্রমের কথা এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়-সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্ত তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্য্যের আলোচনা শুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য করিয়া বারংবার তাহার রূপ-যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না।

আলাপ শেষ হইলে পো-থিন যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে, তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন-কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন এবং আজও অনেক হাসি-তামাসা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্য-গীতের সঙ্গে যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে-সকল যেন কত যুগের পুরোনো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। এমনি শুষ্ক, এমনি নীরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যানপ্রান্তের একটা নির্জন গৃহে এখন নির্ব্বিঘ্নে আছে—আজিকার এতবড় মাতা-মাতির লেশমাত্রও তাহার কানে যাইবার এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

৬

চিরদিনের অভ্যাস প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল।

প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা 'এসো' বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল, কিন্তু কাছে বসিয়াও আরও একজনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্ম্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকী কত?

অনেক।

তবে এই দুদিন ধরিয়া কি করিলে?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জলিয়া উঠিয়া হাত-বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকালবেলা চুরুট খাই না—চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই আমি ছোটলোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্ত-কণ্ঠে কহিল, হয়ত তোমার কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে, মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—তুমি যেমন নীচ তেমনি হিংসুক, তাই আমাকে বিনা দোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর হইতে আমি চিরকালের জন্যে সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি সংযত-স্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংসুক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃপথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃপথে কি করিয়া গেলাম?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্বাদ রাখিয়া গিয়াছেন, সন্তানের জন্য অভিশাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ যে-কোন কারণেই তাহাকে এমন মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালবাসা একদিনেই যে এতবড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার কি বিশেষ প্রয়োজন আছে?

না, প্রয়োজন এমন—

তা হইলে আমার সময় হইবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত-নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠহাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিস দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

৭

শিশুকাল হইতে যে দুইজনের কখনও একমুহূর্তের জন্ম বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিক কাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালোই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কন্যার উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেকদিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবলমাত্র গম্ভীর ও সংযত চিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া, অনেক ভাঙা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে। দেখিলে দেখিতে পাইত, এতদিন সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখী বসিয়া আছে—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বাহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে চাহিল না। কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি-উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতেই গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এতদিন তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত, সেও মানুষ—সেও ঈর্ষার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্য্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্ত্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয়ত বা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে, কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্ত শয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক্ সে-সব।

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল কিছুই না—কিছুই না। তাহার কোন কাজই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত মিথ্যা, ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না—ধরা দিতেও চাহে না। ওই কেমন দুর্ব্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গিয়াছে—কোথাকার কোন ঝঞ্ঝাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু, তথাপি জন্মতিথি-উৎসবের বিরাট আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্ব্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কানা-ঘুষা চলিতেছিল যে একদিন এই লোকটাই এ-বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিবে—এবং বোধ হয়, সেদিন বড় বেশী দূরেও নয়।

গ্রামের নর-নারীতে বাড়ি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিদিকেই আনন্দ কলরব। শুধু যাহার জন্ত এই-সব, সেই মানুষটিই বিমনা—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো প্রায় চোখে পড়ে না—পড়িল কেবল বাটীর দুই-একজন সাবেকদিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধহয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্ব্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে লোক নাই, সে মালা নাই, সে আশীর্ব্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোটমা, কই তাহাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ম্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অন্ত গ্রামে—এই মনান্তরের খবর সে জানিত না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে, তাহার বাড়ি যাও—আমার এখানে কেন?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁহাকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের দুজনকেই আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচরে রহিল না। সেই অবধি এক

প্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা গলার অস্ফুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল ; কিন্তু চক্ষের নিমেষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোটমা, যাহাই হৌক, তোমার অতিথি। একটা কথাও কি কহিতে নাই।

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই ?

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আরও লোক আছে, তাঁহারা কথা বলিতে পারেন।

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল! নইলে তুমিও ত তাঁহাকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে!

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন-দুই পরে টের পাইল ; আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূল-কিনরা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, জাতকের সেই গোপার চিত্রটা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে, একমাসের অধিক কাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজ-দরবারে যাইবে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র-সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না ; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধ-স্বরে বলিলেন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন ?

তার কারণ এ-মুখ আমি চিনি। মানুষের চেহারা দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান করা হয়। এ-কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার মুখ দেখিবেন না। এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফারিত ব্যাকুল চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে ধীরে একটা কুয়াসার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল; আর তাহার বুঝিতে বাকী নাই, এতদিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে যে সৌন্দর্য্য যে মাধুর্য্য বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে তাহাকে অহর্নিশ ছলনা করিয়াছে—সে জাতকের গোপা নহে, সে তাহারই মা-শোয়ে।

চোখ মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান! আমাকে এমন করিয়া বিড়ম্বিত করিলে—তোমার আমি কি করিয়াছিলাম!

৯

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও কামনা করেন মা-শোয়ে, আমি ত মানুষ।

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বোধ হয় তবে দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শুনিয়াছি, দরবারে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে—আমার একটা কাজ করাইয়া দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

একজনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিতে পারি না। কোন দলিল নাই। আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা হাসিল।

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাতটা

চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে দিন একটি উপায় করিয়া আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব করিতে চাহি না।

পো-খিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

এই ঋণটা চিরদিন এত তুচ্ছ, এত অসম্ভব, এতই হাসির কথা ছিল যে, এ-সম্বন্ধে কেহ কখনো চিন্তা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু রাজকর্মচারীর মুখের আশায় মা-শোয়ের সমস্ত দেহ এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; সে দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিতে লাগিল, আমি কিছুই ছাড়িয়া দিব না—একটা কড়ি পর্য্যন্ত না। জোঁক যেমন করিয়া রক্ত শুষিয়া লয়, ঠিক তেমনি করিয়া। আজই —এখন হয় না?

এ-বিষয়ে এই লোকটাকে অধিক বলা বাহুল্য। ইহা তাহার আশার অতীত। সে ভিতরের আনন্দ ও আগ্রহ কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, রাজার আইন অন্ততঃ সাত দিনের সময় চায়। এ সময়টুকু কোনরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তাহার পরে যেমন করিয়া খুশি রক্ত শুষিবে, আমি আপত্তি করিব না।

সেই ভাল! কিন্তু এখন আপনি যান। এই বলিয়া সে একপ্রকার যেন ছুটিয়া পলাইল।

এই দুর্ব্বোধ মেয়েটির প্রতি লোকটির লোভের অবধি ছিল না। তাই অনেক অবহেলা সে নিঃশব্দে পরিপাক করিত, আজিও করিল। বরঞ্চ গৃহে ফিরিবার পথে আজ তাহার পুলকিত চিত্ত পুনঃ পুনঃ এই কথাটাই আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, আর ভয় নাই—তাহার সফলতার পথ নিষ্কণ্টক হইতে আর বোধ হয় অধিক বিলম্ব হইবে না। সে কথা সত্য। কিন্তু কত শীঘ্র এবং কত বড় বিস্ময় যে ভগবান তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এ আজ কল্পনা করাও তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

১০

ঋণের দাবীর চিঠি আসিল। কাগজখানা হাতে করিয়া বা-থিন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই জিনিসটি সে আশা করে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যও হইল না। সময় অল্প, শীঘ্র একটা কিছু করা চাই।

একদিন না-কি মা-শোয়ে রাগের উপর তাহার পিতার অপব্যয়ের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিল, তাহার এ অপরাধ সে বিস্মৃতও হয় নাই, ক্ষমাও করে নাই। তাই সে

সময়-ভিক্ষার নাম করিয়া আর তাঁহাকে অপমান করিবার কল্পনাও করিল না। শুধু চিন্তা এই যে, তাহার যাহা কিছু আছে, সব দিয়াও পিতাকে ঋণমুক্ত করা যাইবে কি না। গ্রামের মধ্যেই একজন ধনী মহাজন ছিল। পরদিন সকালেই সে তাহার কাছে গিয়া গোপনে সর্ব্বস্ব বিক্রী করিবার প্রস্তাব করিল। দেখা গেল, যাহা তিনি দিতে চাহেন, তাহাই যথেষ্ট। টাকাটা সে সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিল, কিন্তু একজনের অকারণ হৃদয়হীনতা যে তাহার সমস্ত দেহ-মনের উপর অজ্ঞাতসারে কতবড় আঘাত দিয়াছিল, ইহা সে জানিল তখন, যখন সে জ্বরে পড়িল।

কোথা দিয়া যে দিন-রাত্রি কাটিল, তাহার খেয়াল রহিল না। জ্ঞান হইলে উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেইদিনই তাহার মেয়াদের শেষ দিন।

আজ শেষ দিন। আপনার নিভৃত কক্ষে বসিয়া মা-শোয়ে কল্পনার জাল বুনিতেছিল। তাহার নিজের অহঙ্কার অনুক্ষণ ঘা খাইয়া খাইয়া আর একজনের অহঙ্কারকে একেবারে অভ্রভেদী উচ্চ করিয়া দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটির সঙ্গে মিশাইবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নীচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নীচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কানাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা, সে আজ এই দেখিল।

বা-থিন প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাতদিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের পীড়িত শুষ্ক মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকা আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পাইলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাকসটায় টাকা আছে, কাহাকেও গনিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত

বিলম্ব হইবে। বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না।

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গো-যান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, ব্যাকুল হইয়া একেবারে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল, পেগুতে কে যাইবে? গাড়ি কাহার? কোথায় এত টাকা পাইলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুক্নো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার—

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ—এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাকাসে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, ব'সো। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে।

বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ দেখিয়া কাহাকেও শীঘ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশিদিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিস তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর; মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও-সব কথা আর একদিন শুনিব। টাকা পাইলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ-কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো।

টাকা পাইলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যই বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার হাত ধরিল।

এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা একমুহূর্তেই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই। আছে শুধু বিরাট স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোওয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মান্দালয়ের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বাল্যকালের গল্প

বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী

ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেচে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাংলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। তারও আগে, অর্থাৎ ঠাকুরমাদের যুগে, শুনেচি, লোক-চলাচলের প্রায় কোন পথই সন্ধ্যার পরে পথিকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই দুর্বৃত্তরা ছিল যেমন লোভী তেমনি নির্দ্দয়। দল বেঁধে পথের ধারে ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো, হাতে থাকতো বড় বড় লাঠি এবং কাঁচা বাঁশের ভারি ছোট-ছোট খেঁটে, তাকে বলতো পাব্‌ড়া! অব্যর্থ তার সন্ধান। অতর্কিতে পায়ে চোট খেয়ে সে যখন পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়তো, তখন সকলে ছুটে এসে দুম্‌-দাম্‌ করে লাঠি মেরে তার জীবন শেষ করতো। এর ভাবা-চিন্তা বাচবিচার নেই! এদের হাতে প্রাণ দিয়েচে এমন অনেক লোককে আমি নিজের চোখেই দেখেচি।

ছেলেবেলায় আমার মাছ ধরার বাতিক ছিল খুব বেশি। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়, —পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হতেই ছিপ-হাতে নদীতে গিয়ে হাজির হতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা-মজা ক্ষুদ্র নদী, কোথাও কোমরের বেশি জল নেই, সমস্তই শৈবালে সমাচ্ছন্ন—তার মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁক, সেখানেই এই সব ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াত। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেইগুলি ধরাই ছিল আমার বড় আনন্দ। একলা নদীর তীরে মাছের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন দেখেচি কাদায় শ্যাওলায় মাখামাখি মানুষের মৃতদেহ। কোনটার মাথা থেকে হয়তো তখনো রক্ত ঝরে জলটা রাঙা হয়ে আছে। নদীর দুই তীরেই ঘন বন-জঙ্গল, কি জানি কোথাকার মানুষ, কোথা থেকে ঠ্যাঙাড়েরা মেরে এনে এই জনবিরল নদীর পাঁকে পুতে দিত। এর জন্য কখনো দেখিনি পুলিশ আসতে, কখনো দেখিনি গ্রামের কেউ গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেচে। এ ঝঞ্ঝাট কে করে! তারা চিরদিন শুনে আসচে পুলিশ ঘাঁটাতে নেই,—তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়াও বিপজ্জনক। বাঘের মুখে পড়েও দৈবাৎ বাঁচা যায়, কিন্তু ওদের হাতে কদাচ নয়। কাজেই এ দৃশ্য যদি কারও চোখে পড়তো, সে চোখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে অন্যত্র সরে যেত। তারপরে রাত্রি এলে, শিয়ালের দল বেরিয়ে মহা-সমারোহে ভোজনাদি শেষ করে নদীর জলে আঁচিয়ে মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে যেত, মড়ার চিহ্নমাত্র থাকত না।

একদিন আমার নিজেরও হয়তো ঐ দশা ঘটত, কিন্তু ঘটতে পেলে না। সেই গল্পটা বলি।

বছর-পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী

ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেচে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাংলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। তারও আগে, অর্থাৎ ঠাকুরমাদের যুগে, শুনেচি, লোক-চলাচলের প্রায় কোন পথই সন্ধ্যার পরে পথিকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই দুর্বৃত্তরা ছিল যেমন লোভী তেমনি নির্দ্দয়। দল বেঁধে পথের ধারে ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো, হাতে থাকতো বড় বড় লাঠি এবং কাঁচা বাঁশের ভারি ছোট-ছোট খেটে, তাকে বলতো পাব্‌ড়া! অব্যর্থ তার সন্ধান। অতর্কিতে পায়ে চোট খেয়ে সে যখন পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়তো, তখন সকলে ছুটে এসে দুম্‌-দাম্‌ করে লাঠি মেরে তার জীবন শেষ করতো। এর ভাবা-চিন্তা বাচবিচার নেই! এদের হাতে প্রাণ দিয়েচে এমন অনেক লোককে আমি নিজের চোখেই দেখেচি।

ছেলেবেলায় আমার মাছ ধরার বাতিক ছিল খুব বেশি। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়,—পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হতেই ছিপ-হাতে নদীতে গিয়ে হাজির হতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা-মজা ক্ষুদ্র নদী, কোথাও কোমরের বেশি জল নেই, সমস্তই শৈবালে সমাচ্ছন্ন—তার মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁক, সেখানেই এই সব ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াত। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেইগুলি ধরাই ছিল আমার বড় আনন্দ। একলা নদীর তীরে মাছের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন দেখেচি কাদায় শ্যাওলায় মাখামাখি মানুষের মৃতদেহ। কোনটার মাথা থেকে হয়তো তখনো রক্ত ঝরে জলটা রাঙা হয়ে আছে। নদীর দুই তীরেই ঘন বন-জঙ্গল, কি জানি কোথাকার মানুষ, কোথা থেকে ঠ্যাঙাড়েরা মেরে এনে এই জনবিরল নদীর পাঁকে পুতে দিত। এর জন্য কখনো দেখিনি পুলিশ আসতে, কখনো দেখিনি গ্রামের কেউ গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেচে। এ ঝঞ্ঝাট কে করে! তারা চিরদিন শুনে আসচে পুলিশ ঘাঁটাতে নেই,—তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়াও বিপজ্জনক। বাঘের মুখে পড়েও দৈবাৎ বাঁচা যায়, কিন্তু ওদের হাতে কদাচ নয়। কাজেই এ দৃশ্য যদি কারও চোখে পড়তো, সে চোখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে অন্যত্র সরে যেত। তারপরে রাত্রি এলে, শিয়ালের দল বেরিয়ে মহা-সমারোহে ভোজনাদি শেষ করে নদীর জলে আঁচিয়ে মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে যেত, মড়ার চিহ্নমাত্র থাকত না।

একদিন আমার নিজেরও হয়তো ঐ দশা ঘটত, কিন্তু ঘটতে পেলে না। সেই গল্পটা বলি।

আমার বয়স তখন বছর-বারো। সকালে ছুটির দিনে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে ঘুড়ি তৈরী করচি, কানে গেল ও-পাড়ার নয়ন বাগদীর গলা। সে আমার ঠাকুরমাকে বলচে, গোটা-পাঁচেক টাকা দাও না দিদিঠাকরুণ, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে শোধ দেব।

ঠাকুরমা নয়নচাঁদকে বড় ভালবাসতেন, জিজ্ঞাসা করলেন, হঠাৎ টাকার কি দরকার হ'লো, নয়ন?

সে বললে, একটি ভাল গরু আনব, দিদি। বসন্তপুরে পিসিমার বাড়ি, পিসতুত ভাই বলে পাঠিয়েচে, চার-পাঁচটি গরু সে রাখতে পারচে না, আমাকে একটি দেবে। কিছু নেবে না জানি, তবু গোটা-পাঁচেক টাকা সঙ্গে রাখা ভালো।

ঠাকুরমা আর কিছু না বলে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিলেন, সে প্রণাম করে চলে গেল।

আমি শুনেছিলাম বসন্তপুরে ভালো ছিপ পাওয়া যায়, সুতরাং নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিলাম। মাইল-দুই কাঁচা পথ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বসন্তপুরে যেতে হয়। মাইল-খানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে আমি। ভয়ানক রাগ করলে, বললে আমার জন্য সে দশখানা ছিপ কেটে আনবে; তবু কোনমতে আমি ফিরে যেতে রাজি হলাম না। অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু সে শুনলে না। আমাকে ধরে জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কান্নাকাটিতে ঠাকুরমা একটু নরম হলেন, কিন্তু নয়নচাঁদ কিছুতে সম্মত হ'লো না। বললে, দিদি, যেতে আসতে কোশ-আষ্টেক পথ বৈ নয়, জ্যোছনা রাত—স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পথটা ভালো নয়, ভয় আছে। বেলাবেলি যদি ফিরতে না পারি, তখন একলা গরু সামলাবো, না ছেলে সামলাবো, না নিজেকে সামলাবো—কি করব বল ত, দিদি।

পথে ভয়টা যে কি তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। ঠাকুরমা একেবারে বেঁকে দাঁড়ালেন, বললেন, না, কখনো না। যদি পালিয়ে যাস্, তোর ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে চিঠি লিখে পাঠাবো, তিনি পঞ্চাশ ঘা বেত দেবেন।

নিরুপায় হয়ে আমি তখন অন্য ফন্দি আটলাম। নয়ন চলে গেলে, পুকুরে নেয়ে আসি বলে তেল মেখে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে ধারে বন-জঙ্গল ও আম-কাঁঠাল বাগানের ভিতর দিয়ে মাইল দুই-আড়াই ছুটতে ছুটতে যেখানটায় আমাদের কাঁচা রাস্তা এসে পাকা রাস্তায় মিলেচে সেখানটায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট-দশেক পরে দেখি নয়ন আসচে। সে আমাকে দেখে প্রথম খুব বকলে, তারপর আমি কি করে এসেচি শুনে হেসে ফেললে। বললে, চলো ঠাকুর, যা অদেষ্টে আছে তাই হবে। এতদূর এসে আর তো ফিরতে পারিনে।

নয়নদা সাতগাঁর একটা দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কি বাতাসা কিনে আমার কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিলে, খেতে খেতে প্রায় দুপুরবেলা দু'জনে বসন্তপুরে এসে ওর পিসির বাড়িতে পৌঁছলাম। পিসির অবস্থা স্বচ্ছল। বাড়ির নীচেই কুন্তী নদী; ছোট, কিন্তু জল আছে, জোয়ার ভাটা খেলে। স্নান করে এলাম, ওদের বড়-বৌ কলাপাতায় চিড়ে গুড় দুধ কলা দিয়ে ফলারের যোগাড় করে দিলে। খাওয়া হলে নয়নের পিসি বললে, ছেলেমানুষ, চার-পাঁচ কোশ পথ হেঁটে এসেচে, আবার যেতে হবে। এখন শুয়ে একটু ঘুমুক, তার পরে বেলা পড়লে যাবে। তার ছোট ছেলে ছিপ কেটে আনতে গেল।

নয়ন আর আমি দু'জনেই পথ হেঁটে এমনি ক্লান্ত হয়েছিলাম যে, আমাদের ঘুম যখন ভাঙলো তখন চারটে বেজে গেছে। বেলার দিকে চেয়ে নয়নদা একটু চিন্তিত হ'লো, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। মিনিট-দশেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় সে প্রণামী বলে পিসিকে টাকা পাঁচটি দিতে গেল, কিন্তু তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তোর ছেলেমেয়েদের বাতাসা কিনে দিস্।

আমার কাঁধে ছিপের তাড়া, নয়নের বাঁ হাতে গরুর দড়ি, ডান হাতে চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠি। কিন্তু গরু নিয়ে দ্রুত চলা যায় না, কোশ-দুই না যেতেই সন্ধ্যা উত্তরে আকাশে চাঁদ দেখা দিলে। রাস্তার দু'ধারেই বড় বড় অশথ বট পাকুড় গাছ ডালে ডালে মাথায় মাথায় ঠেকে এক হয়ে আছে। পথ অন্ধকার, শুধু কেবল পাতার ফাঁকে জ্যোৎস্নার ম্লান আলো স্থানে স্থানে পথের উপর এসে পড়েচে। নয়ন বললে, দাদাভাই, তুমি আমার বাঁ দিকে এসে তোমার বাঁ হাতে গরুর দড়িটা ধরো, আমি থাকি তোমার ডাইনে।

কেন নয়নদা?

না, এমনি। চলো যাই।

আমি ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম নয়নদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ।

ক্রমশঃ পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'পাশের বন-জঙ্গল আরও ঘন হয়ে এলো, বহু প্রাচীন সুবৃহৎ পাকুড়গাছের সারি মাথার উপরে পাতার অবিচ্ছিন্ন আবরণে কোথাও ফাঁক রাখেনি যে একটু চাঁদের আলো পড়ে। সন্ধ্যার কৃষাণ-বালকেরা এই পথে গরুর পাল বাড়ি নিয়ে গেছে, তাদের খুরের ধুলো এখনও নাকে-মুখে ঢুকচে, এমনি সময়ে সুমুখে হাত পঞ্চাশ-ষাট দূরে বিদীর্ণ কণ্ঠের ডাক এলো—বাবা গো, মেরে ফেললে গো। কে কোথায় আছো রক্ষা করো! সঙ্গে সঙ্গে লাঠির ধুপ-ধাপ্ দুম-দাম্ শব্দ। তার পরে সমস্ত নীরব।

নয়নদা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, যাঃ—শেষ হয়ে গেল।

কি শেষ হ'লো নয়নদা?

একটা মানুষ। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলে, তার পরে বললে, চলো দাদাভাই, আমরা একটু সাবধানে যাই।

গরু বাঁয়ে, নয়ন-দা ডাইনে, আমি উভয়ের মাঝখানে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসচি, দেখেও আসচি মাঝে মাঝে, সুতরাং বালক হলেও বুঝলাম সমস্ত। 'কে কোথায় আছো রক্ষে করো!' তখনও দু'কানে বাজছে—ভয়ে ভয়ে বললাম, নয়নদা, ওরা যে সব সামনে দাঁড়িয়ে, আমরা যাবো কি করে? মারে যদি—

না, দাদাভাই, আমি থাকতে মারবে না। ওরা ঠ্যাঙাড়ে কি-না—আমাদের দেখলেই পালাবে। ওরা ভারি ভীতু।

গরু, আমি ও নয়নচাঁদ তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ভয়ে আমার পা কাঁপছে—নিশ্বাস ফেলতে পারিনে এমনি অবস্থা। গাছের ছায়া আর ধুলোর আঁধারে এতক্ষণ দেখা যায়নি কিছুই, পনেরো-বিশ হাত এগিয়ে আসতেই চোখে পড়লো জন পাঁচ-ছয় লোক যেন ছুটে গিয়ে পাকুড় গাছের আড়ালে লুকোলো। নয়নদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দিলে—সে কি ভয়ানক গলা—বললে, খবরদার বলচি তোদের। বামুনের ছেলে সঙ্গে আছে—পাব্ড়া ছুড়ে মারলে তোদের একটাকেও জ্যান্ত রাখবো না—এই সাবধান করে দিলাম।

কেউ জবাব দিলে না। আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে দেখি একটা লোক উপুড় হয়ে রাস্তার ধুলোয় পড়ে। অল্প-স্বল্প চাঁদের আলো তার গায়ে লেগেছে, নয়নদা ঝুঁকে দেখে হায় হায় করে উঠলো! তার নাক দিয়ে কান দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়চে, শুধু পা দুটো তখনও থর থর করে কাঁপচে। কাঁধের ভিক্ষের ঝুলিটি তখনও কাঁধে, কিন্তু চালগুলি ছড়িয়ে পড়েচে ধুলোয়। হাতের একতারাটি লাঠির ঘায়ে ভেঙে-চুরে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে।

নয়নদা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে, ওরে নারকী, নরকের কীট। তোরা মিছিমিছি একজন বৈষ্ণবের প্রাণ নিলি? এ তোরা করেচিস্ কি! তার ক্ষণেক পূর্ব্বের ভীষণ কণ্ঠ সহসা যেন বেদনায় ভরে গেল।

কিন্তু ওদিক থেকে সাড়া এলো না। নয়নের এ দুঃখের প্রধান হেতু সে নিজে পরম বৈষ্ণব। তার গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা, নাকে তিলক, সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ ছাপ-ছোপ। বাড়িতে তার একটি ছোট ঠাকুর-ঘর আছে, সেখানে মহাপ্রভুর শ্রীপট প্রতিষ্ঠিত। সহস্রবার ইষ্ট-নাম জপ না করে সে জলগ্রহণ করে না। ছেলেবেলায় পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় হয়েছিল, এখন সে নিজের চেষ্টায় বড় অক্ষরে ছাপা বই অনায়াসে পড়তে পারে! প্রদীপের আলোকে ঠাকুর-ঘরে বসে বটতলায় প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থ প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সে সুর করে পড়ে। মাংস সে খায় না, সঙ্কল্প আছে, ভবিষ্যতে একদিন মাছ পর্য্যন্ত ছেড়ে দেবে।

তাঁর বৈষ্ণব হবার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে, এখানে সেটুকু বলে রাখি। এখন তার বয়স চল্লিশের কাছে, কিন্তু যখন পঁচিশ-ত্রিশ ছিল, তখন ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে সে একবার বছর-খানেক হাজত-বাস করে। ঠাকুরমার এক পিসতুতো ভাই ছিলেন জেলার বড় উকিল, তাঁকে দিয়ে বহু তদ্বির ও অর্থব্যয় করে ঠাকুরমা ওকে খালাস করেন। হাজত থেকে বেরিয়েই সে সোজা নবদ্বীপ চলে যায় এবং তথায় কোন এক গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, তুলসীর মালা ধারণ করে সে দেশে ফিরে আসে। সেদিন থেকে সে গোঁড়া বৈষ্ণব। নয়ন যখন তখন এসে আমার ঠাকুরমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে যেত। ব্রাহ্মণের বিধবা, স্পর্শ করার অধিকার নেই, যে-কোন একটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখত, তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে দিলেই, সেই পাতাটি সে মাথায় বারবার বুলিয়ে বলত, দিদিঠাকরুণ, আশীর্ব্বাদ করো যেন এবার মরে সৎ জাত হয়ে জন্মাই, যেন হাত দিয়ে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখতে পারি। ঠাকুরমা সস্নেহে হেসে বলতেন, নয়ন, আমার আশীর্ব্বাদে তুই এবার বামুন হয়ে জন্মাবি।

নয়নের চোখ সজল হয়ে উঠত, বলতো, অত আশা করিনে দিদি, পাপের আমার শেষ নেই, সে-কথা আর কেউ না জানুক তুমি জানো। তোমার কাছে গোপন করিনি।

ঠাকুরমা বলতেন, সব পাপ তোর ক্ষয়ে গেছে নয়ন। তোর মত ভক্তিমান, ভগবৎ-বিশ্বাসী ক'জন সংসারে আছে! এ-পথ কখনো ছাড়িসনে রে, পরকালের ভাবনা নেই তোর।

নয়ন চোখ মুছতে মুছতে চলে যেত, ঠাকুরমা হেঁকে বলতেন, কাল ছুটি প্রসাদ খেয়ে যাস নয়ন, ভুলিসনে যেন।

এ-সব আমি নিজের চোখে কতবার দেখেচি। সুতরাং যে-বৈষ্ণবের সে প্রাণপণে সেবা করে, তার হত্যায় ও যে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বললে,—নিরীহ বোষ্টম ভিক্ষে করে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরছিল, ওর কাছে কি পাবি যে মেরে ফেললি বল তো? দু'গণ্ডা চার গণ্ডার বেশি ত নয়। ইচ্ছে করে তোদেরও এমনি ঠেঙিয়ে মারি।

এবারে গাছের আড়াল থেকে জবাব এলো—দু'গণ্ডা চার গণ্ডাই বা দেয় কে রে? তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এ-যাত্রা বেঁচে গেলি। ধর্ম্ম-কথা শোনাতে হবে না —পালা—পালা—

কথা তার শেষ না হতেই নয়ন যেন বাঘের মত গর্জ্জে উঠল—বটে রে হারাম-জাদা! পালাবো? তোদের ভয়ে? তখন ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা বার করে এ-হাতের টাকা ঝন্ ঝন্ করে ও হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে,—এতগুলো টাকায় মায়া ছাড়িসনে বলে দিলাম। পারিস, সবাই একসঙ্গে এসে নিয়ে যা। কিন্তু খুব সাবধান

করে দিই—আমার বাবাঠাকুরের গায়ে যদি কুটোর আঁচড় লাগে তো তোদের সব ক'টাকে জন্তুর মতো রাস্তায় শুইয়ে রেখে তবে ঘরে যাবো। শেতলার নয়ন ছাড়ি আমি—আর কেউ নয়। বলি, নাম শুনেছিস্, না এমনিই লাঠি হাতে ভিখিরী মেরে বেড়াস্? হারামজাদা শিয়াল-কুকুরের বাচ্চারা।

গাছের তলা একেবারে স্তব্ধ। মিনিট-দুই স্থির থেকে নয়ন পুনরায় অধিকতর কটু ভাষায় হাঁক দিলে—কি রে আসবি, না টাকাগুলো ট্যাঁকে নিয়েই ঘরে যাবো?

কোন জবাব নেই। পথের উপরে দু-তিন গাছা পাব্ড়া পড়ে ছিলো, নয়ন একে একে কুড়িয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে বললো,—চলো দাদা, এবার ঘরে যাই। রাত হয়ে এলো, তোমার ঠাকুরমা হয়ত কত ভাবচেন। ওরা সব শিয়াল-কুকুরের ছানা বই ত নয়, মানুষের কাছে আসবে কেন? তুমি একগাছা ছিপ-হাতে তেড়ে গেলেও সবাই ছুটে পালাবে দাদাভাই।

ইতিমধ্যেই আমার ভয় ঘুচে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, বললাম—যাবো তেড়ে নয়নদা।

নয়ন হেসে ফেলল। বললে,—থাক্‌গে দাদা, কাজ নেই! কামড়ে দিতে পারে।

আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। নয়নের মুখে কথা নেই, আমার একটা প্রশ্নেরও সে হাঁ-না ছাড়া জবাব দেয় না। খানিকটা এগিয়েই একটা বড় গাছতলায় অন্ধকার ছায়ায় এসে সে থমকে দাঁড়াল, বললে,—না দাদাভাই, চোখে দেখে ছেড়ে যাওয়া হবে না। বামুন-বোষ্টমের প্রাণ নেওয়ার শোধ আমি দেবো।

কি করে শোধ দেবে নয়নদা?

এক ব্যাটাকেও কি ধরতে পারবো না? তখন দু'জনে মিলে তারেও ঠেঙিয়ে মারবো!

ঠেঙিয়ে মারার আনন্দে আমি প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠলাম। একটা নতুন ধরণের খেলার মত। ওদের সম্বন্ধে কত ভয়ঙ্কর কথাই না শুনেছিলাম; কিন্তু সব মিছে। নয়নদা যেতে দিলে না, নইলে আমিই তেড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই একটাকে ধরে ফেলতে পারতাম! বললাম,—তুমি বেশ করে এক ব্যাটাকে ধরে থেকো, আমি একাই ঠেঙিয়ে মারবো! কিন্তু আমার ছিপ যদি ভেঙে যায়?

নয়ন পুনরায় হেসে বললে,—ছিপের ঘায়ে মরবে না দাদা, এই লাঠিটা নাও, বলে সে সংগৃহীত পাব্ড়ার একগাছা আমার হাতে দিয়ে বললে—শক্ত নিয়ে এইখানে একটু দাঁড়াও দাদাভাই, আমি এখুনি দু'এক ব্যাটাকে ধরে আনচি। কিন্তু চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে ভয় পেয়ো না যেন।

নাঃ, ভয় কি! এই যে হাতে লাঠি রইল!

নয়ন বাকী পাব্ড়া দুটো কোলে চেপে ধরলে, তার বড় লাঠিটা রইল ডান হাতে, তার পর রাস্তা ছেড়ে বনের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলল সেইদিকে।

ঠ্যাঙাড়েরা ঠাউরেছিল আমরা চলে গেছি। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে সেই মৃত ভিখারীর টাঁক হাতড়ে, ঝুলি ঝেড়ে তারা খুঁজে দেখছিল কি আছে।

হঠাৎ একজনের চোখে পড়লো অনতিদূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নয়ন। সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—কে দাঁড়িয়ে ওখানে ?

—আমি নয়ন ছাত্তি। অমনি দাঁড়িয়ে থাক্। ছুটে পালাবি কি মরবি।

কিন্তু, কথা শেষ না হতেই অনেকগুলো ছুটোছুটি শুনতে পেলাম এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অস্ফুট আর্তস্বরে কেঁদে উঠে কে যেন হুড়মুড় করে একটা ঝোপের উপর পড়ে গেল।

নয়ন চেঁচিয়ে বললে—এক ব্যাটারে পেয়েচি দাদাভাই, আরগুলো পালালো।

শুভ-সংবাদে সেইখানে দাঁড়িয়েই লাফাতে লাগলাম। আমি চেঁচিয়ে বললাম,—ওকে ধরে আনো নয়নদা, আমি ঠেঙিয়ে মারব। তুমি মেরে ফেলো না যেন।

—না দাদা, তুমিই মারো।

আবার একটা করুণ ধ্বনি কানে এলো, বোধ করি নয়নের লাঠির খোঁচার ফল। মিনিট-দুই পরে দেখি একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসচে, তার পিছনে নয়নচাঁদ। কাছে এসে সে হাঁউ-মাউ করে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলে। নয়ন টান মেরে তাকে তুলে দাঁড় করালে। এখন তার মূর্ত্তি দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে তার কালি মাখানো, তাতে সাদা সাদা চূণের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা তেমনি লম্বা, পরণে শতছিন্ন ন্যাকড়া। তখনও কাঁদছিল। তার গালে নয়ন প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে,—চুপ কর্ হারামজাদা! যা জিজ্ঞাসা করি সত্য জবাব দে। ক'জন ছিলি ? তাদের কি নাম, কোথায় ঘর বল্ ?

লোকটা প্রথমে বলতে চায় না, কিন্তু পিঠে একটা গুঁতো খেয়ে সঙ্গীদের নাম-ধাম গড় গড় করে বলে গেল।

নয়ন বললে,—মনে থাকবে, ভুলবো না। এখন বল্, বোষ্টমঠাকুর পড়ে গেলে নিজে তুই ক'ঘা বাড়ি দিয়েছিলি ?

পাঁচ-সাত ঘা হবে বোধ হয়।

নয়নচাঁদ দাঁত কড়-মড় করে বললে, আচ্ছা, পাঁচ-সাত ঘা-ই সই। এবার ঠিক তেমনি করে শো, যেমন করে বোষ্টম ঠাকুরকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। দাদাভাই, এগিয়ে এসো,—ঐ খেঁটে দিয়ে পাঁচ-সাত ঘায়েই সাবাড় করা চাই কিন্তু। দেখবো কেমন হাতের জোর। তুই ব্যাটা দেরি করচিস্ কেন ? শুয়ে পড়—বলেই তার কান ধরে টেনে রাস্তায় বসালে। এবং নিজে সে শোবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড গোটা দুই-তিন লাথি পিঠে মেরে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিলে। বললে—দেরি ক'রো না দাদা, তাক করে মারো। দু-তিন ঘার বেশি লাগবে না।

নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে, চোখ-মুখ যেন আর কার! চেহারা দেখে গায়ে কাঁটা দিলে, নতুন খেলা শুরু করবো কি, ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগল, কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম,—আমি পারবো না, নয়ন-দা।

পারবে না? তবে আমি শেষ করে দিই।

না নয়নদা, না, মেরো না।

কিন্তু লোকটা লাথি খেয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আর নড়ে-চড়েনি। প্রাণ-ভিক্ষেও চায়নি—একটা কথা পর্য্যন্ত না।

বললাম, চলো, ওকে বেঁধে নিয়ে থানায় দিই গে।

শুনে নয়নদা যেন চমকে উঠল। থানায়? পুলিশের হাতে?

হাঁ। ও যেমন মানুষ মেরেচে, তারাও তেমনি ওকে ফাঁসি দিক। যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

নয়ন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে একটা লাঠির ঠেলা দিয়ে বললে,—ওরে ওঠ্।

কিন্তু কোন সাড়া নেই। নয়ন বললে, ব্যাটা মরে গেল নাকি? যে দুর্ব্বল সিং—দু'দিন হয়ত পেটে একমুঠো অন্নও নেই—আবার পথে এসেচে লোক ঠ্যাঙাতে। যা ব্যাটা, দূর হ। উঠে ঘরে যা।

সে কিন্তু তেমনি রইল পড়ে। নয়ন তখন হেঁট হয়ে তার নাকে হাত দিয়ে বললে, না মরেনি। অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান হলে আপনিই ঘরে যাবে। চল দাদা, আমরাও ঘরে যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল, ঠাকুরমা ভাবচে।

পথে যেতে যেতে বললাম, কেন ছেড়ে দিলে নয়নদা, পুলিশে ধরিয়ে দিলে বেশ হতো।

কেন দাদাভাই?

বেশ ফাঁসি হয়ে যেত। খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পড়ার বইয়ে লেখা আছে।

আছে না-কি দাদা?

আছে বই কি। চলো না, বাড়ি গিয়ে তোমাকে বই খুলে দেখিয়ে দেব।

নয়ন বিস্ময়ের ভান করে বললে, বলো কি দাদা, একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা?

হাঁ, তাই তো। সেই তো তার উচিত সাজা? আমরা পড়েচি যে।

নয়ন একটুখানি হেসে বললে,—কিন্তু সব উচিতই যে সংসারে হয় না, দাদাভাই।

কেন হয় না নয়নদা?

নয়ন হঠাৎ জবাব দিলে না, একটু ভেবে বললে,—বোধ হয় জগতে সবাই ধরিয়ে দিতে পারে না বলে।

কেন যে পারে না, কেন যে মানুষে এ অন্যায় করে, সে তত্ত্ব সেদিনও জানিনি, আজও না। তবু, এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে খানিকটা পথ চলার পরে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা নয়নদা, ওরা ফিরে গিয়ে আবার তো মানুষ মারবে?

নয়ন বললে, না দাদা, আর মারবে না। আমি বেঁচে থাকতে এ-কাজ ওরা আর কখনো করবে না।

জবাবটায় বেশ প্রসন্ন হতে পারলাম না। ফাঁসি হওয়াই ছিল আমার মনঃপুত। বললাম,—কিন্তু ওরা বেঁচে তো গেল। শাস্তি তো হলো না।

নয়ন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, বললে, কি জানি,—হবে হয়তো একদিন। পরক্ষণে সচেতন হয়ে বললে,—আমি তো এর উত্তর জানিনে দাদাভাই, তোমার ঠাকুরমা জানেন। তুমি বড় হলে তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা ক'রো।

আমার কিন্তু বড় হবার সবুর সইল না, বাড়িতে পা দিয়ে সমস্ত বিবরণ, শুধু হাত-পা কাঁপার অবান্তর কথাগুলো বাদ দিয়ে—অঙ্গ-প্রতঙ্গের যথোচিত সঞ্চালনে আমাদের ঠ্যাঙাড়ে-বিজয়-কাহিনী বর্ণনা করে ঠাকুরমাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম—গরু কিনতে গিয়ে আজ কি কাণ্ড ঘটেছিল। আগাগোড়া মন দিয়ে শুনে তিনি কেবল একটা নিশ্বাস ফেলে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

নয়ন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। আমার বলা শেষ হতে টাকা পাঁচটি ঠাকুরমার পায়ের কাছে রেখে বললে,—গরুটা এমনিই পেলাম। তোমার টাকা তোমার কাছেই ফিরে এল দিদি। না নিলেন পিসিমা, না নিলে তোমার মেজবৌয়ের ভাইদের দল পথে।

ঠাকুরমা একটু হেসে বললেন, দেখা হলে মেজবৌকে জানাব। কিন্তু ও টাকা আমিও নেবো না নয়ন। ও তোর ঠাকুরের ভোগে লাগাগে যা। কিন্তু একটা কথা আজ তোকে বলি নয়ন, এখনো তেমন বোষ্টম হতে তুই পারলিনে।

কেন দিদি?

তারা কি টাকা বাজিয়ে লোক ভোলায়? ধর্ যদি লোভ সামলাতে না পেরে ছুটেই আসত?

তা-হলে আরও গোটা পাঁচ-ছয় মরত। তাতে নয়নের পাপের ভরায় কতটুকুই বা ভার চাপত, দিদি?

ঠাকুরমা চুপ করে রইলেন। এ ইঙ্গিতের অর্থ জানেন তিনি, আর জানে নয়ন নিজে। কিন্তু সেও আর কিছু বললে না। দূর থেকে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে টাকা পাঁচটি মাথায় ঠেকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

লালু

আমাদের সহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে। তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে হতজ্ঞান হ'তো। কারও কলেরা হয়েচে শুনতে পেলে সে-পাড়ায় মানুষ থাকতো না। মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হ'তো। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না! গোপালখুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া পোড়ানো। কারও অসুখ শক্ত হয়ে উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে প্রত্যহ সংবাদ নিতেন। আশা নেই শুনলে খালি পায়ে গামছা কাঁধে তিনি ঘণ্টা-দুই পূর্ব্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আমরা জনকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন, ওরে, আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস্, ডাকলে যেন সাড়া পাই। রাজদ্বারে শ্মশানে চ—শাস্ত্রবাক্য মনে আছে ত?

—আজ্ঞে, আছে বই কি। আপনি ডাক দিলেই গামছা সমেত বেরিয়ে পড়ব।

—বেশ বেশ, এই ত চাই। এর চেয়ে পুণ্যকর্ম্ম সংসারে নেই।

আমাদের দলের মধ্যে ছিল লালুও একজন। ঠিকেদারির কাজে বাইরে না গেলে সে কখনো না বলত না?

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিষণ্ণ-মুখে খুড়ো এসে বললেন, বিষ্টু পণ্ডিতের পরিবারটা বুঝি রক্ষে পেলে না।

সবাই চমকে উঠলাম। অতি গরীব বিষ্টু ভট্‌চাযের কাছে বাঙলা ইস্কুলে আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। নিজে সে চিররুগ্ন এবং চিরদিন স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল। জগতে আপনার বলতে কেউ নেই,—তার মত নিরীহ অসহায় মানুষ সংসারে আমি দেখিনি।

রাত্রি আন্দাজ আটটা; দড়ির খাটে বিছানা-সমেত পণ্ডিত-গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠানে নামালাম। পণ্ডিতমশাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। সংসারে কোন-কিছুর সঙ্গে সে চাহনির তুলনা হয় না এবং সে একবার দেখলে সারা-জীবনে ভোলা যায় না।

মৃতদেহ তোলবার সময় পণ্ডিতমশাই আস্তে আস্তে বললেন—আমি সঙ্গে না গেলে মুখাগ্নি কি হবে?

কেউ কিছু বলবার আগে লালু বলে উঠল, ও-কাজটা আমি করব, পণ্ডিত-মশাই। আপনি আমাদের গুরু, সেই সম্পর্কে উনি আমাদের মা। আমরা সবাই

অনেকটা শ্মশানে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাঙলা-ইস্কুল মিনিট-পাঁচেকের পথ, হাঁপাতে হাঁপাতে সেটুকু আসতেও তাঁর আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগতো।

পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, নিয়ে যাবার সময় ওর মাথায় একটু সিঁদুর পরিয়ে দিবিনে, লালু?

নিশ্চয় দেব, পণ্ডিতমশাই, নিশ্চই দেব, বলে এক লাফে সে ঘরে ঢুকে কৌটা বারে করে আনলে এবং যত সিঁদুর ছিল সমস্তটা মাথায় ঢেলে দিলে।

'হরিবোল' দিয়ে আমরা গৃহ হতে গৃহিণীর মৃতদেহ চিরদিনের মত বার করে নিয়ে এলাম,—পণ্ডিতমশাই খোলা দোরের চৌকাঠে হাত দিয়ে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দূর, প্রায় ক্রোশ-তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ যেখানে-সেখানে ক্লান্তিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুক্লা দ্বাদশীর পরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় বালুময় বহুদূর-বিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠেছে, তার কোন-কোনটা লালুর পায়ের নীচে পর্যন্ত আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ছে। সহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, কি জানি সে কতক্ষণে পৌঁছাবে। আধ ক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমদের বাড়ি; আসার সময়ে আমরা তাদের হাঁক দিয়ে এসেছি, তাদের আসতেই বা না জানি কত দেরি।

সহসা গঙ্গার ওপারে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তুরে হাওয়ায় হু হু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপালখুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকচে না রে,—বৃষ্টি হতে পারে। এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না।

কাছে আশ্রয় কোথাও নেই, একটা বড় গাছ পর্যন্ত না। কতকটা দূরে ঠাকুর-বাড়ির আমবাগানে মালীদের ঘর আছে বটে, কিন্তু অতখানি ছোটা ত সহজ নয়।

দেখতে দেখতে আকাশ গেল ছেয়ে, চাঁদের আলো ডুবল অন্ধকারে, ওপার থেকে বৃষ্টিধারায় সোঁ সোঁ শব্দ এলো কানে, ক্রমশঃ সেটা নিকটতর হয়ে উঠল। আগাম দু-দশ ফোঁটা সকলেরই গায়ে এসে পড়ল তীরের মত, কি-করি কি-করি ভাবতে ভাবতেই মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো! মড়া রইল পড়ে, প্রাণ বাঁচাতে কে যে কোথায় ছুট দিলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

জল থামলে ঘণ্টাখানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলাম। মেঘ গেছে কেটে, চাঁদের আলো ফুটছে দিনের মত। ইতিমধ্যে গরুরগাড়ি এসে পৌঁছেছে, গাড়োয়ান কাঠ এবং শবদাহের অন্যান্য উপকরণ নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে।

কিন্তু তোমাদের দেখা নেই। গোপালখুড়ো বললেন, ও-ব্যাটারা ঐ রকম। শীতে ঘর থেকে বেরুতে চায় না।

মণি বললে, কিন্তু লালু এখনো ফিরলো না কেন। সে যে বলছিল আগুন নেবে। ভয়ে বাড়ি পালালো না ত?

খুড়ো লালুর উদ্দেশে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না।

ছেড়ে গেলে কি হয় খুড়ো?

কি হয়? কত-কি? শ্মশানভূমি কি না!

শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করত না?

ভয়! আমার? অন্ততঃ হাজারটা মড়া পুড়িয়েচি জানিস্!

এর পরে মণি আর কথা কইতে পারলে না। কারণ সত্যই খুড়োর গর্ব্ব করা সাজে। শ্মশানে গোটা-দুই কোদাল পড়ে ছিল, খুড়ো তার একটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি চুলোটা কেটে ফেলি, তোরা হাতাহাতি করে কাঠগুলো নীচে নামিয়ে ফেল।

খুড়ো চুলি কাটছেন, আমরা কাঠ নামিয়ে আনছি; নরু বললে, আচ্ছা, মড়াটা ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়েচে, না?

খুড়ো কোনদিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, ফুলবে না? লেপ-কাঁথা সব জলে ভিজেছে যে!

কিন্তু তুলো জলে ভিজলে ত চুপসে ছোট হয়ে যাবে খুড়ো, ফুলবে না ত।

খুড়ো রাগ করে উঠলেন—তোর ভারি বুদ্ধি। যা করচিস কর।

কাঠ বহা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

নরুর দৃষ্টি ছিল বরাবর খাটের প্রতি। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—খুড়ো, মড়া যেন নড়ে উঠল।

খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোদালটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন; তোর মত ভীতু মানুষ আমি কখনো ত দেখিনি নরু? তুই আসিস কেন এ-সব কাজে? যা—বাকি কাঠগুলো আন্। আমি চিতাটা সাজিয়ে ফেলি। গাধা কোথাকার!

আবার মিনিট-দুই গেল। এবার মণি হঠাৎ চমকে উঠে পাঁচ-সাত পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললে, না খুড়ো, গতিক ভালো ঠেকচে না। সত্যিই মড়াটা যেন নড়ে উঠলো।

খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ—করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েচে—তাকে?

নরু বললে, ঐ দেখুন আবার নড়চে।

খুড়ো বললেন, হাঁ নড়চে, ভূত হয়ে তোকে খাবে বলে—মুখের কথাটা তাঁর শেষ হ'লো না, অকস্মাৎ লেপ-কাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো,—নাঁ নাঁ—নরুকে নয়—গোপালকেঁ খাঁবো—

ওরে বাবা রে! আমরা সবাই মারলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়। গোপালখুড়োর সুমুখে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি উপরের দিকে আমাদের পিছনে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাবা গো, গেছি গো—ভূতে খেয়ে ফেললে গো!—রাম—রাম—রাম—

এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—ওরে নির্ম্মল, ওরে মণি, ওরে নরু, পালাসনে রে—আমি লালু—ফিরে আয়—ফিরে আয়—

লালুর কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছলো। নিজেদের নিবুদ্ধিতায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে এলাম। গোপালখুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙায় উঠলেন। লালু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সলজ্জে বললে, সবাই জলের ভয়ে পালাল, কিন্তু আমি মড়া ছেড়ে যেতে পারলাম না, তাই লেপের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম।

খুড়ো বললে, বেশ করেছিলে, বাবা, খাসা বুদ্ধি করেছিলে। এখন যাও ভাল করে গঙ্গামাটি মেখে চান করো গে। এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি—

তিনি কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করলেন। বুঝলেন এতবড় ভয়শূন্যতা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এই রাতে একাকী শ্মশানে কলেরার মড়া, কলেরার বিছানা—এ সব সে গ্রাহ্য করলে না!

মুখে আগুন দেবার কথায় খুড়ো আপত্তি করলেন, না, সে হবে না। ওর মা শুনতে পেলে আর আমার মুখ দেখবেন না।

শবদাহ সমাধা হ'লো! আমরা গঙ্গায় স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সেইমাত্র সূর্য্যোদয় হয়েচে।

বিভিন্ন রচনাবলী

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সংবর্দ্ধনা

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুত সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি, লিট্, মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুরে নব রাগিণীতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়া প্রাচ্য-হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্য-বীণায় সহস্র অনির্ব্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণু-পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে, এবং এক অপরিচ্ছন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সঙ্গীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীত নিখিল মানব-

হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমহান কাব্য-বীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা। ইতি—

রেঙ্গুন,
২৫শে বৈশাখ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ—
রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ।*

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন, আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না লেখক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেইসকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ-বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত-মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮।

---

* গিরীন্দ্রনাথ সরকার রচিত 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' নিবন্ধে (পৃঃ ২২২-৩৩) দেখা যায় যে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জাপান হইয়া আমেরিকা যাত্রার পথে রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলে, পর-দিবস স্থানীয় জুবিলী-হলে এক বিরাট জন-সভায় তিনি সংবর্দ্ধিত হন। রেঙ্গুন-প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষ হইতে কবি নবীনচন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেন একখানি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। এই অভিনন্দন-পত্র রচনা করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

রবীন্দ্রনাথ

কবির জীবনের সপ্ততি বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো। বিধাতার এই আশীর্ব্বাদ শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত মানবজাতিকে ধন্য করেচে। সৌভাগ্যের এই স্মৃতিকে আনন্দোৎসবে মধুর ও উজ্জ্বল করে আমরা উত্তরকালের জন্য রেখে যেতে চাই এবং সেইসঙ্গে নিজেদেরও এই পরিচয়টুকু তাদের দিয়ে যাবো যে, কবির শুধু কাব্যেই নয়, তাঁকে আমরা চোখে দেখেচি, তাঁর কথা কানে শুনেচি, তাঁর আসনের চারিধারে ঘিরে বসবার ভাগ্য আমাদের ঘটেচে। মনে হয়, সেদিন আমাদের উদ্দেশ্যেও তারা নমস্কার জানাবে।

সেই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ আজকের এই সাহিত্য-সভা। সাহিত্যের সম্মেলন আরও অনেক বসবে, আয়োজন-প্রয়োজনে তাদের গৌরবও কম হবে না, কিন্তু আজকের দিনের অসামান্যতা তারা পাবে না। এ তো সচরাচরের নয়, এ বিশেষ একদিনের, তাই এর শ্রেণী স্বতন্ত্র।

সাহিত্যের আসরে সভা-নায়কের কাজ আরও করবার ডাক ইতিপূর্ব্বে আমার এসেচে, আহ্বান উপেক্ষা করতে পারিনি, নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করেও সসঙ্কোচে কর্ত্তব্য সমাপন করে এসেচি, কিন্তু এই সভায় শুধু সঙ্কোচ নয়, আজ লজ্জা বোধ করচি। আমি নিঃসংশয় যে, এ গৌরব আমার প্রাপ্য নয়, এ ভার বহনে আমি অক্ষম। এ আমার প্রচলিত বিনয়বাক্য নয়, এ আমার অকপট সত্য কথা।

তথাপি আমন্ত্রণ অস্বীকার করিনি। কেন যে করিনি আমি সেইটুকুই শুধু ব্যক্ত করব।

আমি জানি বিতর্কের স্থান এ নয়, সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচার, এর জাতি-কুল নির্ণয়ের সমস্যা নিয়ে এ পরিষৎ আহূত হয়নি—তার প্রয়োজন যথাস্থানে—আমরা সমবেত হয়েচি বৃদ্ধ কবিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করে দিতে। তাঁকে সহজভাবে বলতে—কবি, তুমি অনেক দিয়েচো, এই দীর্ঘকালে তোমার কাছে আমরা অনেক পেয়েচি। সুন্দর, সরল, সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী ভাষা দিয়েচো তুমি, তুমি দিয়েচো বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ কাব্য, দিয়েচো অনুরূপ সাহিত্য, দিয়েচো জগতের কাছে বাঙলার ভাষা ও ভাব-সম্পদের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর দিয়েচো যা সকলের বড়—আমাদের মনকে তুমি দিয়েচো বড় করে। তোমার সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আমার সাধ্যাতীত—এ আমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ। প্রজ্ঞাবান যারা যথাকালে তাঁরা এর আলোচনা করবেন; কিন্তু তোমার কাছে আমি নিজে কি পেয়েচি, সেই কথাটাই ছোট করে জানাবো বলেই এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম।

ভাষার কারুকার্য্য আমার নাই। ওতে যে পরিমাণ বিদ্যা এবং শিক্ষার প্রয়োজন সে আমি পাইনি, তাই মনের ভাব প্রচলিত সহজ কথায় বলাই আমার অভ্যাস—এবং এমনি করেই বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্গ্রহ এসে বিঘ্ন ঘটালে। একে আমি বিখ্যাত কুঁড়ে, তাতে বায়ু-পিত্ত-কফ আদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চরের দল একযোগে কুপিত হয়ে আমাকে শয্যাশায়ী করে দিল। এমন ভরসা ছিল না যে, নড়তে পারবো। কিন্তু একটা বিপদ এই যে, চিরকাল দেখে আসচি আমার অসুখের কথা কেউ বিশ্বাস করে না, যেন ও আমার হতে নেই। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবাই ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে বলচেন, উনি আসবেন না তো? এ আমরা জানতাম। সেই বাক্যবাণের ভয়েই আমি কোনমতে এসে উপস্থিত হয়েচি। এখন দেখচি ভালোই করেচি। এই না-আসতে পারার দুঃখ আমার আমরণ ঘুচতো না। কিন্তু যা লিখে আনবার ইচ্ছে ছিল, সে হয়ে ওঠেনি। একটা কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করেচি, তার চেয়েও বড় কৈফিয়ৎ আছে। মানুষের অল্প অল্প পাওয়ার কথাই মনে থাকে, তাই লিখতে গিয়ে দেখলাম কবির কাছ থেকে পাওয়ার হিসেব দিতে যাওয়া বৃথা। দফাওয়ারি ফর্দ্দ মেলে না।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকো বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে যাত্রার দলের সাকরেদী করি, তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা-কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই, ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশযাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জ্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর-অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর একদফা সংবর্দ্ধনা-লাভের পর, আবার বোধোদয়-পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি, আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্টু সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাকরেদী শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ-যাত্রা,—আবার ফিরে আসা, আবার তেমনি আদর-আপ্যায়ন সংবর্দ্ধনার ঘটা। এমনি করে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাঙলা জীবনের এক অধ্যায় শেষ হোলো। এলাম সহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভর্ত্তি করেছিলেন ছাত্র-বৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, মাসিক সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং সসঙ্কোচে বলা চলে যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পর বহু দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সঙ্গীত

অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাশ করতে এবং উকীল হতে। এর মাঝখানে আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্য্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে, তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ, কাব্যে আশক্তি; বাড়ির মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথের "প্রকৃতির প্রতিশোধ।" কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাহিরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবার পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়। এর পরে এ-বাড়ির উকীল হবার কঠোর নিয়ম সংযম আর ধাতে সইলো না, আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরানো পল্লী-ভবনে। কিন্তু এবার বোধদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম "হরিদাসের গুপ্তকথা"। আর বেরোলো "ভবানী পাঠক"। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ-ছেলের অ-পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমার বাড়ির গোয়াল-ঘরে। সেখানে আমি পড়ি তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। এই ইস্কুলে বেশিদিন পড়লে বিদ্যে হয় না, মাস্টারমশাই স্নেহবশে এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো সহরে। বলা ভালো এর পরে আর ইস্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয়নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না। পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল! বোধ হয় এ আমার একটা দোষ! অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেচি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েচে, কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পর এলো 'বঙ্গ দর্শনে'র নবপর্যায়ের যুগ। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়লো। সেদিনের সেই গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলবো না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে চায়, এর পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এতদিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায় এ-কথা সত্য নয়। ওই তো খান-কয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে জীবনে একটা ছত্রও কোনও দিন লিখেচি; দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতিমধ্যে কবিকে

কেন্দ্র করে, কি করে যে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো আমিই তার কোনও খবর জানি না। কবির সঙ্গে কোনও দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটেনি, তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাইনি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এইটা হোলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ঐ ক'খানা বই-ই বারবার করে পড়চি, কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে Art, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটেছে কি না—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ও-সব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতে পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য-সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েচি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম—ভয়ের কথা মনেই হোলো না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা করতে আমি পারিনে, কিন্তু ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ওর অন্তরের সন্ধান আমাকে দিয়েচে। পণ্ডিতের তত্ত্ববিচারে তাতে ভুল যদি থাকে তো থাক, কিন্তু আমার কাছে সেই সত্য হয়ে আছে।

জানি রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় এ-সকল অবান্তর, হয়তো বা অর্থহীন, কিন্তু গোড়াতেই আমি বলেচি যে, আলোচনার জন্য আমি আসিনি, এর সহস্র ধারায় প্রবাহিত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যের বিবরণ দেওয়াও আমার সাধ্যাতীত, আমি এসেছিলাম আমার ব্যক্তিগত গোটাদশেক কথা এই জয়ন্তী-উৎসব সভায় নিবেদন করে দিতে।

কাব্য, সাহিত্য ও কবি রবীন্দ্রনাথকে আমি যেভাবে লাভ করেচি তা জানালাম। মানুষ রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমি সামান্যই এসেচি। কবির কাছে একদিন গিয়েছিলাম বাঙলা-সাহিত্য সমালোচনার ধারা প্রবর্ত্তিত করার প্রস্তাব নিয়ে। নানা কারণে কবি স্বীকার করতে পারেননি, তার একটা হেতু দিয়েছিলেন যে, যাঁর প্রশংসা করতে তিনি অপারগ, তার নিন্দে করতেও তিনি তেমনি অক্ষম। আরও বলেছিলেন যে, তোমরা যদি এ-কাজ কর, কখনো ভুলো না যে অক্ষমতা ও অপরাধ এক বস্তু নয়। ভাবি, সাহিত্য-বিচারে এই সত্যটা যদি সবাই মনে রাখতো।

কিন্তু, এই সভার অনেকখানি সময় নষ্ট করেছি, আর না। অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করার এটা দণ্ড। এ আপনাদের সইতেই হবে। সে যাই হোক,

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব-উপলক্ষে এ সমাদর ও সম্মান আমার আশার অতীত; তাই সকৃতজ্ঞ চিত্তে আপনাদিগকে নমস্কার জানাই।*

কবি অতুলপ্রসাদ

স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন আমার ভারী বন্ধু ছিলেন। আপনারা আমাকে এই-সমস্ত মৃত্যুর পরে শোক-সভায় বক্তৃতা করার জন্য ডাকেন? মানুষে জানে যে আমি বক্তৃতা করতে পারিনে; তবুও আমাকে তাঁরা ডেকে এনেচেন আজকের দিনে আপনাদের কিছু বলবার জন্তে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—অনেক আলাপ-পরিচয় সেদিন তিনি করলেন। তার কিছুদিন পরেই তাঁর পরলোক-গমনের খবর পাওয়া গেল—আমি বিস্মিত হলুম এই পর্য্যন্ত, কোনরকম দুঃখ বা শোক আমার এলো না। মানুষের একটা বিশেষ বয়সের পরে মানুষ যখন যায়, তখন সেটা এমন নিশ্চিত জিনিস মনে হয় যে, সেটা আমার কাছে আনন্দের আকারে দেখা দেয়।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন ভারী ভক্ত এবং ভগবৎ-প্রেমে তাঁর মন পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর দয়া, দান, দাক্ষিণ্য জানাবার লোক এ-সভায় নেই,—তাঁরা অত্যন্ত গরীব—অখ্যাত অজ্ঞাত অজানা লোক। তারা যদি আসতে পারতেন তা হলে বলতেন কত বিপদের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে অতুলপ্রসাদ দিয়েচেন এবং তাদের বিপদ থেকে মুক্ত করেচেন।

তাঁর গান বাঙলা দেশ ছাড়িয়ে যেখানে যেখানে বাঙালী আছেন সেখানে পৌঁছেচে। তাঁর জীবনটিও ছিল ঐ-রকম ধরনের। সংসারে থাকতে হলে দুঃখ, আনন্দ, ব্যথা সবই আছে; তিনি তার বাইরে ছিলেন না। তার পর তাঁর দিন এলো—ডাক পড়ল—তিনি চলে গেলেন। বয়সে যাঁরা কম তাঁরা এই নিয়ে অশ্রুপাত করতে পারেন, কিন্তু আমাদের দিন এসে পড়েচে—সেইদিক দিয়ে—আমার অতুলপ্রসাদের জন্য শোক বোধ হয় না; মনে হয়, এই নিয়ম, এইরকমেই মানুষ যায়—দু-দিন আগে আর দু-দিন পরে। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে সান্ত্বনা এই যে, তিনি কখনও কারও ক্ষতি করেননি—সকলের ভাল করে গেলেন।

গানের ভিতর দিয়ে, কাব্যের ভিতর দিয়ে, তিনি বাঙলা ভাষার অনেক উন্নতি করেছেন। তাঁর গানের মত ছিল তাঁর জীবন। এমনি করে এই ধারা ধরে—বাঙলা-সাহিত্যকে যারা বড় করেচেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে একজন। আমিও একজন লেখক—বাঙলা ভাষার সেবক—আমার তাই মনে হয়—এমনি করে, আরও কিছু

* ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসবে পঠিত।

দিন তিনি দিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর দিন এসেছিল। তিনি চলে গেলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে, ব্যথার সঙ্গে এই কথাই মনে করেছি তিনি আমাদের মধ্যে নেই। আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণ করি। আমাদের মাঝে থেকে আমাদের বন্ধু সরে গেলেন, তাঁর আত্মার কল্যাণ হোক, এই আমার আজকের দিনের প্রার্থনা।*

লাহোরের ভাষণ

বাস্তবিক এতদূরে এসে মনে করি নাই যে, আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমার এক বন্ধু এখানে প্রফেসার ছিলেন, নাম অক্ষয়কুমার সরকার। তাঁর কাছে শুনতাম, এখানে অনেক লোক আছেন যাঁদের বাঙলার সঙ্গে সম্পর্ক কম—যারা একেবারে প্রবাসী হয়ে পড়েছেন। এত দূরে বাঙলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কঠিন। তবু যে আপনারা বাঙলার সঙ্গে পরিচয় রাখেন, তা স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

দেখুন। আপনারা যে সব কথা বললেন তাতে অনেক অতিরঞ্জন আছে। সাহিত্যের দিক দিয়ে কিছু করেছি বটে, কিন্তু যা করেছি তাতে জোচ্চোরি করি নাই—মানুষের কাছে বাহবা পাবার জন্য কিছু করি নাই। আমি বড় বেশী বয়সে লিখতে আরম্ভ করি। কেরানী ছিলাম। এখন বয়স তিপ্পান্ন। লেখার মধ্য দিয়ে আমার অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েচে। প্রথম যখন আরম্ভ করি, তখন গালিগালাজের বান ডেকে গেল। যখন 'চরিত্রহীন' লিখি, তখন পাঁচ-ছ বছর ধরে গালাগালির অন্ত ছিল না। তবে মনের মধ্যে আমার এই ভরসা ছিল যে, সত্যি জিনিসটা আমি ধরেছিলুম।

সত্য আর সাহিত্য আলাদা। সত্য সাহিত্যের বনেদ, কিন্তু সেইটাই সব নয়। সাহিত্য একটা শিল্প—যেমন করে সাজালে মানুষের মনে সেটা একটা দাগ ফেলতে পারে, যা অনেকদিন থাকে। সত্যের দিক দিয়ে গেলে, আর যাই হউক, ভাল সাহিত্য হয় না। এই বিষয়ে আমি অপরের পদাঙ্ক অনুসরণ করি নাই। এই করে আপনাদের এই স্নেহ পেলুম, এই আমার বড় আনন্দ।

একেবারে কিছু দাঁড়িয়ে বলা আমার হয় না। একটা হৈ-হৈ হয় যা আমার ভাল লাগে না। বক্তৃতা আমি করতে পারি না। আমি অনেক সময় বলি, আমাকে তোমরা বক্তৃতা করতে ডেকো না। যে কৌতূহল তোমাদের মনে উঠেচে, সেই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। দেখুন, আপনাদের মাঝে আমার মনে হয় কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেন—আমিও কিছু বললুম—পরস্পর আদান-প্রদান হ'লো—সেই জিনিসটা আমি বড় মনে করি।

---

* ১৪ই পৌষ, ১৩৪১ তারিখে কলিকাতা টাউন-হলে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে কবি অতুলপ্রসাদ সেনের শোক-সভার সভাপতির বক্তৃতা।

বাঙলার গ্রন্থকার বলে আপনারা আমাকে ভালবাসেন, জানালেন, সেইটাই আমি এখান থেকে নিয়ে যাব। রাজনীতি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েচি বলে সেইটাই আমার সব নয়। আমার শক্তি-সামর্থ্য একদিক দিয়েই চলে—এই সাহিত্যের দিক দিয়ে। আমার সঙ্গীদের বলেছিলুম,—এইখানে একটু সাহিত্যের আলোচনা হ'তো—আমি মনের একটা তৃপ্তি সেইদিক দিয়ে পেতুম! অকস্মাৎ আপনাদের নিকট এইখান থেকে তাই পেয়ে গেলুম। বাস্তবিক আমি কৃতার্থ মনে করচি। যে-সব বাঙালী এইখানে আছেন, তাঁরা যে আমাকে ভোলেননি, নানা কাজের ভিতর দিয়ে যাঁরা বাঙলাতে যেতে পারেন না, তবু বাঙলার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে—তাঁদি'কে আন্তরিক ধন্তবাদ।

আমি বাঙলা ভাষার দিকে যা দেখেচি সেইটে নানাভাবে দেখাই, আপনারাও তা দেখতে পান। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—সত্যই প্রার্থনা করুন যেন এত বড় ভাষাকে,—যাকে রবীন্দ্রনাথ এত বড় করে তুললেন, তাঁকে যেন আরও বড় করা হয়। খুব বেশী বয়সেই আমি লেখা আরম্ভ করি। অনেকগুলো বইও লিখলাম। গালি-গালাজও হ'লো। তার মধ্যে যে কিছু আছে, তার প্রমাণ আজ আপনারা দিলেন।

পৃথিবীর সবাই আজ স্বীকার করেচে, ভাষার দিক দিয়ে আমরা কিছুতেই ছোট নই। আগে যাঁরা বাঙলা পড়তেন না, তাঁরাও আজ বাঙলা পড়েন। এই ভাষা যে আজ কত বড় হয়েচে তার আর তুলনা আছে? একটা দিক বাঙলার আছে যেখান দিয়ে সে দাঁড়াতে পারে।

আমার বয়সও হ'লো, আর কতদিনই বা চলবে। তবে যেটা রইল, সেটা জমা হয়ে রইল, সেটাকে যেন বরাবর বড় করবার চেষ্টা করা হয়।

আমাদের স্বাধীনতা নেই, তার জন্ত আমরা লজ্জিত হয়ে থাকি। চোখে দেখি, গৃহস্থ ভদ্রলোক, তাদের কত দুর্দ্দশা। সমাজের অপব্যবহার আমরা ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করতে পারি। ধরুন, এই বিয়ের ব্যাপার—কত করুণ ব্যাপারই না এইদিক দিয়ে ঘটচে। এইরকম এক একটা বললে কত বলতে হয়। বলতে গেলে মাথা নীচু হয়। তবে একটা জিনিস আমাদের আছে, যেখানে আমরা গর্ব্ব করতে পারি। ভাষা আমাদের কত বিরাট, কত গৌরবময়ী! চোখ বন্ধ করে তাই আমি অনুভব করি।

একটা বই লিখলুম 'পথের দাবী'—সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলে। তার সাহিত্যিক মূল্য কি আছে না-আছে দেখলে না। কোথায় গোটা-দুই সত্য কথা লিখেছিলুম। সেইটাই দেখলে।

এক, সমাজ দেখুন, তার মধ্যে পরস্পর মেলামেশা নেই। এক-বাড়ির মধ্যে ভাব নেই! মনের প্রত্যেক ভাব নিজেদের সংবরণ করতে হয়। অন্ত জাতের এ-সব

বালাই নেই। জীবনে আনন্দের দিক দিয়ে তারা কত স্বাধীন। হয়ত তাতে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে, কিন্তু তাতে দাগ হয় না। আমরা ঝগড়া করে অনেক-কিছু বলতে পারি বটে, কিন্তু জীবনকে তারা বড় করে নিয়েছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তারা সেই সব প্রকাশ করচে। তাদের Army, তাদের Navy, তাদের Church —কত দিক দিয়ে তাদের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। আমাদের সমাজের দিক দিয়ে মনে হবে এটা বিশ্রী। আমাদের সাহিত্যিক নীতিটা আলাদা। সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রকাশ পায় না! কতক বাইরে থেকে বাধা এসে পড়েচে, কতক নিজেদের সৃষ্টি। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেচেন তাঁদের এইজন্য দোষ দিতে পারি না! আমারই কত গোলমাল হয়েছে। তবে ভগবানের ইচ্ছায় আজ বুঝতে পারছি যে, স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে অনেক obsolete হবে তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। দেশের সাহিত্য স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই চারিদিক ছড়িয়ে যেতে পারবে। উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি বাধা এসে পড়তে পারে। যে জিনিসটা হবে—ভরসা করি যেন হয়—তখন এই সাহিত্য প্রকাণ্ড হবে। যারা আমার বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁরা যদি এইটে করতে চান, তাঁরা যেন এইটে মনে রাখেন যে, সকল দিকে স্বাধীনতা না থাকলে এইটাকে বড় করা যায় না।

গর্ব্ব করবার জিনিস আমাদের একমাত্র আছে—এই ভাষা। এইটা যাতে দুর্ব্বল না হয়ে পড়ে—সহানুভূতির দিক দিয়েই হউক বা অন্য যে-কোন দিক দিয়েই হউক—যেন তা না হয়। আমি অনেক জায়গায় বলি, যেন এটা না হয়। একটু ধৈর্য্যের সঙ্গে যা নীতি-বন্ধন আছে তার মধ্য দিয়েই সাহিত্য প্রচার হোক। কোন কাজে কোন অবহেলায় এই জিনিস যেন ছোট না হয়ে যায়। প্রবাসী আপনারা এই জিনিসটা মনে করে রাখবেন। সকলের মন এক নয়, একটা কথা যেন principle-এর মত মনে থাকে যেন আমার কাজের মধ্যে এ না ছোট হয়। কোন একটা জাতের জাগরণ ভাষার মধ্য দিয়েই করতে হয়। যার ভাষা দুর্ব্বল তার উঠবার আশা নেই। যখনি দেখা যায় কোন জাতি উঠেচে, তখনি দেখা যায় তার সাহিত্যও বড় হয়েছে। আপনারা শুধু এইটে দেখবেন যেন ভাষা না ছোট হয়—দেখবেন আপনাদের সবকিছুই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আপনারা বাঙলাতেই থাকুন, আর প্রবাসেই থাকুন, সবই এক—ভাষার সঙ্গে যতদিন পরিচয় রাখবেন ততদিন সবই এক।

আমি বড় কৃতার্থ হলুম। এই যে মালা দিলেন, এই আমার বড় সৌভাগ্য! এর চাইতে সম্মান আমি চাই না—চাইলেও থাকবে না। এই মালাই আমার খুব বড়। এইটে মাথায় করে নিয়ে গেলুম।*

---

* লাহোর-প্রবাসী বাঙালীদের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর 'উত্তরা' আষাঢ় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত।

ছাত্র সাহিত্য-সম্মেলনে বক্তৃতা

আজকাল যে-সমস্ত সাহিত্য-সম্মেলন হয় প্রায়ই দেখিতে পাই যে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠানে অতি-আধুনিক সাহিত্য-সম্বন্ধে খুবই নিন্দাবাদ হয়। আমি অতি-আধুনিক সাহিত্যের যে প্রশংসা করিতেছি তাহা নহে, আমার বক্তব্য এই যে, এই ধরণের আলোচনা না হওয়াই ভাল। কারণ, এইভাবে লেখা উচিত বা এইভাবে লেখা উচিত নহে—এ-কথা বলিলে বিশেষ কিছু লাভ হয় না। যাহার যে-রকম শিক্ষা, যাহার যে-রকম দৃষ্টি, যাহার যে-রকম শক্তি, যাহার যে-রকম রুচি—তিনি তাহারই অনুপাতে সাহিত্য গড়িয়া তুলেন। এই সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে যেগুলি থাকিবার তাহা থাকিবে এবং যাহা না থাকিবার তাহা লোপ পাইবে।

সাহিত্য গড়িয়া উঠে যুগধর্ম্মে—সমালোচনা অথবা সহযোগিতা দ্বারা গড়িয়া উঠে না। সমস্ত জিনিসেরই একটি ক্রমোন্নতি আছে, নাই শুধু সাহিত্যের ব্যাপারে। কালিদাসের পরে শকুন্তলাকে যদি আরও ভাল করার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে যত লোক ইহা পড়িয়াছেন, যত লোক অনুকরণ করিয়াছেন, যত লোক ইহাকে ভাল বলিয়াছেন—তাঁহারা শকুন্তলা হইতে উৎকৃষ্টতর নাটক রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। মহাকবি কালিদাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই বড় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করিয়া অনেকেই অনেক কিছু লিখিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা ও অনুকরণের মধ্যে আসমান জমি প্রভেদ।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন, নূতন সাহিত্য-সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ মত পোষণ করি—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। আমি কালের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহার যদি কোন মূল্য থাকে, তবে ভবিষ্যতে তাহা টিকিয়া থাকিবে; আর যদি টিকিবার না হয় তবে ঝরিয়া পড়িবে। মানুষের ভাল অথবা মন্দ লাগার উপর কোন সাহিত্যই নির্ভর করে না—সে তাহার প্রয়োজনে আপনা হইতেই নামিয়া যায়, সমাজের মধ্যে জীবনের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে মানুষ যদি ইহাকে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে, তবে তাহা আর থাকিবে না। সুতরাং এই জাতীয় আলোচনায় কোন লাভ নাই; তাহাতে শুধু সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে একটি রেষারেষির ভাব আসিয়া পড়ে। ফরমাস দিয়া সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। তার চেয়ে বলা ভাল—তোমাদের শুভ-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।

যাহাতে বাঙলা সাহিত্য বড় হইয়া উঠে, নিজেদের বুদ্ধি এবং বিদ্যা দিয়া তাহাই কর।*

জন্মদিনের ভাষণাবলী

৫৩তম জন্মদিনে

বন্ধুজনের সমাদর, স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠদের প্রীতি এবং পূজনীয়গণের আশীর্ব্বাদ আমি সবিনয়ে গ্রহণ করলাম। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা পাওয়া কঠিন। নিজের জন্য শুধু এই প্রার্থনা করি, আপনাদের হাত থেকে যে মর্য্যাদা আজ পেলাম, এর চেয়েও এ-জীবনে বড় আর কিছু যেন কামনা না করি। যে মানপত্র এইমাত্র পড়া হ'লো তা আকারে যেমন ছোট, আন্তরিক সহৃদয়তায় তেমনি বড। এ তার প্রত্যুত্তর নয়; এ শুধু আমার মনের কথা, তাই আমারও বক্তব্যটুকু আমি ক্ষুদ্র করেই লিখে এনেচি।

এই যে অনুরাগ, এই যে আমার জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে আনন্দ-প্রকাশের আয়োজন—আমি জানি, এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র-গৃহে আমার জন্ম; এইতো সেদিনও দূর-প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জ্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম; সেদিন পরিচয় দিবার আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না। তাইতো বুঝতে আজ বাকী নেই—এ শ্রদ্ধা-নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়, উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া কোন অতীত দিনের গৌরবকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা-নিবেদন।

জানি এ সবই। তবুও যে সংশয় মনকে আজ আমার বারংবার নাড়া দিয়ে গেছে সে এই যে, সাহিত্যের দিক দিয়েই এ মর্য্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জ্জন করেচি? কিছুই করিনি এ-কথা আমি বলব না। কারণ, এতবড় অতি-বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজেকেও চাইনে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেচি। বন্ধুরা বলবেন, শুধু কিছু নয়, অনেক-কিছু। তুমি অনেক করেচ। কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নন, তাঁরা হয়ত একটু হেসে বলবেন, অনেক নয়, তবে সামান্য কিছু করেচেন, এইটিই সত্য এবং আমরাও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে সে সামান্যের ঊর্দ্ধস্থ বুদ্বুদ আর অধঃস্থ আবর্জ্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়। এ যাঁরা বলেন, আমি তাঁদের প্রতিবাদ

*আশুতোষ কলেজ বাঙলা সাহিত্য-সম্মেলন, দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসবে (২২শে ফাল্গুন, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ) প্রদত্ত বক্তৃতা।

করিনে, কারণ তাঁদের কথা যে সত্যি নয়, তা কোনমতেই জোর করে বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসেনি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্ত্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তাকে ত ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায়, সে শুধু এর জন্যেই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্য্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েচে। ক্ষোভ না করে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো যে, আমার দেশে, আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যেই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

নানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সে-দিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েচে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোন দিন যেন না এতবড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেচেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েচি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠেচে, আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কি না এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সে-দিন যাকে সত্য বলে অনুভব করে-ছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেচি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কি না এ চিন্তা আমার নয়, কাল যদি সে মিথ্যা হয়েও যায়—তা নিয়ে কারো সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাবো না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ব্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুনলে মনে যা লাগে, তথাপি এ সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য্য বিকশিত হয়ে উঠে। মানব-চিত্তই যে একস্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পায় না। তার পরিবর্ত্তন আছে, বিবর্ত্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য্য-বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের

পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষে খুশী হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

মনে আছে, দাশু রায়ের অনুপ্রাসের ছন্দে গাঁথা দুর্গার স্তব পিতামহের কণ্ঠহারে সেকালে কত বড় রত্নই না ছিল! আজ পৌত্রের হাতে বাসি মালার মত তারা অবজ্ঞাত। অথচ এতখানি অনাদরের কথা সেদিন কে ভেবেছিল?

কিন্তু কেন এমন হয়? কার দোষে এমন ঘটল? সেই অনুপ্রাসের অলঙ্কার তো আজও তেমনই গাঁথা আছে। আছে সবই, নেই শুধু তাকে গ্রহণ করবার মানুষের মন। আর আনন্দ-বোধের চিত্ত আজ দূরে সরে গেছে। দাশু রায়ের নয়, তাঁর কাব্যের নয়, দোষ যদি কোথাও থাকে তো সে যুগধর্ম্মের।

তর্ক উঠতে পারে, শুধু দাশু রায়ের দৃষ্টান্ত দিলেই তো চলে না। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদাবলী তো আজও আছে, কালিদাসের শকুন্তলা তো আজও তেমনি জীবন্ত। তাতে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। কিন্তু এর থেকে তার অবিনশ্বরতাও সপ্রমাণ হয় না। তার দোষ-গুণের শেষ নিষ্পত্তি করা যায় না।

সমগ্র মানব-জীবনে কেন, ব্যক্তি-বিশেষের জীবনেও দেখি এই নিয়মই বিদ্যমান। ছেলেবেলায় আমার 'ভবানী পাঠক' ও 'হরিদাসের গুপ্তকথা'ই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে উপভোগ করেচি তার সীমা নেই। অথচ, আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ বলা কঠিন অথচ এমনই পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য-উপন্যাসের ভাল-মন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের 'পরেই। কিন্তু এ কি বিজ্ঞান ইতিহাস। এ কি শুধু কর্ত্তব্য কার্য্য, শুধু শিল্প যে, বয়সের দীর্ঘতাই হবে বিচার করার সবচেয়ে বড় দাবী?

বার্দ্ধক্যে নিজের জীবন যখন বিস্বাদ, কামনা যখন শুষ্ক প্রায়, ক্লান্তি অবসাদে জীর্ণ, দেহ যখন ভারাক্রান্ত—নিজেরা জীবন যখন রসহীন, বয়সের বিচারে যৌবন কি বার বার দ্বারস্থ হবে গিয়ে তারই?

ছেলেরা গল্প লিখে নিয়ে গিয়ে যখন আমার কাছে উপস্থিত হয়—তারা ভাবে, এই বুড়ো লোকটার রায় দেওয়ার অধিকারই বুঝি সবচেয়ে বেশী। তারা জানে না যে, আমার নিজের যৌবনকালের রচনারও আজ আমি বড় বিচারক নই।

তাদের বলি, তোমাদের সম-বয়সের ছেলেদের গিয়ে দেখাও। তারা যদি আনন্দ পায়, তাদের যদি ভালো লাগে, সেইটিই জেনে' সত্য বিচার।

তারা বিশ্বাস করে না, ভাবে দায় এড়াবার জন্তেই বুঝি এ-কথা বলচি। তখন

নিশ্বাস ফেলে ভাবি, বহু-যুগের সংস্কার কাটিয়ে উঠাই কি সোজা? সোজা নয় জানি, তবুও বলব, রসের বিচার এইটেই সত্য বিচার।

বিচারের দিক থেকে যেমন, সৃষ্টির দিক থেকেও ঠিক এই এক বিধান। সৃষ্টির কালটাই হ'লো যৌবনকাল—কি প্রজা-সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্য-সৃষ্টির দিক দিয়ে। এই বয়স অতিক্রম করে মানুষের দূরের দৃষ্টি হয়ত তীক্ষ্ণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্মভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে পড়ে, তার উৎসমুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ তিপ্পান্ন বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই,—অতঃপর রসের পরিবেশনে ত্রুটি যদি আপনাদের চোখে পড়ে, নিশ্চয় জানবেন তার সকল অপরাধ আমার এই তিপ্পান্ন বছরের।

আজ আমি বৃদ্ধ, কিন্তু যখন বুড়ো হইনি, তখন পূজনীয়গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেকের সাথে ভাষা জননীর পদতলে যেটুকু অর্ঘ্যের যোগান দিয়েছি, তার বহুগুণ মূল্য আজ দুই হাত পূর্ণ করে আপনারা ঢেলে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাদের নমস্কার করি।*

৫৪তম জন্মদিনে

একটা মামুলী ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। সেইটা শেষ করে আমার আজকের ইতিহাসটা বলে বিদায় নেব এক বৎসর পর আবার আমার পুরানো বন্ধুদের— যাঁরা আমাকে ভালবাসেন, তাঁদের দেখতে পাব মনে করে পীড়িত শরীরেও চলে এলাম।

অভিনন্দন উপলক্ষ করে আমার জন্মদিনে ছেলেরা আজ যা বললেন, তার সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বলে শেষ করব। অনেকদিন পূর্ব্বে, বোধ হয়, আপনাদের মনে আছে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেচেন। একটু কঠোরভাবে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক তার প্রতিবাদে নয়, কিন্তু সবিনয়ে আমি 'বঙ্গবাণীতে' তাঁকে জানিয়েচি, যতটা রাগ করে তিনি বলেচেন ততটাই সত্য কি না? তার পর থেকে দু-একজনের মুখে যখন শুনলাম, ওটা বলা আমার ঠিক হয় নাই, তখন থেকে নবীন সাহিত্য, যা আজকাল খবরের কাগজে,

*১৩৩৩ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে ৫৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসী প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর।

মাসিক পত্রে ও নানাভাবে অনবরত বেরুচ্ছে—গত এক বৎসর আমি সে-সকল যথেষ্ট মন দিয়ে পড়েচি। আমার সমালোচনার হয়ত বিশেষ কোন মূল্য নেই, কারণ, আমি সমালোচনা করতেই পারি না। শুধু ভাল-মন্দ লাগার ভিতর দিয়া আমার নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারি।

আজ আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, জিনিসটা সত্যই বিশ্রী হয়ে উঠেচে। আমি বরাবর চেয়েছিলাম, কবিরা যাকে রসবস্তু বলেন, এইটিই যেন তাঁরা তাঁদের যৌবনের শক্তি, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি নিয়ে সাহিত্য গড়ে তুলতে পারেন। আমি তাঁদের ভালবাসি এবং এইদিক থেকেই তাঁদের উৎসাহ বরাবর দিয়ে এসেচি। যাঁদের বয়স হয়েচে, তাঁদের মন অন্য রকম হয়ে গেছে। যৌবন জিনিসটা আমরা নিজেরা পেরিয়ে গেছি। তাই যৌবনের অনেক রচনা হয়ত আজ পড়তেও ভাল লাগে না, লিখতেও পারি না। এইজন্য মনে করি, বয়স যাদের কম, তাদের নূতন আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার সঙ্গে একটা শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সাহিত্য তাঁরা রচনা করবেন; সাহিত্যের উন্নতি করবেন; বাঙলা ভাষায় বড় জিনিস লিখে যাবেন, আন্তরিক চেষ্টা নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন। কিন্তু এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে আমার মন ঠিক অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি দেখচি, আমি যাকে রস বলে বুঝি, তাদের ভিতর তার বড্ড অভাব। চোখ মেলে চাইলে অভাবই দেখতে পাওয়া যায়। একটা মানুষের হৃদয়বৃত্তির যত ভাগ আছে, তার একটা ভাগ যেন তাঁরা অনবরত পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন, সে যেন আর থামে না। দু-তিনজন বন্ধু দেখা করতে এসেছিলেন, তাঁ'দিগকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এটা করচ কেন? উত্তরে তাঁরা বললেন—এইজন্য করচি, আমাদের আর scope নাই। আমরা যখন যা ভাবি, বা করি, যৌবনে যা প্রার্থনা করি, সেদিক থেকে রস-রচনা বা সাহিত্য-রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই না—এই বলে তাঁরা দুঃখ করলেন। আমি তাঁদের বললাম—কেবল একটা ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করচ। অনেকদিনের সংস্কার, অনেকদিনের সমাজ—এতে ত্রুটি-বিচ্যুতি, অভাব-অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এতবড় পরাধীন জাতি, এ সব ত রয়েচে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? আমরা সব-চাইতে দরিদ্র, আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ত্রুটি আছে—এ সব নিয়ে তোমরা কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এর জন্য প্রাণটা কাঁদে না কি? তোমাদের সাহস আছে, কিন্তু সাহস কেবল একদিকে হলে চলবে না। যেটাকে তোমরা সাহস মনে করচ, আমি মনে করি সেটা সাহসের অভাব। এদিকে ত শাস্তির ভয় নাই, কেহ তোমাদের বিশেষ কিছু করতে পারবে না। যেদিকে শাস্তির ভয় আছে,

সেদিকে সত্য-সত্যই সাহসের দরকার। সেখানে তোমরা নীরব। লেখার শক্তি তোমাদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু অন্য জিনিস তোমরা ধরলে না। পরাধীন দেশে কতরকম অভাব আছে—নানান্ দিকে আছে—এটা যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার করে চলেচ।

তার জবাব তাঁরা দিলেন, আমরা সাহিত্যিক মানুষ, যে, সমস্ত সাহিত্যের দিক নয়। ওদিক দিয়ে আমরা পারি না, ইচ্ছাও করে না. অভিজ্ঞতাও নাই। কিছুক্ষণ পরে তাঁরা অনুযোগ করলেন,—সাহিত্য ছেড়ে আমি যে ওদিকে যাচ্ছি, সেটা ভাল হচ্ছে না। আমি তাঁদের বলেছিলাম, হয়ত সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্র নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি—আমার লেখা বন্ধ হয়ে গিয়েচে, সুতরাং ওদিকে যাওয়া আমি ক্ষতি মনে করি না। আমি যদি ওদিকে একেবারে না যেতুম, তা হলে যত ক্ষতি হ'তো, গিয়ে যে ক্ষতি হয়েচে, তার তুলনায় তাকে ক্ষতি বলে মনে করি না। লাভ হউক, ক্ষতি হউক, আমার জীবন ত শেষ হয়ে এল। ছাই-ভস্ম যা হউক কিছু লেখা রেখে গেছি। তোমরা সবেমাত্র আরম্ভ করেচ এদিকটাকে অস্বীকার ক'রো না। অন্যান্য দেশের দু-চারখানা বই পড়েচি, তাতে দেখেচি, এ-জিনিসে তারা কখনও চোখ বুজে থাকেনি। এর জন্য তারা অনেক সহ্য করেচে, অনেক শাস্তি ভোগ করেচে। তোমরা তাই কর না কেন? তারা তা করবে কি না, আমি জানি না।

এতগুলি তরুণ স্কুলের ছাত্র—যারা পড়চে, সাহিত্য-চর্চ্চা করচে, তাদের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলব, তাদের হাত দিয়ে সাহিত্য যে খুব একটা উঁচু পর্দ্দায় বা ধাপে উঠেচে তা নয়! রবীন্দ্রনাথ যত কড়া করে বলেচেন, তেমন করে বলবার শক্তি আমার নাই, থাকলে হয়ত তেমন করে বলতাম। সত্যই খারাপ হচ্ছে। এখন তাদের সংযত হওয়া দরকার। আর রসবস্তু যে কি, বাস্তবিক কি হলে মানুষ আনন্দ বোধ করে, মানুষ বড় হয়, তাহাদের হৃদয়ের প্রসার বাড়ে—এ-সব চিন্তা করা দরকার, ভাবা দরকার। আমি গল্প লেখার দিক থেকে বলচি, কবিতার দিক থেকে নয়। একদিকে চলেচে। সংবাদপত্র—মাসিক—যখন পড়ি, কেবলই যেন মনে হয়, একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকগুলি তরুণী, বোধ হয় কুড়ি-পঁচিশজন হবে, উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে বললেন—দুঃখের ব্যাপার এই—আমরা লিখতে জানি না, সেইজন্য আমরা আমাদের প্রতিবাদ জানাতে পারি না। আজকাল যা হচ্ছে, তাতে আমরা লজ্জায় মরে যাই। কম বয়সের ছেলেরা হয়ত মনে করে, এ-সব জিনিস আমরা বুঝি ভালবাসি। আপনি যদি সুবিধা ও সুযোগ পান, আমাদের তরফ থেকে বলবেন—এ-সব জিনিস আমরা বাস্তবিক ভালবাসি না। পড়তে এমন লজ্জা হয়—তা প্রকাশ করতে পারি না। প্রতিবাদ করে কিছু লিখলে তারা গালিগালাজ আরম্ভ করবে, কটূক্তি বর্ষণ করবে—সে-সব

আমরা সহ্য করতে পারব না। সেইজন্য সব সহ্য করে যাচ্ছি। বহু ছেলে আপনার কাছে যায়! আমাদের হয়ে এ-কথা তাদের জানাবেন।

রাগের উপর থেকে যে আমি বলচি, তা নয়। আমাকে যেন কেহ ভুল না করেন। ছেলেদের নূতন উৎসাহকে দমিয়ে দেবার ইচ্ছা করে যে এটা বলচি, তাও নয়। অনেকবার বলেচি, যৌবনের সাহিত্য আলাদা। সেটা ঠিক বুড়োদের মত হয় না। ১৭।১৮।১৯ বৎসর বয়সে আমি যা লিখেচি, আজ তা লিখতে পারি না, ইচ্ছাও হয় না, চেষ্টা করলেও সেই ভাব আসে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে হয়ত কিছু ভাল হতে পারে, কিন্তু ঠিক সে জিনিসটি যেন হতে চায় না। এই জন্য অনেকবার বলেচি, ছেলেদের সাহিত্য-সৃষ্টি বুড়োদের চোখ দিয়ে দেখলে চলবে না। সে-বয়সের মধ্যে নিজেকে ফেলে দেখা দরকার। আজ ৫৪ বৎসর বয়সে যা ভালবাসি, তার সঙ্গে মিলিয়ে হয়ত এঁদের লেখার অনেকখানি বুঝতে নাও পারি, মনে হতে পারে অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও গত এক বৎসর তাঁদের বহু রচনা পড়ে তাঁদের কিছু বলবার সুযোগটাই খুঁজছিলাম। সেই সুযোগ আজ পেয়েচি। আমি বলি—তাঁরা সংযত হউন। সত্যিকার রসবস্তু কি, কিসে মানুষের হৃদয়কে বড় করে, সাহিত্য কি—এ-সব তাঁরা ভেবে দেখুন। তাঁদের লেখবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গেছে, প্রকাশ করবার ভঙ্গী বাস্তবিক আমাকে মুগ্ধ করে। লেখবার ভঙ্গী ও ভাষার দিক থেকে অভিযোগ করবার কিছুই নাই। সেদিক থেকে আমি নালিশ করিনি। অন্য দিক থেকেই আমি বললাম। এটা আমার নিজের ভাল-মন্দ লাগার কথা নয়। তোমরা জানো, তরুণদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। তাদের সমস্ত চেষ্টায় আমি থাকি। এইমাত্র যুব-সমিতির মিটিং করে এলাম। যথার্থ বন্ধুভাবে আমি তাঁদের বলচি—তাঁরা সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কঠোর কথাটাই আমার বারংবার মনে পড়ে। সেদিন অনেকেই মনে করলেন, যেন আমি তাঁর কথার পাল্টা উত্তর দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা করিনি, কোন দিন করব বলে মনেও করি না। সেদিন তাঁর কথা আমার অতটা না বললেও হয়ত হতো। কারণ, অতখানি বোধ করি অত্যন্ত কঠোর ঠেকেছিল। মনে হয়েছিল, সত্য ছিল না। কিন্তু এক বৎসর পরে এ আমি বলতে পারিনে।

আজ মনে হয়, যতই এঁদের বিরুদ্ধে কথা উঠচে, ততই যেন এঁদের আক্রোশ বেড়ে চলেচে। অন্ততঃ, আক্রোশের থেকে করচেন বলেই সন্দেহ হয়। মনে হয়, যেন তাঁরা বলচেন—বেশ করেচি, আরও করব। তোমরা বলচ, সেজন্য আরও বেশী করে করব। একে কিন্তু সাহস বলে না। যেদিকে শাস্তির ভয় আছে, সেদিকে যদি এই পরিমাণ সাহস দেখাতে তাঁরা পারতেন, তা হলে মনে করতাম, আর কিছু না থাক, অন্ততঃ সত্যকার সাহস এঁদের আছে। অনেক সময় মনে হয়,

জিদের জন্য করচে। এটাকে সাহস বলে মনে করি না। কিন্তু তা ত নয়, এ যেন "বে-পরোয়া হয়ে কতটা যেতে পারি দেখিয়ে দিচ্ছি" জানানো।

তোমরা—যারা এখানে আছ, রাগ করে আমার কথা নিও না। এ-সব আমি ভারি দুঃখের সঙ্গেই বলচি। বহুদিন সাহিত্য-চর্চা করে যা ভাল বুঝেচি, তার থেকেই বলচি,—সংযত হওয়া দরকার। তোমরা সীমা অতিক্রম করেচ, একটু-আধটু করেচ তা নয়, অনেকখানি করেচ। একটু-আধটু জায়গায় কোথাও কিছু হলে কিছু হ'তো না। এক্ষেত্রে তা একেবারে নয়। এ-কথার উত্তরে যদি তোমরা কেউ বলো—আমিও ত এটা লিখেচি, রবীন্দ্রনাথও অমন লিখেচেন—হতে পারে, আমরা লিখেচি। তাতে কিন্তু এ প্রমাণ হয় না যে, তোমরা ভাল কাজ করেচ।

স্নেহের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে, এবং তরুণ সাহিত্যিকদের মঙ্গল ইচ্ছা করে এ কথাগুলি বললাম। এইরকম সুবিধা ও অবসর কমই পাওয়া যায়। অনেক-দিন ধরে বলব বলে মনে করেছিলাম। ভাল না লাগলেও কথা-কয়টি বলে দিলাম।

আবার আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এক বৎসর যদি বেঁচে থাকি, আবার আসব। না থাকি ত ভালই হয়। অনেক সময় মনে হয়, যাঁরা দীর্ঘজীবন কামনা করেন, তাঁরা বোধ হয় ভাল কাজ করেন না। শরীর খন অপটু হয়ে পড়ে, তখন আর ইচ্ছা হয় না, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর জীর্ণ শরীর টেনে নিয়ে বেড়াই। দুঃখ-ভোগ যদি কপালে থাকে, আসচে বছর হয়ত আবার দেখা হবে।*

৫৫তম জন্মদিনে

আবার একটা বছর গড়িয়ে গেল। জন্মদিন উপলক্ষে সেদিনও এমনই আপনাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিনও এমনই স্নেহ, প্রীতি ও সমিতির একান্ত শুভ-কামনায় আজকের মতই হৃদয় পরিপূর্ণ করে নিয়েছিলাম, শুধু দেশের অত্যন্ত দুর্দিন স্মরণ করে তখন আপনাদের উৎসবের বাহ্যিক আয়োজনকে সঙ্কুচিত করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। হয়ত আপনারা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করেননি, সে কথা আমার মনে আছে। দুর্দিন আজও অপগত হয়নি, বরঞ্চ শতগুণে বেড়েচে, এবং কবে যে তার অবসান ঘটবে তাও চোখে পড়ে না, কিন্তু সেই দুর্দশাকেই সবচেয়ে উচ্চ স্থান দিয়ে শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধতায় জীবনের অন্যান্য আহ্বান অনির্দিষ্টকাল অবহেলা করতেও মন আর চায় না। আজ তাই আপনাদের আমন্ত্রণে শ্রদ্ধানত চিত্তে এসে উপস্থিত হয়েচি।

*চতুর্থ:পঞ্চাশত্তম প্রেসিডেন্সি কলেজে জন্মদিনে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির সভ্যগণের অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ। 'মাসিক বসুমতী', আশ্বিন ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

শুনেছি, সমিতির প্রার্থনায় কবিগুরু একটুখানি লিখন পাঠিয়েছিলেন, Liberty-তে তার ইংরেজী তর্জ্জমা প্রকাশিত হয়েচে। তার শেষের দিকে আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার অপ্রত্যাশিত পুরস্কার আছে। এ আমার সম্পদ। তাঁকে নমস্কার জানাই, এবং সমিতির হাত দিয়ে একে পেলাম বলে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এই লেখাটুকুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাঙলার কথা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটুখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েচেন। বিস্তারিত বিবরণও নয়, দোষ-গুণের সমালোচনাও নয়, কিন্তু এরই মধ্যে চিন্তা করার, আলোচনা করার, বাঙলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক্‌-নির্ণয়ের পর্য্যাপ্ত উপাদান নিহিত আছে। কবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র উল্লেখ করে বলেচেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র তুলনায় এর সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই। এর মূল্যে স্বদেশ-হিতৈষণায়—মাতৃভূমির দুঃখ-দুর্দ্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় প্রচারে, তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে। অর্থাৎ 'আনন্দমঠে' সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেচে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-সম্বন্ধে এমন কথা বোধ করি এর পূর্ব্বে আর কেউ বলতে সাহস করেনি। এবং এ-কথাও হয়ত নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, কথা-সাহিত্যের ব্যাপারে এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত অভিমত। এই অভিমত গন্তব্য-পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল। এবং যারা পারবে, উত্তরকালে তাদের গন্তব্য পথের সন্ধান এইখানে পাওয়া গেল এবং যারা পারবে না, তাদেরও একান্ত শ্রদ্ধায় মনে করা ভালো যে, এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের - যাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও instinct প্রায় অপরিমেয় বলা চলে।

গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় স্বদেশের দুঃখের কাহিনী, অনাচার অত্যাচারের কাহিনী কি করে যে লেখকের অন্যান্য রচনা ছায়াচ্ছন্ন করে দেয়, আমি নিজেও তা জানি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-সভায় গিয়েও তা অনুভব করে এসেচি। বছর-কয়েক পূর্ব্বে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য-সভায় একবার উপস্থিত হতে পেরেছিলাম। দেখলাম, তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েচেন, বক্তার পরে বক্তা—সকলের মুখেই ঐ এক কথা,—বঙ্কিম 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিম মুক্তি-যজ্ঞে প্রথম পুরোহিত। সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি গিয়ে পড়লো একা 'আনন্দমঠে'র 'পরে। 'দেবী চৌধুরাণী', 'কৃষ্ণচরিত্তে'র উল্লেখ কেউ কেউ করলেন বটে, কিন্তু কেউ নাম করলেন না 'বিষবৃক্ষে'র, কেউ স্মরণ করলেন না একবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে। ঐ দুটো বই যেন পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক, ওর জন্যে যেন মনে মনে সবাই লজ্জিত। তার পরে প্রত্যেক সাহিত্য-সম্মিলনীর যা অবশ্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ আধুনিক সাহিত্যসেবীদের নির্ব্বিচারে ও

প্রবলকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের স্মৃতি-সভার পুণ্য-কার্য্য সেদিনের মতো সমাপ্ত হ'লো। এমনিই হয়।

কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি, বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা, যিনি তখনকার দিনেও বাঙলা ভাষার নবরূপ, নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্গ-সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম', লিখতে গেলেন? কোন্ প্রয়োজন তাঁর হয়েছিল? কারণ, এ-কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তাঁর কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কোনদিন এ সমস্যার মীমাংসা করে দেবেন। আজ সকল কথা তাঁর বুঝিনি, কিন্তু সেদিন হয়ত আমার নিজের সংশয়ের মীমাংসাও এর মধ্যে খুঁজে পাবো।

কবি তাঁর বাল্য জীবনের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন, সে তাঁর চোখের দৃষ্টি-শক্তির ক্ষীণতা। এ তিনি জানতেন না। তাই, দূরের বস্তু যখন স্পষ্ট করে দেখতে পেতেন না, তার জন্যে মনের কোন অভাব-বোধও ছিল না। এটা বুঝলেন চোখে চশমা পরার পরে! এবং এর পরে চশমা ছাড়াও আর গতি ছিল না। এমনিই হয়—এ-ই সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম। বাঙলায় শিক্ষিত মন কেন যে 'বিজয়-বসন্তে'র মধ্যে তার রসোপলব্ধি উপাদান আর খুঁজে পায় না, এই তার কারণ। এবং মনে হয় আধুনিক সাহিত্য বিচারেও এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য-রচনায় আর যাই কেন-না হোক, শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্র রুচি ও মার্জ্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারংবার আঘাত করতে থাকলে বাঙলা-সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক, তাঁদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশী। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।

বলবার হয়ত অনেক কিছু আছে, কিন্তু আজকের দিনে আমি সাহিত্য-বিচারে প্রবৃত্ত হবো না।

শেষের একটা নিবেদন। শ্রদ্ধা ও স্নেহের অভিনন্দন মন দিয়ে গ্রহণ করতে হয়, তার জবাব দিতে নেই।

আপনারা আমার পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।*

*৫৫তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতি প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে পঠিত ভাষণ।

৫৭তম জন্মদিনে

৩১এ ভাদ্র—আমার জন্মদিনের আশীর্ব্বাদ-গ্রহণের আহ্বান আমার স্বদেশের আপনজনদের কাছ থেকে প্রতি বৎসরই আসে; আমি শ্রদ্ধানত শিরে এসে দাঁড়াই; অঞ্জলি ভরে আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাড়ি যাই,—সে আমার সারা-বছরের পাথেয়। আবার আসে ৩১এ ভাদ্র ফিরে, আবার আসে আমার ডাক, আবার এসে আপনাদের কাছে দাঁড়াই। এমনি করে এ জীবনের অপরাহ্ন সায়াহ্নে এগিয়ে এলো।

এই ৩১এ ভাদ্র বছরে বছরে ফিরে আসবে, কিন্তু একদিন আমি আর আসবো না। সেদিন এ কথা কারো বা ব্যথার সঙ্গে মনে পড়বে, কারো বা নানা কাজের ভিড়ে স্মরণ হবে না। এই-ই হয়, এমনি করেই জগৎ চলে।

কেবল প্রার্থনা করি, সেদিনও যেন এমনিধারা স্নেহের আয়োজন থেকে যায়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ, বাণীর মন্দিরে যাঁরা নবীন সেবক, তাঁরা যেন এমনি সভাতলে দাঁড়িয়ে আপনাদের দক্ষিণ হস্তের এমনি অকুণ্ঠিত দানে হৃদয় পূর্ণ করে নিয়ে গৃহে যেতে পারেন।

আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক পেলাম,—আমার প্রাপ্যেরও অনেক বেশী।

আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ। ঋণ কি শুধু আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্য্যগণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাঁদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেচি অবিচার, কত দেখেচি কুবিচার, কত দেখেচি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে; সংসারে সৌন্দর্য্যে সম্পদে ভরা বসন্ত আসে জানি; আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতি-জাতি যুথি, আনে গন্ধব্যাকুল দক্ষিণা পবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল, তার ভিতরে ওরা দেখা দিলে না। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটলো না। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েচি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। এমনি আরও অনেক-কিছুই—এ-জীবনে যাঁদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি, স্পর্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা

তাঁদের ক্ষুণ্ণ করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্য আমার বিস্তৃত ও ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্প-পরিসরবদ্ধ। তবুও এইটুকুও দাবী করি, অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্যভ্রষ্ট করিনি।

আমার বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। প্রতি সাহিত্য-সাধকের অন্তরেই পাশাপাশি বাস করে দু'জনে; তার একজন হলো লেখক, সে করে সৃষ্টি, আর অন্যজন হ'লো তার সমালোচক, সে করে বিচার। অল্প বয়সে লেখক থাকে প্রবল পক্ষ,—অপরকে সে মানতে চায় না। একজন পদে পদে যতই হাত চেপে ধরতে চায়, কানে কানে বলতে থাকে,—পাগলের মতো লিখে যাচ্ছো কি, থামো একটুখানি—প্রবলপক্ষ ততই সবলে হাত দুটো তার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চালিয়ে যায় তার নিরঙ্কুশ রচনা। বলে, আজ ত আমার থামবার দিন নয়,—আজ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের গতি বেগে ছুটে চলার দিন। সেদিন খাতার পাতায় পুঁজি হয় বেশী, স্পর্দ্ধা হয় ওঠে অভ্রভেদী। সেদিন ভিত থাকে কাঁচা, কল্পনা হয় অসংযত উদ্দাম; মোটা গলায় চেঁচিয়ে বলাটাকেই সেদিন যুক্তি বলে ভ্রম হয়। সেদিন বইয়ে-পড়া ভালো-লাগা চরিত্রের পরিস্ফীত বিকৃতিকেই সদম্ভে প্রকাশ করাকে মনে হয় যেন নিজেরই অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি।

হয়ত, সাহিত্য-সাধনায় এইটিই হচ্ছে স্বাভাবিক বিধি; কিন্তু উত্তরকালে এর জন্যই যে লজ্জা রাখার ঠাঁই মেলে না এ-ও বোধ করি এর এমনিই অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমার প্রথম যৌবনের কত রচনাকেই না এই পর্যায়ে ফেলা যায়।

কিন্তু ভাগ্য ভাল, ভুল আমার আপনার কাছেই ধরা পড়ে। আমি সভয়ে নীরব হয়ে যাই! তারপরে দীর্ঘদিন নিঃশব্দে কাটে। কেমন করে কাটে, সে বিবরণ অবান্তর। কিন্তু বাণীর মন্দিরদ্বারে আবার যখন ফিরিয়ে এনে আত্মীয়-বন্ধুরা দাঁড় করিয়ে দিলেন, তখন যৌবন গেছে শেষ হয়ে, ঝড় এসেচে থেমে, তখন জানতে বাকী নেই সংসারে সংঘটিত ঘটনাই কেবল সাহিত্যে সত্য নয়, এবং সত্য বলেই তা সাহিত্যের উপাদানও নয়। ওরা শুধু ভিত্তি এবং ভিত্তি বলেই থাকে মাটির নীচে সঙ্গোপনে,—থাকে অন্তরালে।

তখন আমার আপন বিচারক বসেচে তার সুনির্দিষ্ট আসনে; আমার যে আমি লেখক, সে নিয়েচে তার শাসন মেনে। এদের বিবাদের হয়েচে অবসান।

এমনি দিনে একজন মনীষীকে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করি; তিনি স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের শিক্ষক। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই নগরেরই এক পথের ধারে। ডেকে বললেন, শরৎ, তোমার লেখা আমি পড়িনি, কিন্তু লোকে বলে সেগুলো ভালই হচ্ছে। একদিন তোমাদের আমি পড়িয়েচি। আমার আদেশ রইল—যা সত্যই জানো না, তা কখনো লিখো না। যাকে উপলব্ধি করোনি, সত্যানুভূতিতে যাকে আপন করে পাওনি, তাকে ঘটা করে ভাষার

আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক-ঠকিয়ে বড় হতে চেয়ো না। কেননা, এ ফাঁকি কেউ না-কেউ একদিন ধরবেই, তখন লজ্জার অবধি থাকবে না। আপন সীমানা লঙ্ঘন করাই আপন মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা! এ ভুল যে করে না, তার আর যে দুর্গতিই হোক, তাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় না। অর্থাৎ, বোধ হয় তিনি এ-কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, পেটের দায়ে যদি-বা কখনও ধার করো, ধার করে কখনও বাবুয়ানি ক'রো না।

সেদিন তাঁকে জানিয়েছিলাম, তাই হবে।

আমার সাহিত্য-সাধনা তাই চিরদিন স্বল্প-পরিধিবিশিষ্ট। হয়ত, এ আমার ত্রুটি, হয়ত এ-ই আমার সম্পদ, আপনাদের স্নেহ ও প্রীতি পাবার সত্য অধিকার। হয়ত আপনাদের মনের কোণে এই কথাটা আছে—এর শক্তি কম, তা হোক, কিন্তু এ কখনও অনেক জানার ভান করে আমাদের অকারণ প্রতারণা করেনি।

এমনি একটা জন্মদিন উপলক্ষে বলেছিলাম, চিরজীবী হবার আশা আমি করিনে কারণ, সংসারে অনেক কিছুর মতো মানব-মনেরও পরিবর্ত্তন আছে; সুতরাং, আজ যা বড় আর একদিন তা-ই যদি তুচ্ছ হয়ে যায় তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেদিন আমার সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগতর অবহেলায় ডুবে যায়, আমি ক্ষোভ করব না। শুধু মনে এই আশা রেখে যাবো, অনেক-কিছু বাদ দিয়েও যদি সত্য কোথাও থাকে সেটুকু আমার থাকবে। সে আমার ক্ষয় পাবে না। ধনীর অজস্র ঐশ্বর্য্য নাই বা হ'লো, বাগ্‌দেবীর অর্ঘ্য-সম্ভারে ঐ স্বল্প সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্যই আমার আজীবন সাধনা। দিনের শেষে এই আনন্দ মনে নিয়ে খুশী হয়ে বিদায় নেবো, ভেবে যাবো আমি ধন্য, জীবন আমার বৃথায় যায়নি।

উপসংহারে একটা প্রচলিত রীতি হচ্ছে, শুভানুধ্যায়ী প্রীতিভাজন বন্ধুজনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো। কিন্তু এ প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পেলাম না। তাই শুধু জানাই, আপনাদের কাছে সত্যই বড় কৃতজ্ঞ।*

---

* ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে ২রা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনের প্রতিভাষণ। 'ভারতবর্ষ' কার্ত্তিক, ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২

আমার তরুণ বন্ধুগণ, আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ আমি আজ লাভ করলাম—আমি তোমাদের চিত্তলোকে স্থান পেয়েচি, তোমরা আমাকে ভালবেসেচ। আমার সাহিত্য-সেবার এর চেয়ে বড় পুরস্কারের কথা কল্পনা করতে পারিনে। যে তরুণ-শক্তি যুগে যুগে কালে কালে পৃথিবীকে নূতন করে গঠন করে, দৃষ্টি যাদের প্রসারিত, অন্যায় বন্ধন যারা মানে না, বড় মন নিয়ে সর্ব্বত্যাগের বাণীকে অবলম্বন করে যারা যে-কোনও মুহূর্ত্তে হাসিমুখে পৃথিবীর বন্ধুরতম পথে যাত্রা করতে পারে, তারা আজ আমাকে তাদের আপনার জন বলে স্বীকার করেচে, এ আনন্দের স্মৃতি আমার চিরজীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল। আমার সাহিত্য-সাধনার মূল নির্দ্ধারণ করবার ভার আমি তোমাদের উপর দিয়েচি; ভরসা আছে, আর যে যাই বলুক, তোমরা কোনদিন আমাকে ভুল বুঝবে না। দেশের জন্যে, অবহেলিত মানব-সমাজের জন্যে আমি কতটুকু করেচি তা স্থির করবার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর। বহুবার বহুস্থানে যে-কথাটি আমি বলেচি, তোমাদের কাছে আজ সেই কথারই পুনরুল্লেখ করতে চাই। মিথ্যাকে তোমরা কোনদিন কোন ছলেই স্বীকার ক'রো না; সত্যের পথ, অপ্রিয় সত্যের পথ—যদি পরম দুঃখের পথও হয়, তা হলেও সে দুঃখ-বরণের শক্তি নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করো। দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করচে, সে ভবিষ্যৎ যে কখনও দুর্ব্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোকে যেন এই কথাটা নিরন্তর মনে রাখতে পারে। তোমাদের আমি আশীর্ব্বাদ করি, জীবন তোমাদের সার্থক হোক, সাধনা তোমাদের সফল হোক এবং আরও যে-কটা দিন বাঁচি তোমাদের দিকে চেয়ে আমিও যেন বল লাভ করতে পারি।*

* ৫৭তম জন্মদিন উপলক্ষে ১লা আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ সেনেট হলে ছাত্র-ছাত্রী-সমাজের প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তর। 'ভারতবর্ষ' কার্ত্তিক ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫৯তম জন্মদিনে

বর্ষে বর্ষে ভাদ্রের শেষ দিনে—আমার জন্মদিনে—Indian State Broadcastingএর কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন পাই তাঁদের সস্নেহ আহ্বানে। শুভকামী, শুভভাষী বন্ধুজন এসে সমাগত হন তাঁদের Studio Hall এ; আমাকে যে তাঁরা ভালবাসেন এই কথাটি শুধু আমাকেই নয়, বেতার প্রতিষ্ঠানের সহযোগে ও সৌজন্যে দেশের সর্ব্বত্র ও বার্ত্তা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁরা আনন্দ লাভ করেন। আজকের দিনে অন্তরের কৃতজ্ঞতা কেবল তাঁদের জানিয়েই আমার কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, অদৃশ্যে অলক্ষ্যে বসে যাঁরাই এ-কথা আমার শুনচেন আজ তাঁদের কাছেও আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

কিন্তু এই সম্মাননা শুধু আমার ব্যক্তিত্বকে মাত্র অবলম্বন করে নেই। আমার মধ্যে যিনি বাণীর সাধক এ সমাদর তাঁর এবং আরও অনেকের—আমার মতই যাঁরা মানুষের সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও ব্যথা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রূপ-রসে সমুজ্জ্বল করে ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছেই প্রকাশিত করার সাধনা গ্রহণ করেচেন। সুতরাং আজকের এই বিশেষ উপলক্ষটিকে যদি আমার নিজের বলেই মনে না করি ত সহজেই বলা যায়, বেতার প্রতিষ্ঠানের এই আয়োজন দেশের সাহিত্য-সেবারই আয়োজন। তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

বৎসরকাল পূর্ব্বে এই উপলক্ষে যেদিন এসেছিলাম আজ সেদিনের কথা আমার মনে পড়ে। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে কত বিচিত্রভাবে একটা বছর কেটে গেছে। সেদিন যাঁরা শ্রোতা ছিলেন তাঁদের চিনিনে, তবু জানি তাঁরা আমার আপন-জন। তাঁদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ নেই, হয়ত মৃত্যু এসে তাঁদের অপসারিত করেচে; আবার হয়ত কত নূতন জন এসে তাঁদের শূন্য স্থান পূর্ণ করেচেন। এমনিই জগৎ; এমনি আমিও একদিন আসব না, সেদিন একত্রিশে ভাদ্রর জন্মতিথি অনুষ্ঠান বন্ধ হবে। আবার নূতন কোন সাহিত্য-সেবকের জন্মদিন-উৎসব আজকের শূন্য স্থান ভরিয়ে তুলবে। বেতার-প্রতিষ্ঠান চিরজীবী হোক—নূতন আবির্ভাবের শুভ-বার্ত্তা যেন তাঁরা এমনি করেই সেদিনও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত করেন।

আমার কণ্ঠস্বরে আমার কথা যাঁরা আজ শুনতে বসেচেন তাঁদের দেখতে পাইনে বটে, কিন্তু মনে হয় যেন নেপথ্যের অন্তরাল থেকে তাঁদের নিশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাই! কেহ দূরে, কেহ কাছে—তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞ-চিত্তের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। ১২ই আশ্বিন ১৩৪১।*

* ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের 'শরৎ শর্ব্বরী' অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বাণী 'বেতার জগৎ', ২৯শে আশ্বিন ১৩৪১ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৬২তম জন্মদিনে

বেতার-প্রতিষ্ঠানের স্নেহাস্পদ বন্ধুদের আমন্ত্রণে বছরে বছরে আমি এই প্রতিষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েচি। আমার জন্মতিথি উপলক্ষে বন্ধুরা এই আয়োজন প্রতি বৎসরে করে থাকেন। এবারেও তাই ৬২ বৎসর বয়সে পা দিয়ে আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ চেয়ে নেবার পূর্ব্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—যিনি আজ রোগশয্যায়—তাঁকে প্রণাম করি। এ জগতে সাহিত্য-সাধনায় তাঁর আশীর্ব্বাদ, এটি আমার নয়, প্রতি সাহিত্যিকের পরম সম্পদ। সেই আশীর্ব্বাদ আমি আজকের দিনে, তিনি শুনতে না পেলেও আমি চেয়ে নিলাম।

এখানে যে-সব বন্ধুরা এসে উপস্থিত হয়েচেন, শুধু সাহিত্যের জন্য নয়, পরস্পরের অন্যান্য আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে তাঁরা আমাকে বাস্তবিক ভালবাসেন। আমি তাঁদের স্নেহ করি, তাঁরা আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে সমবেত হয়েচেন।

আপনারা শুনলেন যে, সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে যদি আমি বাঙলা দেশকে কিছু দিতে পেরে থাকি, তার জন্যে এবং আমাকে ভালবাসার জন্যে আমার দীর্ঘজীবন তাঁরা কামনা করলেন। আজ ৬২ বৎসরের গোড়ায় ভাবি যে, এই দীর্ঘজীবন সত্যি মানুষের কাম্য কি না। যাঁরা আমার দীর্ঘজীবন আজ কামনা করচেন, তার মধ্যে শুধু একটিমাত্র সাহিত্যিককে বলতে শুনেচি, তিনি হেমেন্দ্র রায়, তিনি আমার সাহিত্যিক দীর্ঘজীবন কামনা করেচেন, কেবলমাত্র আমার দীর্ঘজীবন তিনি কামনা করেননি। এ জিনিসটা আমাকে ভারী আনন্দ দিয়েচে। হাঁ, যদি সাহিত্যিকের মত হয়ে এই বাঙলা দেশকে কিছু দিতে পারি, সে শক্তি ভগবান যদি রাখেন এবং তার সঙ্গে যদি দীর্ঘজীবন দেন আপত্তি নেই, কিন্তু সে যদি না থাকে, যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে সেই জীবন কারুরই কাম্য নয়, বিশেষ করে সাহিত্যিকের ত নয়ই।

আপনারা শুনেছিলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সে অবস্থা এখন আর আমার নেই, তাহলেও স্বাস্থ্য একেবারে চিরদিনের মত ভেঙে গেছে এবং আশা করতে পারি না যে, বছরে বছরে এই-সব বেতার-প্রতিষ্ঠানের বন্ধুদের আমন্ত্রণে আসতে পারব। আমার নিজের সাহিত্য-সাধনার ব্যাপারে নিজের মুখে কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকুই ইঙ্গিতে বলতে পারি যে, অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে এই সাধনায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েচি। কোনদিনই মনে করিনি যে, আমি সাহিত্যিক হবো বা কোন বই আমার কোনদিনই প্রকাশিত হবে। এমন কি, যা লিখেচি তাও সঙ্কোচে, দ্বিধায়, পরের নামে। তার কোনও মূল্য আছে কি না ভাবতে পারিনি। তার পরে দীর্ঘকাল, বোধহয় এমন ১৫।১৬ বৎসর সাহিত্যচর্চ্চার ধার দিয়েও যাইনি। ভুলেও মনে হ'তো না যে, আমি কোন-

দিন লিখি। তারপরে আবার নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমার এই জীবন; এইটিই হয়ত সত্যকার জীবন। অন্ততঃ ভগবান বোধহয় এই জীবনটা আমার জন্ম নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাই ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ঘুরে-ফিরে আবার এরই মধ্যে একষট্টিটা বছর আমাকে কাটাতে হ'লো। সত্যি, আমি আপনাদের মাঝখানে বেশী দিন থাকি বা না-থাকি, আমার এ-কথাটা হয়ত আপনাদের মাঝে মাঝে মনে পড়বে যে, তিনি বলে গেছেন যে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাঁর এই সাহিত্য-সাধনা ধীরে ধীরে বাধা ঠেলে চলেছিল। এর মধ্যে যাঁরা আজ আমার কথা শুনচেন, তাঁদের মধ্যে যদি কেউ সাহিত্যচর্চ্চা করেন, অন্ততঃ সাহিত্যকে যদি তিনি অবলম্বন করেন, এই যদি তাঁর মনের বাসনা থাকে এবং সঙ্কল্পও যদি তাঁর স্থায়ী থাকে, তবে এই জিনিসটাকে তাঁকে নিশ্চয়ই প্রতিদিন মনে রাখতে হবে যে, এ হঠাৎ কিছু একটা গড়ে ওঠবার জিনিস নয়।

এই অনুষ্ঠানে আমাকে আহ্বান করে যাঁরা এনেচেন, তাঁদের প্রতি-বৎসর যেমন কৃতজ্ঞতা জানিয়েচি, শ্রদ্ধা জানিয়েচি, এবারেও তাঁদের তেমনি ভালবাসা জানাই। যে-সব বন্ধু এই সভায় এসে আজ উপস্থিত হয়েচেন, প্রয়োজন না থাকলেও তাঁদের আর একবার করে আমার শ্রদ্ধা, আমার স্নেহ জানাই যে, এই থেকে কোন-দিন তাঁরা আলাদা না হয়, এই যে-জিনিসটা তাঁদের কাছে থেকে আমি পেলাম, এই যেন তাঁরা যতদিন বাঁচি দিয়ে যান—এমনি করে যেন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়ে আমাকে ধন্য করে যান।

যাঁরা শুনচেন আমার কথা, তাঁদের কাছেও আমার প্রার্থনা যে, হেমেন্দ্র রায় যে কথা বলেচেন সেইটাই যেন সফল হয়—আমার সাহিত্যিক দীর্ঘজীবন যেন পাই, তা না হলে শুধু শুধু দীর্ঘজীবন যেন আমার বিড়ম্বনার মতন না এসে জোটে।*

*শরৎচন্দ্রের এই ভাষণটি বেতার মারফৎ প্রচারিত হয় এবং কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে উহার রেকর্ড গৃহীত হইয়াছিল। 'দীপালী' ২০এ মাঘ ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২

আজ দেশের বড় দুর্দিন। আজ আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ। আজকের দিনে আমার ইচ্ছে ছিল না জন্মদিনে এইরূপ আনন্দ করা, কিন্তু তোমাদের ডাক, তোমাদের সম্পাদকের আবদার আমায় রাখতে হ'লো, কবে আছি, কবে নেই—হয়ত আজকের ৩১শে ভাদ্র আর ফিরে আসবে না। সেইজন্য আসতে হ'লো, তোমাদের ডাককে উপেক্ষা করতে পারলাম না। ৬১টা ত চলে গেল—কিছুই করতে পারলাম না। জানি না ৬২টাও কি-রকমভাবে যাবে, যদি আবার ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে ত তোমাদের কাছে নিশ্চয় আসব।

তোমাদের কাছে আজকে আমি দুটি কথা বলতে এসেচি। বাঙালী বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে। আগে দেখতুম বাঙালী সব উঁচু উঁচু পদে রয়েচে, কিন্তু আজ আর সে-দিন নেই। আগে ছিল বাঙালীর সম্প্রসারণের যুগ, আর আজ বাঙালীর সঙ্কোচনের যুগ। বাঙালী আজ জীবন-সংগ্রামে হটে যাচ্ছে, বাঙালী আজ বিপর্য্যস্ত। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, তোমারা দেশের গুণী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা সম্মান দিতে কোনদিন যেন কার্পণ্য না করো। এই কথাটা সব সময় মনে রেখো যে, এতে কেবল তা'দিগকে সম্মান করা হয় মাত্র তা নয়, পরন্তু এইরূপ সম্মান-প্রদর্শনে দেশের ব্যক্তিদিগের গুণের সমাদর করা হয়, আর দেশবাসীকে তাঁহার গুণ-সম্বন্ধে সচেতন করবার সুযোগ ঘটায়। কোন ব্যক্তিকে সমালোচনা করা আমি আদৌ নিন্দনীয় মনে করি না। এতে বরং সমালোচনার পাত্রটিকে নানা বিষয়ে অবহিত হতে সাহায্য করে। উপযুক্ত সমালোচনা সর্ব্বদাই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচনা করতে গিয়ে যদি তাঁকে নানারূপে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়, তা হলে এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছু নেই। এ-রকম আক্রমণে পরশ্রীকাতরতাই দেখান হয়। আজকাল বাঙলাদেশে বিশেষভাবে এই পরশ্রীকাতরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দিনে দিনে পরশ্রীকাতরতার বিষময় ফল বাঙালী সমাজকে পঙ্গু করে তুলচে।

তোমাদের কাছে আমার আবার অনুরোধ, এইরূপ মনোভাব যেন তোমরা না পোষণ কর।

আজকে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিই।*

* স্কটিশ চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত ৬২তম জন্মদিন উপলক্ষে (৩১শে ভাদ্র ১৩৪৪) 'বাংলা সাহিত্য সমিতি'-প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা।

৩

আমার জন্মদিন উপলক্ষে কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় নিজে বসে আছেন, তোমরা ছাত্র-ছাত্রীরা আছ; তোমরা আমার দীর্ঘজীবন কামনা করলে, আমাকে আনন্দ দেবার জন্য আমারই বই থেকে নাটকের কিছু কিছু অংশ অভিনয় করলে। এর জন্য তোমাদের সকলকে আমার স্নেহ-ভালবাসা জানাই। আমাকে আনন্দ দেবার জন্য আজ তোমরা অনেকরকম আয়োজন করেচ—তোমাদের সমস্ত আয়োজন অন্তরে গ্রহণ করচি, কিন্তু অসুস্থ শরীরে আর এই বৃদ্ধকালে তোমাদের সব ব্যাপারে যোগ দেওয়ার জন্য বেশীক্ষণ বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই, তোমাদের অভিনয়ের মাঝখানে বলতে হ'লো—আমাকে ছেড়ে দাও। তিনটায় বেরিয়েচি, বড় strain হচ্ছে, শরীর অত্যন্ত খারাপ। যখন বয়স বাড়ে, তখন স্থিরতা থাকে না। কোনদিন কে আছে কে নাই। আজ যখন সুযোগ হ'লো, যখন তোমরা বললে—৩১শে ভাদ্র আমাকে আসতে হবে বিদ্যাসাগর কলেজে, আমি রাজি হলাম এইজন্য যে, আসচে বছর এ-রকম সুযোগ হবে কি না জানি না। তোমাদের কাছে আমার আবেদন বল, নিবেদন বল এই—তোমরা যখন বড় হবে, তখন আমাদের নাম তোমাদের সামনে থাকবে কি না থাকবে জানি না। হয়ত দেশের রুচি তখন এমন বদলে যাবে, তোমরা সেগুলি পড়বে না। এটা আশ্চর্য্য নয়। জগতে এইরকম অনেক হয়, হয়েচে, সেগুলি পুরানো লাইব্রেরীতে থাকে, লোকে প্রশংসা করে, কিন্তু পড়ে না। বাঙাদেশের অনেক বড় গ্রন্থকারের ভাগ্যে এ-রকম ঘটেচে, হয়ত আমাদের ভাগ্যে সে রকম হতে পারে। যদি হয়, তবে আমি তাকে দুর্দ্দিন মনে করব না। আমি মনে করব, দেশের সাহিত্য এত বড় হয়েচে, এত ভাল হয়েচে, এগুলি তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। বাঙলাদেশের দু-একজনের ব্যক্তিগত জীবনই বড় নয়। বড় হচ্ছে জাতীয় সাহিত্য ও ভাষা। সে-সম্বন্ধে আমার যতটুকু চেষ্টা করেচি, তাকে যতটুকু বাড়াতে পেরেচি,—হয়ত পেরেচি, নইলে এত লোক আমাকে ভালবাসত না—করেচি, তা যদি না থাকে,—ধর আরও কুড়ি বৎসর পর—তা হলে সেটা যে ভাষার পক্ষে দুর্দ্দিন তা বলব না। সে যাই হোক, নিজের যতটুকু শক্তি ছিল করেচি, যতটা আয়ু ছিল বেঁচেচি। তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি এবং বলি, বাঙলা—যে ভাষাতে জ্ঞান হওয়া অবধি কথা বলতে আরম্ভ করেচ, সেটা তোমাদের মাতৃভাষা। এর উপর যেন কোনদিন তোমাদের অশ্রদ্ধা না হয়; এটা যেন তোমরা বাড়িয়ে তুলতে পার। বহু লোকের চেষ্টায় একটা জিনিস বাড়ে; তার মধ্যে একজন উঁচু হয়ে উঠে। বহু লোক সাহিত্যকে ভালবেসেচে, তার সাধনা করেচে, কবে তারা এখন অনেক মাটির নীচে চাপা পড়েচে। তাদের নাম পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েচে। কিন্তু শক্ত জমির উপর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্ভবপর হয়েচে, আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়। সকলেরই কারণ থাকে,

তোমাদের মধ্যে যার মনে হয়—আমি কিছু করতে পারব, আমার দ্বারা কিছু হয়ত হতে পারে, তারা যেন এর চর্চ্চা না ছাড়ে; যেন প্রাণপণে তারা মাতৃভাষাকে বড় করতে চেষ্টা করে, তা নইলে মানুষ বড় হবে না। ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় চিন্তা করা যায় না, ইংরেজীতে লিখতে পার, কিন্তু মাতৃভাষাকে বড় করে না তুললে চিন্তা চিরদিন ছোট হয়ে থাকবে।

আমি বক্তা নই, বলতে আমি পারি না, সে ভাষাও আমার নাই। যেটুকু মনে হ'লো জানালুম। আর কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় যাঁরা বসে আছেন, আর আমার দাদা জলধর-দা যদিও তিনি অতিথি, তথাপি বলি—এই বয়সে আমার জন্য এসে সমস্তক্ষণ বসে আছেন; আর যে-সমস্ত বন্ধু-বান্ধব সাহিত্যিক এসেচেন তাঁদের সকলকে সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কলেজের ছাত্রছাত্রী সকলকে আমার স্নেহ শ্রদ্ধা ভালবাসা জানালুম। আবার যদি ৩১শে ভাদ্র ফিরে আসে দেখা হবে, নইলে তোমাদের কাছ থেকে বিদায়।*

* ৬২তম জন্মদিবসে (৩১শে ভাদ্র ১৩৩৪) বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত অভিনন্দন সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

পত্র-সঙ্কলন

পত্র-সঙ্কলন

কল্যাণীয়েষু—মণ্টু, আজ তোমার পোস্টকার্ড ও 'বহুবল্লভে'র ফর্ম্মার পুলিন্দা পেলাম। তুমি হয়তো জানো না যে আমি ৮।৯ মাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশের বাড়ি থেকে এখানে আসবার পথে sun-stroke-এর মতো হয়, সেই পর্য্যন্ত চোখের ও মাথার ব্যথায় কত যে পীড়িত সে আর বলব কি। আজও সারেনি, বাকী দিন কটায় সারবে কি না তাও জানিনে। তার ওপর আছে অর্শের অজস্র রক্তস্রাব (বহু পুরাতন ব্যাধি) এবং মাসখানেক থেকে শুরু হয়েছে মাঝে মাঝে জ্বর। তোমাকে চিঠি লিখচি জ্বরের উপরেই। দেশের বাড়িতেই থাকি, শুধু মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে কলকাতায় আসি। লেখা কিংবা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। এ জীবনের মতো লেখাপড়া যদি শেষ হয়েই থাকে ত অভিযোগ করব না। যেটুকু সাধ্য ও শক্তি ছিল করেচি, তার বেশি যদি না-ই পারি ক্ষোভ করতে যাবো কেন ? মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরাগী—এখনও তা-ই যেন থাকতে পারি।

একদিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য এসে বলেছিল, মণ্টুবাবুর 'দোলা' চমৎকার হয়েছে। শুনে বিস্মিত হইনি। আমি মনে মনে জানি মণ্টুর উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরও চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায় ? তা ছাড়া উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া রয়েছে artist হৃদয়। যেমন বৃহৎ, তেমনি ভদ্র, তেমনি পরদুঃখকাতর তোমার রসজ্ঞ মনের পরিচয় ছেলেবেলাতেই তোমার সংগীত, তোমার গুণিজনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, তোমার নানা কাজে আমি পেয়েছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহও আমার তাই অকৃত্রিম। কোন বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়। তোমার লেখার সম্বন্ধে যে শুভকামনা বহুদিন পূর্ব্বে করেছিলাম আজ তা সফল হতে চললো এ আমার বড় আনন্দ। আবার আশীর্ব্বাদ করি জীবনে তুমি সুখী হও, সার্থক হও!

বুদ্ধদেব বসুর 'বাসর ঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখিনি। বুদ্ধদেব বসু যদি বলে থাকেন, আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক, সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্টু। নিজের মন ত জানে এ সত্য, পরম সত্য।

এ ছাড়াও আর একটা কথা এই যে, আমার চেয়ে কে বড়ো, কে ছোটো এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বলতেন,

আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদবাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করচি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সারা জীবন করেছি। এই জন্যই কোন আক্রমণেরই প্রতিবাদ করিনে। যৌবনে এক-আধটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে, কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল ক'রে করেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশীদিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করিনে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনিধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোন কারণেই কাউকে ব্যথা দিয়ো না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

বাড়িগুলো তোমার বিক্রী ক'রে দিচ্চো? কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন আছে? এ-দেশের সকল সম্বন্ধ তুমি ছিন্ন করে ফেলেচো ভাবলে বড় ক্লেশ বোধ হয়।

আমার চিঠি-লেখা চিরকালই এলো-মেলো হয়, বিশেষতঃ এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ভাল যদি একটু বোধ করি তোমার দুখানা বই-ই মন দিয়ে পড়বো।*

ইতি—শুভকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩রা মাঘ, ১৩৪২

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

২০শে পৌষ, ১৩৩৮ [জানুয়ারী, ১৯৩২]

পরম কল্যাণীয়েষু,

অমল, ফিরে এসে অবধি ভাবছি তোমাকে লিখব, কিন্তু শরীরে দেয়নি। আমি চিরকাল ঘুম-কাতুরে মানুষ, কিন্তু কি যে হয়েছে জানিনে,—আমার ঘুম যেন কোথায় পালিয়েছে। শরীরে এমন অস্বস্তি কখনো বোধ করিনি। পায়ের একটা পুরোনো ব্যথাও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

সত্যি অমল, আমি যে কতখানি খুশী হয়ে এসেছি, সে তোমরা (না তুমি ?) টাউন হলে সভাপতির আসনে আমাকে টেনে বসালে (রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা-সভায় শরৎচন্দ্র সভাপতি ছিলেন), আমার গলায় মালা দিলে বলে নয়,—আমার লেখা মানপত্র কবির হাতে দিলে বলেও নয়—যেভাবে এই বিরাট

* দিলীপকুমার রায়কে লিখিত।

ব্যাপারটি সম্পন্ন হ'ল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক ক'রে তুললে,—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে কখনো কখনো মন্দ কথা বলেছি, রাগের মাথায়—এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড় ভক্ত আর কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেনি গুরু বলে,—আমার চাইতে কউ বেশী মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার চাইতে বেশীবার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস,—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোকে আমার লেখা প'ড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি। আর কেউ বললে কি না-বললে, মানলে, কি না-মানলে, তাতে কিছু এসে যায় না। তাই আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে যোগ দিয়েছি এই জয়ন্তীতে, না দিয়ে পারিনি। মস্ত বড় কাজ করেছ তুমি। প্রাণ ভ'রে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

শুনেছি তুমি এই জয়ন্তী ক'রে কলকাতায় বাড়ি তুলছ, গাড়ি হাঁকাচ্ছ! তোমার আমার বন্ধুরাই এ কথা পরম উৎসাহে প্রচার করেছেন। জয়ন্তীর গোড়ায় এসে শুনেছি, স্বয়ং কবি তোমাকে খাড়া করেছেন, তাঁর শিখণ্ডী মাত্র তুমি—পেছনে থেকে তিনিই তোমাকে সব করাচ্ছেন। এ যে বাংলাদেশ অমল। 'সোনার বাংলা!' তবু বলতে হবে—'আমি তোমায় ভালবাসি!'

মনে কোন ক্ষোভ রেখো না—যে যা বলে বলুক। আমি জানি তোমার বাড়ি হয়নি, গাড়িও হয়নি—যে গাড়ি চড়ে বেড়াও সেবুঝি কর্পোরেশনের। বাস্, ঐ পর্য্যন্ত। তা না হোক—তোমার ভাল হবে। দেশের মুখ রেখেছ তুমি। তোমাকে সমস্ত অন্তর থেকে আবার আশীর্ব্বাদ জানাই!

তোমার—শরৎদা

অমল হোমকে লিখিত।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট

জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াষু,

রাধু, তোমার বইখানি ('লীলাকমল' কবিতা পুস্তক) পাবার পর থেকে প্রায়ই ভাবতাম, কবিতা নিয়ে কথা কইবার অধিকার ভগবান যদিবা নাই দিয়ে থাকেন, অন্ততঃ বইখানি পেয়েছি এবং আগাগোড়া পড়েছি এ খবরটাও তো দিতে পারি। তাই কেন না দিই ? এমনি ভাবি আর দিন যায়। অবশেষে শিলঙ (এই সময় রাধারাণী দেবী শিলঙ-এ ছিলেন) থেকে এলো চিঠি—এলো নিমন্ত্রণ। মনে মনে লজ্জার অবধি রইল না—স্থির হ'ল এবার আর দেরি নয়—জবাব একটা দেবই দেব। কিন্তু আবার ভাবি, আর দিন যায়—এমনি করে ভাবতে ভাবতে আজ দুপুর র'ত্রে আরাম-কেদারা ছেড়ে অকস্মাৎ উঠে বসেছি এবং কাগজ কলম খুঁজে বার করে নিয়ে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেচি ওপরে যাবার আগে এ চিঠি শেষ কোরবই কোরব। কাল সকালেই যেন ডাকে দিতে পারি।

কিন্তু জানোই ত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে। একবার বহু চেষ্টায় 'হায়'-এর সঙ্গে 'জলাশয়' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, ও হয়নি।

হয়নি ত বটেই, কিন্তু হয় যে কি কোরে সেও ত বুদ্ধির অতীত, সুতরাং আমার মত সুধী ব্যক্তি যত্ন করে এ বই যদি পড়েও থাকেন তাতে তোমাদের মত কবিদের আনন্দ দূরে থাক্ সান্ত্বনাটাই বা কি ?

বুড়ি (নিরুপমা দেবী) ছেলেবেলায় কবিতা লিখতো, মন্দ নয়, সে এটা বোঝে ; তাকে যদি পাঠাতে বোধ করিবা - এমনতর অযোগ্যের হাতে তুলে দেওয়ার আক্ষেপ থেকে রক্ষা পেতে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। জলধর দাদার (জলধর সেন) 'অভাগী' বেরিয়েচে ; আমাদের বাড়ির ইনি (শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী) পড়েন আর কাঁদেন। চোখ-মুখ ফুলে উঠলো, আমাকে কাছে পেয়ে ধিক্কার দিয়ে বললেন, কি যে ছাইপাঁশ তুমি লেখো, এমনি একখানিও যদি লিখতে পারতে।

পারিনে তা মেনে জিজ্ঞাসা করলেম, ব্যাপারটা কি ওতে ?

বললেন ব্যাপার ! এই ভাখো সতীত্বের তেজ !

দেখা গেল—অভাগী তখন কাশীতে। সেখানে দারোগা, কনস্টেবল, বাড়িওয়ালা,

পাণ্ডা, সন্ন্যাসী, সবাই একে একে ব্যর্থ চেষ্টা করে হার মেনেচে। অভাগী অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পেয়ে গেছে কেউ তার কিছুই করতে পারেনি।

কেউ যে কিছুই করতে পারবে না সে আমিও জানতাম, তর্কে হারবার ভয়ে বোললাম, বই তো এখনো শেষ হয়নি, এরি মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হোয়ো না। এখনো কাশীর বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং বাকি। তিনি চেষ্টা করলে ঠেকানো শক্ত।

তখনকার মতো মান থাকলো বটে, কিন্তু পড়া সাঙ্গ হবার পরে যে তা আর থাকবে না এও জানতাম। থাকেও নি।

সে যাক, আমার মুখ থেকে 'লীলাকমলে'র আলোচনা তোমার কাছেও হয়ত ঐ রকমই ঠেকবে। তাছাড়া বাইরে থেকে যে একটু শিখবো তারই কি জো আছে? কেউ বললেন, এমন বই আর হয়নি। এর ভাষা ভাব ছন্দ ছাপা ছবি--অতুলনীয়। নবশক্তি কাগজে আর এক বিশেষজ্ঞ-- কে এক লীলাময় (লীলাময় ছদ্মনামে অন্নদাশঙ্কর রায়) লিখলেন, এমন বিশ্রী বই আর হয় নি। এর সব খারাপ। এমন কি যতীনের (শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন) ছবিটা পর্য্যন্ত তার কলঙ্ক। এবং তিনি হলে এর নাম রাখতেন 'সূর্য্যমুখী'। একটাও ছবি দিতেন না এবং বালির কাগজে ছেপে প্রকাশ করতেন।

এমনি সব সমালোচনার নমুনা। আমার নিজের কিন্তু সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। প্রথম যেদিন তোমার বই এলো, বইয়ের মোড়ক খুলতেই মনে হয়েছিল যেন কোন শিক্ষিত, ভদ্র বড়লোকের ঘরে নিমন্ত্রণে এসেছি। ভিতরে ভোজের ব্যবস্থাটি যে খাসা ও পরিপাটি হবে এ কথা মন যেন আপনিই আন্দাজ করে নিলে। তাই বটে। যেমন ভাষা তেমনি বাঁধুনি, তেমনি প্রকাশভঙ্গী। নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মত বেঁধে সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য্য—কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিত্যতা নেই। ভালো ত তুমি কখনো কাউকে সত্যি বাসোনি রাধু! তুমি বলবে—সবাই কি সত্যিই ভালবেসেছে, আর তারপরে কবিতা লিখেছে বড়দা? আমি তার জবাবে বোলবো—যদি না ভালবেসে থাকে সে তার দুর্ভাগ্য। তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বা কামনাকে দোষী করা যায় না। শুধু দুঃখ করে এইটুকুই বলা যায়, বেচারা সংসারে বঞ্চিত হয়েছে, মানুষ পায়নি,—সে ওর দোষ নয়—ভাগ্য।

কিন্তু তোমার ত তা নয়। সেই লীলময় লোকটা একটা কথা সত্যিই বলেছে যে, রাধারাণীর যোগ্য মানুষ দুনিয়ায় নেই, মানুষের প্রতি তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই 'জীবনদেবতা'কে উৎসর্গ।

কিন্তু, ও জিনিসটি কি ভাই? সত্যিই কি কিছু? · ···

গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি কঠিন তিরস্কারের মত শুধু নিরুদ্দিষ্টকেই নয় পাঠককেও আঘাত করে। সমস্ত বইয়ের উপর যেন মুখ ভার করে তাকিয়ে আছে মনে হয়। তাই হয়ত লীলাময়ের বোধ হয়েছে এ গ্রন্থে আনন্দ নেই, আছে শুধু অভিযোগ।

তুমি ভাবো এ জীবনে তোমার মানুষকে ভালোবাসা দুর্নীতি, পাপ। তোমাকেও যে কেউ ভালোবাসবে সেও গর্হিত—অপরাধ! কেউ যদি তোমাকে বলে—বড়দা তোমাকে মনে মনে ভয়ানক ভালবাসে—শুনলে তুমি রাগে ক্ষেপে যাবে। বলবে—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! কারণ, মনে মনে তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছ—এ দুনিয়ায় কাউকে নয়! এ সম্বন্ধে মনটা তোমার একটা নিশ্চয়তায় পৌঁছে একেবারে কঠিন হয়ে গেছে। এইখানেই মস্ত তফাৎ। আর এই তফাৎটার অতিশয়োক্তিই আকারে মাঝে মাঝে ধরা দেয় তোমার কবিতায়।

রাধু, একটা কথা মনে পড়লো, যৌবনে এককালে ফরাসী সাহিত্যের সখ ছিল। আজ প্রাচীন কালে তার কিছুই মনে নেই, সমস্তই ভুলে গেছি, শুধু দুটো ছত্র মনে পড়ে—

Ah! I'afireaux esclavaga
Qui detre a soi.

ভাবটা এই যে, একান্ত স্বাধীনতার মত এত বড় দাসত্ব আর নেই।

যাক এ সব কথা। আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশী বুদ্ধি ধরো আমি মনে করি।

বইখানিতে না দেখার দোষে অনেকগুলি বানান ভুল হ'য়ে গেছে। শব্দের মাথায় বড় বেশি নিরর্থক কমার চিহ্ন পড়েছে—যথা বধু'র স্বতনে'র মাধবী'র এই সব। কবিরা নিরঙ্কুশ বটে, কিন্তু এই দোষগুলো না করাই ভালো, যেমন 'আলোক অমিয় ক্ষরা'। আলোক শব্দটা তো স্ত্রীলিঙ্গ নয়। রবিবাবুর কবিতায় প্রায় কোথাও এসব ভুল পাওয়া যায় না।·········তবুও এসব অতি তুচ্ছ কথা বোন। আজ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমাকে মস্ত বড় দেখতে পাচ্ছি। আমার এ দেখায় ভুল হয়নি জেনো।

তুমি আমায় শিলঙেও নিমন্ত্রণ করেছো বটে, কিন্তু যাই কি কোরে। আমার ত সাহিত্যচর্চ্চা একপ্রকার বন্ধই হয়েছে, কিন্তু আর একটা কাজ জুটেছে যে। দেশের এই অতি হাঙ্গামার সময়ে পালাই কি বলে? হাবড়া জেলার আমি আবার কংগ্রেসের President: কিছুই করিনে তবু থাকতে তো হয়। অথচ যাবার লোভও প্রবল। সাহিত্যচর্চ্চার অভ্যাসটা আমার প্রায় ছেড়েই গেছে। তোমাদের মত সাহিত্যিকের কাছে এলে আবার যদি তার কিছু অংশ ফিরে পাই তো অনেক লাভ। আমার মতো কুঁড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখনও কোন

কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গায়েন' (জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক) ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়ো না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজা-মিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ-জন্মের মত নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের ত লিখেচি—আর কেন? এ জীবনের ছুটিটা যদি এইদিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে তখন মিয়াদের বাকী দু-চারটে বছর ভোগ করেই নিই না কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু, আর না। রাত অনেক হ'ল; তোমারও অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। এদিকে টের পাচ্চি যে ঘুম চোখে যা লিখে গেলাম তার হয়ত অসঙ্গতির সীমা নেই। অথচ এ চিঠি ফিরে পড়বারও সাহস নেই—আশঙ্কা আছে তা হলে বোধ করিবা ছিঁড়ে ফেলে দেবো; আর হয়ত পাঠানোই হবে না। তাই খামের ভেতর বন্ধ করে দিচ্চি। যদি অন্যায় কোথাও কিছু লিখে ফেলে থাকি বড়দা বলে ক্ষমা কোরো। ইতি—২০শে বৈশাখ, ১৩৩৭।*

তোমার বড়দা

* রাধারাণী দেবীকে লিখিত।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, দিন-তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড চিঠি লিখেছিলুম তোমার কবিতার বইয়ের লম্বা সমালোচনা করে। সে চিঠিখানি তোমাকে পাঠিয়েচি না ছিঁড়ে ফেলেচি ঠিক মনে পড়ছে না। রাত্রিবেলায় বসে বসে তোমার 'লীলাকমলের দলগুলি' (তোমার ভাষায়) নাড়তে চাড়তে তার সৌরভে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক কথাই লিখে ফেলেছিলুম। চিঠিখানা আদৌ পেয়েছ কিনা জানিয়ো। এখন দিনের বেলায় মনে হচ্ছে, সে চিঠি তোমাকে হয়তো দুঃখ দেবে না। চিঠিখানা যদি না পেয়ে থাকো, তাতে যা লিখেছিলুম তা মোটামুটি জানাচ্চি কারণ, তুমি হয়তো এখুনি সোজাসুজিই বলে বসবে—

'ও সমস্তই বড়দার চালাকি। দীর্ঘদিন বইখানা পেয়েও নিছক কুঁড়েমি করে নিরুত্তর থাকার বাজে কৈফিয়ৎ'। অথবা বলবে---'বুঝেচি ওটা আমার রাগের ভয়ে পরিপাটি একটি বানানো গল্প।'

সত্যি বলচি বোন, এটা কিন্তু একটুও বানানো-গল্প নয়। তবে তোমাদের রাগের ভয়টা যে আমার আজও সত্যিই আছে সেটা কবুল করছি; সংসারে যে দু'চার জায়গায় সত্যিকারের অকৃত্রিম স্নেহ ও নিষ্কলুস শ্রদ্ধা পেয়েছি বোন, আমি তার দাম জানি। তাই তাকে হারাতে আমার সত্যিই ভয়।

তুমি হয়তো এখুনি হেসে উঠবে। বলবে---'অকৃত্রিম স্নেহ অত সহজে হারিয়ে যায় না বড়দা!' সে কথা সত্যি দিদি! তবুও কি জানো—অতি অকৃত্রিম গভীর স্নেহ ও সংসারের অনেকরকম কারণ অকারণের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে বা আপনাকে আবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়। এমন কি, অনেক সময়ে সে আপনাকে আপনারই কাছে স্বীকার করতে রাজি হয় না, যদিও বা নিজের কাছে নিজেকে মানেও—অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায় না, বিশ্বের কাছে তো নয়ই। তারপরে আছে ভুল-বোঝা। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ক্রটির চেয়ে ভুল-বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপরে বর্ত্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাই আমি বেজায় ভয় করি। আমার বেশীর ভাগ বইয়ে তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেচ এটা।......

ঐ দেখ, কি লিখতে বসে কি সব বকতে শুরু করেচি। বুড়ো হওয়ার পুরোপুরি লক্ষণই হচ্ছে এই বকা। বাজে বকা। ধান ভানতে গিয়েছ কি, তান ধরবে সেই

সম্বন্ধে শিবঠাকুরের গানের। দেখচ না তোমাদের গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) কলমের কাণ্ড। একটা পয়েন্টে কথা শুরু করে কোথায় কোন্‌দিকে কোন্ পথে যে চলে যান তার আর হাল্‌হদিশ খুঁজে মেলা দায় হয়। এইটাই হোলো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ লক্ষণ। যদি তোমরা (তার সঙ্গে উনিও [রবীন্দ্রনাথ]) তা কিছুতেই মানতে চাও না। আমারও আজকাল ঐ দোষটা পুরো মাত্রায় এসেচে যেন অনুভব করচি। বাজে বকতে পেলে আর কিছুই চাইনে।

এই দেখ, তুমি যাতে রাগ না করো ভুল না বোঝো বলে চিঠি লিখতে ব'সে তোমাকে রাগিয়েই দিলুম বুঝি বা। দোহাই, বড়দাকে ভুল বুঝো না ভাই, লক্ষ্মীটি!

যে-চিঠিখানা লিখেও তোমাকে পাঠাইনি মনে হচ্ছে, তাতে তোমার বইয়ের সমালোচনায় যা লিখেছিলুম জানাচ্চি। লিখেছিলুম—"রাধু, তোমার নীলাকমলের কবিতাগুলি এতই অন্তঃস্পর্শী, এতই emotional যে পড়তে বার বার ভুল হয়ে যায়, এ তোমার অন্তর থেকে বাস্তবিকই উৎসারিত হয়ে আসছে বুঝিবা। কিন্তু আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি দিদি। আর যাই হোক এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে নয়। কবিতাগুলি অন্য যে কোনও কারুর কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠলেও, লেখিকার কাছে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিছক কাল্পনিক বিষয়কে এমন গভীর সত্যিকথার মতন করে কী করে লিখতে পারলে ভেবে অবাক হচ্ছি। যে-বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয়, কল্পনার সাহায্যে যাকে আয়ত্ত করেছো, তাকে এমন করে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক্, আমি বলবো তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই।

তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেরেচি রাধু। তোমাদের মত কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে ফোঁটায় ফোঁটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেচি, এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয়তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধ হয় এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে!

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলুম না তা নয়, তোমরা নিজেরাও বোধ হয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না, অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধারণা; সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।

আজ এই পর্যন্ত। সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৭।

তোমার বড়দা

পুনশ্চ—

তোমার বইখানির ছাপা বাঁধাই সাজসজ্জা অতি পরিপাটি চমৎকার হয়েছে। যারা ওর নিন্দে করেছে, তারা অমনটি পারেনি বা পারে না বলেই নিন্দে করেছে। তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, হেসো একটু বেশী করে।*

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, কুমিল্লার ** হঠাৎ লোকে আমাকে চালান করে দিয়েছিলো। ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম।

'শেষ প্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাঙলা দেশে হয়তো পাব না, শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে; দেখচি কিন্তু ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কয়েকখানি চিঠি পড়লাম, একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন। এ হলো একটা দিক, অপর দিকটা এখনো চোখের আড়ালে আছে, ঝড় বইতে শুরু হ'লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

---

* রাধারাণী দেবীকে লিখিত।

** শরৎচন্দ্র এই সময় কুমিল্লায় এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন তখন বাঙলা কংগ্রেসে দুইটি দল ছিল। দুই দলের একদিকে ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অপরদিকে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের দলে ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রই তাঁহাকে কুমিল্লায় পাঠাইয়াছিলেন।

অতি-আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানিক ইঙ্গিত ; বুড়ো হয়ে এসেছি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে হেঁট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ—ফুলে ফলে শোভায় সম্পদে যত্ন করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকী রইলো। ভাষার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম ; শব্দসম্পদ কত যে সামান্য এ সংবাদ আর যার কাছেই লুকানো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়। অথচ মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেল—সময় হ'ল না দিয়ে যাবার—তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা 'শেষ প্রশ্নে' করেচি।

তুমি চেয়েছো আমার কাছে সৎ-পরামর্শ।* কিন্তু চিঠির মধ্যে তো সৎ-অসৎ কোনো পরামর্শই পাঠাতে পারিনে ভাই ; পারি শুধু পাঠাতে আমার অকুণ্ঠ কল্যাণ কামনা। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে—সব কথা জেনে নেবো, আজ কেবল এইটুকু জানাবো যে, দুঃখ যারা সইতে ভয় পায় না এ পথ তাদের জন্যেই।

ইতিমধ্যে যদি ধৈর্য্য থাকে 'শেষ প্রশ্ন'খানা আরও একবার পড়ে দেখো। তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। যে সব কথা হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে তাদেরও দেখা পাবে। কোন বই বার-দুই না পড়ে দেখলে তার সবটুকু চোখে পড়ে না।

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, একবার দেখবার ইচ্ছেও হয়। কবে দেখা হতে পারে যদি একটু জানাও ভাল হয়। আরও একটা কথা। বামুন মানুষ, বিশেষতঃ বুড়োমানুষ, যত্ন করে খাওয়ানোটা যে একটু বেশী রকম পছন্দ করি, আমার লেখার মধ্যে এ ইঙ্গিতটুকু অনেকেই আমার নিজের ব'লে অনুমান করে। তাবে মনে হয় তোমারও আন্দাজ যেন ঐ রকম। ঠিক না ?

আমার অন্তরের গভীর স্নেহাশীর্ব্বাদ রইলো। ইতি ৩০শে বৈশাখ, '৩৮ **

শরৎদা।

---

* রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব উভয়ের মধ্যে গভীর প্রীতি ও অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া শরৎচন্দ্র তাহাদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পরামর্শ দিয়া তাঁহাদের জীবন সরস ও সুন্দর দেখিতে চাহিতেন। রাধারাণী দেবী এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের সৎ পরামর্শ চাহিয়াছিলেন।

** রাধারাণী দেবীকে লিখিত।

পি-৫৬৬ মনোহরপুকুর, কলিকাতা
৩রা মাঘ, ১৩৪১

পরম কল্যাণীয় মন্টু,—কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে এসেছি। তোমার চিঠিগুলি পেলাম। একটা একটা ক'রে জবাব দিই কাজের ব্যাপারগুলো—

(১) তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকালের পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম। বড় আনন্দ হলো। একবার সত্যিকার দেখা ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেছি, এ জীবনে আর হলো না। না-ই হোক।

(২) টাইপরাইটারটার যে ভালোভাবে পৌঁছেছে এ বড় তৃপ্তি। ভয় ছিল পাছে সেটা বিকলাঙ্গ হয়ে তোমার আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন হীরেন এসে বললে মন্টুদার নিজের টাইপরাইটা গেছে পুরনো হয়ে, একটা নতুন কলের তাঁর দরকার। বললুম, একটু খেটেখুটে তাঁকে পাঠিয়ে দাও না হীরেন। সে রাজি হলো, এ-সব সেই-ই করেছে—আমি জড়বস্তু, কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না। আমি শুধু তাদের ঐ কটা টাকার চেক্ লিখে দিয়েছিলাম। তোমার যে পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। যে-লোক নিজের সমস্ত দিয়েছে তাকে দেওয়া ত দেওয়া নয়—পাওয়া। আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশী।

(৩) শ্রীঅরবিন্দর হাতের লেখা চিঠিটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। একটি রত্ন।

(৪) 'নিষ্কৃতি'কে ভালো অনুবাদ করার জন্যে যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম। শুধু আমাকে ভালোবাসো ব'লেই নয়, যাঁরা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। এ না ক'রে তারা থাকতে পারে না। হয় করে না, কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানে না।

(৫) অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সঙ্কল্প করছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মন্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দর ভালো লাগলো জানিনে। অন্ততঃ, না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না, ক্ষুণ্ণও হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দর আশীর্বাদ থাকলে এ অসম্ভবও হয়ত এক দিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।

(৬) অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে আমি নিয়েছি। তার কারণ, তুমি ত শুধু অনুবাদক নও নিজেও বড় লেখক। তোমাকে অকিঞ্চিৎকর সপ্রমাণ করার লোক বিরল নয়, এ চেষ্টা তাদের আছে এবং অধ্যবসায়ও

অপরিসীম। তা হোক—তাদের সমবেত চেষ্টার চেয়েও অনেক বড় তোমার প্রতিভা এবং একাগ্র সাধনা। তোমার গুরুর শুভাকাঙ্খা ত সমস্ত কিছুর পিছনে রইলো। জগতে তাদের অপচেষ্টাটাই সফল হবে, আর সার্থক হবে না তোমার অন্তরের জাগ্রত শক্তি? এমন হ'তেই পারে না মণ্টু।

(৭) রবীন্দ্রনাথ আমাকে introduce ক'রে দিতে চাইবেন ব'লে ভরসা করিনে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোন কালে শোধ করতে পারব না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাদ সাধলো,—আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।

(৮) হীরেন হয়ত আজকালের মধ্যেই আসবে। তাকে তোমার কাগজ পাঠিয়ে দিতে বলবো।

(৯) শেষকালে রইলো তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশী আর কি বলবো! চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারিনে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হলো না, সে আমার অক্ষমতার জন্যে, অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়। এ বিশ্বাস ক'রো।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো এবং সৌরীনকে জানিও ছেলেটিকে বেশ মনে করতে পারছিনে। ৺দাদামশাইয়ের বাড়িতে কিংবা তকুদের বাড়িতে হয়ত দেখে থাকবো।

(১০) শ্রীঅরবিন্দের নববর্ষের প্রার্থনা সত্যই বড় চমৎকার লাগলো। সত্যই খুব বড় কবি তিনি।—শুভার্থী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।*

* দিলীপকুমার রায়কে লিখিত।

পি ৫৬৮, মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা। ৭ই চৈত্র, ১৩৪১

পরম কল্যাণবরেষু—মন্টু, অনেক দিন তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি। অন্যায় হয়েছে জানি, এর দণ্ড আছে তাও অবিদিত নই, কিন্তু এ-ও দেখে আসছি অক্ষম লোকেদের অক্ষমতা যদি অকৃত্রিম হয় তা হ'লে সেটা পূরণ করবার মানুষও ভগবান যোগান, একেবারে রসাতলে পাঠান না। এই মানুষটি পেয়েছি আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যতে। আমার যতকিছু তোমাকে জানাবার সব জানাতে পাই আমি তার মারফতে। আবার খবরও পাই তার হাত থেকে। তোমার মতো ওরও স্নেহটা আমার প্রতি যথার্থ আন্তরিক। যথার্থই ও চায় আমার ভালো হোক,—আমার যশ আমার প্রতিষ্ঠার কোথাও যেন-না কমতি থেকে যায়। সেদিন ও জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে Hoffman-দের ক্যামেরার সামনে বসিয়ে ছবি তুলিয়ে তবে ছাড়লে। বললে দিলীপকুমারের ফরমাস আমি অবহেলা করতে পারবো না। তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করছেন আমাদের কিছুটা তাঁকে সাহায্য করা চাই। অর্থাৎ মেহনতের ভাগ নেওয়া দরকার। সমস্তই কি তিনি একাই করবেন? বুদ্ধদেবের বিশ্বাস আমি খুব বড় লেখক। অতএব, বড় লেখকের সম্মান আমার পাওয়াই চাই। আমি অনেক বলি যে, না হে আমি অত্যন্ত ছোট লেখক, য়ুরোপ আমাকে কোন সম্মানই দেবে না, তাই নিজের মধ্যে কোন ভরসা পাইনে। ও বলে, দিলীপবাবু তা হ'লে কখনো এত মিথ্যা শ্রম, অর্থাৎ কি না বাজে কাজ করতেন না। শ্রীঅরবিন্দ, তাঁকে নিশ্চয়ই আশা দিয়েছেন। আমি বলি, তা হ'লে শ্রীঅরবিন্দই জানেন।

সেদিন বলিষ্ঠ না বশীশ্বর সেনের American স্ত্রী আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন তোমার 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ দেখবেন বলে। খবর পেয়েছেন তাতে শ্রীঅরবিন্দের কলমের দাগ পড়েছে তাই প্রবল আগ্রহ। বললেন এর একটা copy তিনি April মাসে, মাঝামাঝি Americaতেনিয়ে গিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আগে ছিলেন Asia কাগজের Editor, সেখানকার বহু Publisherদের সঙ্গে সুপরিচিত। আমি ভাবি এটা 'নিষ্কৃতি' না হয়ে 'শ্রীকান্ত' হ'লেও না হয় কিছু আশা ছিল, কিন্তু ওদেশে 'নিষ্কৃতি' আদর পাবে কিসের জোরে। সে যাই হোক, একটা copy আমাকে তুমি পাঠাও মন্টু। অন্ততঃ আমি নিজে দেখি কি রকম পড়তে হলো। বুদ্ধদেবও হয়ত এতদিনে এ-কথা তোমাকে জানিয়েছে। তুমি যা-যা জিনিসপত্র পাঠাতে বলেছিলে তাকে পাঠাতে বলেচি। খুব সম্ভব এতদিনে তোমার কাছে পৌঁছেছে। 'নিষ্কৃতি'র ফরাসী অনুবাদের কল্পনাও তোমার আছে দেখতে পেলাম, এবং চেষ্টা-চরিত্রও করচো দেখচি। আমার নিজের বিশ্বাস নেই, শুধু ভাবি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদে অঘটনও ঘটতে পারে। জগতে এ-ও হয়ত হয়।

তুমি ফকির মানুষ, তবু আমার জন্যে অনেক কিছু তোমার খরচ হচ্ছে। এটুকু আমি পাঠিয়ে দেবো বুদ্ধদেব এবার আমার কাছে এসেছে। এই বুদ্ধদেব ছেলেটি ভারি পণ্ডিত। সংস্কৃত এবং বোটানিতে চমৎকার জ্ঞান। কলেজে ও এই দুটোই পড়ায়।

মণ্টু, এবার 'শ্রীকান্ত' ধরো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই।

সাহানা ও তোমার গানের বই পেয়েছি এবং সযত্নে আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি। সাহানাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিও।

আমি চিঠির জবাব দিতে যতই কুঁড়েমি করিনে কেন তুমি যেন ভ্রমেও তার শোধ নিও না। সাত-আট দিন পরে আবার দেশের বাড়িতে সকলে যাচ্ছি, যদিও যখন যাওয়া হবে তোমাকে ঠিকানা জানাবো। ইতিমধ্যে 'নিষ্কৃতি'র তর্জ্জমার একটা কপি কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

আশাকরি সকলে কুশলে আছো। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ রইল।*

ইতি—শরৎদা।

প্রমথ—'চরিত্রহীন' পেলে কি না সে খবরটাও দিলে না। ইতিপূর্ব্বে দু-চার দিন মাঝে মাঝে চিঠিপত্র পাচ্ছিলাম—কিন্তু এই যে নিজের কাজ হয়ে গেছে ব্যস চুপ ক'রে আছ। যা হোক ওটা পড়লে কি? কি রকম বোধ হয়? আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমার ভাল লেগে উঠছে না—অন্ততঃ ভাল বলবার সাহস হচ্ছে না, না? কিন্তু ভালোই হোক আর মন্দই হোক অ্যানালিসিস্ ঠিক আছে, না? দার্শনিক গোছের। —নীরস? এইখানে একটা কথা তোমাকে আর একবার মনে ক'রে দিই। যদি ভাল ব'লে না মনে হয়, প্রকাশ করবার তিলমাত্র চেষ্টা কোরো না। হয় 'সাহিত্য', না হয় 'যমুনা'য় না হয় 'ভারতী'তে বেরুতে পারবে, কিন্তু তোমাদের একটা নূতন কাগজ—একটু 'পুণ্যের জয়', কিংবা ঐ রকমের ঘোরাল সতীত্ব, হিন্দুর বিধবা পুড়ে মরেছে কিংবা ঐ রকম জলধর সেন গোছের দিব্যি হবে। লোকও খুব তারিফ ক'রে বলবে—হাঁ, হিঁদু কাগজ বটে! হিন্দু ideal বজায় হচ্ছে। তা নইলে এ-সব লেখা একে ত শক্ত, তার পরে তেমনি হিঁদু মাখামাখি নয়। রুচির দিক্ দিয়ে ত objection নিশ্চয়ই হবে টের পাচ্ছি। এ ব্যবসায় কোন্‌টা ভালো দাঁড়ায় সেইটা দেখা প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া চাই। কিন্তু, তোমার স্বাধীন নিরপেক্ষ মতও চাই। আমি জানতে চাই আমার বন্ধু প্রমথনাথ কি বলেন। যদি তোমার নিরপেক্ষ মত হয় যে,

* দিলীপকুমার রায়কে লিখিত।

ওটা ভাল হবে না, তা হ'লে যাতে ভালো হয় তার চেষ্টা করব। তোমার পড়া হয়ে গেলে আমাকে লিখো, আমি চিঠি লিখে দিলে কণী গিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। তোমাদের অনুষ্ঠানপত্র কি এখনও বার হয়নি? বার হ'লে আমাকে যদি দয়া ক'রে একটা পাঠাও ত' বড় ভাল হয়। এবং যখন কাগজে বেরোবে তখন এক কপি পাঠিয়ে দিলে দেখতে পারব।

তোমাকে একটা পরামর্শ দিই। তুমি না ভার নিয়েছো ('ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র পরিচালনা-ব্যাপারে প্রমথবাবু একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন) তাই বলা, না হ'লে বলতাম না। যদি ধারাবাহিক নভেল বার কর তা হ'লে যাতে বেশ সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী—তপ—জপ—কুলকুণ্ডলিনী ফুলকুণ্ডলিনী থাকে তার চেষ্টা দেখাবে। ওটা বাজারে বড় নাম করে দেয়। আর দেখবে যাতে শেষের দিকে হয় দুটো চারটে হুড়মুড় করে মরে যাবে—(একটা বিষ খাওয়া চাই।) আর না হয়, কোথা থেকে হঠাৎ সবাই এসে এক জায়গায় মিলে যাবে। এ হ'লে লোকে খুব তারিফ করবে। এবং নূতন কাগজ বার করতে হ'লে এই সব নভেলের বড় আদর। আমাকেও যদি অনুমতি কর আমি চরিত্রহীনের বদলে ঐ রকম একটা চমৎকার জিনিস অতি সত্বর লিখে দিতে পারব। যা ভাল বিবেচনা কর লিখবে। আমি সেই মতই রচনা শুরু ক'রে দেব। যদি আমাকে হুকুম দাও ত ঐ সঙ্গে দুটো লাল কালিতে ছাপা তন্ত্র টন্ত্র পাঠাবে, বিশেষ আবশ্যক। ওগুলো এখানে পাওয়া যায় না। এবং লিখে জানাবে কতকগুলো। (অর্থাৎ দুটো কি চারটে) সন্ন্যাসী ফকিরের আবশ্যক। নায়িকা সতীত্ব রক্ষার জন্য কি রকম বীরত্ব করবে তারও একটু আভাস দিলে ভাল হয়। এবং ষট্‌চক্রভেদের আবশ্যক কি না তাহাও লিখবে। ভাল কথা—তোমাদের পরম বন্ধু সু—র সংবাদ কি, কেমন আছেন তিনি? কি করলেন? কি কি মন্ত্রণা তিনি আজ পর্য্যন্ত দিলেন শুনি? মন্ত্রণা যে মূল্যবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার আন্তরিক ভালবাসা জেনো।*

তোমার স্নেহের শরৎ

* শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

প্রমথ, তামাসা করলাম ব'লে রাগ কোরো না যেন। নিছক তামাসা কারু ওপরে কোন রকম reflection নয়, তাহা নিশ্চয় জেনো। তোমাকে একটু তামাসা করলাম শুধু এই জন্তে যে, তুমি না দেখেই 'চরিত্রহীনে'র জন্য মহা হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে। আমি তোমাকে অনেক আগেই লিখেছিলাম এটা 'চরিত্রহীন', বট্‌চক্রভেদ নয়। কেবল Ethics আর Psychology। ধর্ম নয়। যা হোক তুমি যে তোমার দলের মধ্যে আমার জন্তে অপ্রতিভ হবে সেইটাই আমার বড় দুঃখ। যে কেহ তোমাকে এ সম্বন্ধে বলবে তাকেই এই ব'লে জবাব দিয়ো, শরৎ লিখতে যে জানে না তা নয়, তবে এটাতে তার কিছু উদ্দেশ্য আছে, সেটা অসম্পূর্ণ অবস্থায় চোখে পড়ছে না। (শরৎচন্দ্র প্রমথবাবুকে চরিত্রহীনের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না পাঠাইয়া কিয়দংশ পাঠাইয়াছিলেন) আমি গল্প বানাতে পারি তার কতক নমুনা ছেলেবেলাতেও পেয়েছ, সম্প্রতিও বোধ হয় পেয়েছ। এই বলে জবাবাদিহি করো। আমি ভবিষ্যতে তোমাদের যাতে ভালো লাগে এই রকম করে একটা নভেল লিখে দেবো, কিছু মনে কোরো না। আর এক কথা—অনিলা দেবী আমার দিদি—আমি নয়। কি করে তুমি জানলে যে একই ব্যক্তি? কে এ কথা দ্বিজবাবুকে বললে? ভাল করনি, আমি ত তোমাকে কোথাও বলিনি ওঁরা এক ব্যক্তি? দু'কান চার কান করতে করতে কথাটা (যাহা মিথ্যা) প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। তাহলে ভারী লজ্জার বিষয় হবে। কেন না অনেক তীব্র সমালোচনা দিদি করবেন বলেছেন। ঠাকুরবাড়ির বিরুদ্ধে তাঁদের কত স্থানে কত ভুল সেই সমালোচনা করবেন ব'লে আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন। বোধ করি বড় grand হবে। শুনছি ঠাকুরবাড়ির প্রায় সবাই শুধু নামের জোরেই আজকাল যা তা লিখছেন। সম্প্রতি ঋতেন্দ্রবাবুর একটা সমালোচনা (ফাল্গুনের 'সাহিত্যে' কানকাটার ইতিহাস ব'লে যা লিখেছেন) সমস্ত ভুল সংবাদ এমন মাথা উঁচু করে সবজান্তা গোছ হয়ে যে মানুষ লিখতে পারে, দিদি লিখেছেন, এটা তিনি আর কোন ইংরেজী বাংলা বইয়ে পড়েন নি। আমার বিশ্বাস তাঁর অধ্যয়নটা a little bit wide. এ অবস্থায় লোকে যদি মনে করে একজন সামান্য কেরাণী এবং গল্পলেখক এই সমস্ত গম্ভীর সমালোচনা করেছেন সেটা দেখতে শুনতে বড় ভাল হবে না। তা ছাড়া দিদিও দুঃখ করতে পারেন। কথাটা পার ত উল্টে দিয়ো।—শরৎ*

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

প্রমথনাথ—তোমার এক সঙ্গে দুইখানি পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি যদিও ফণীর পত্র পাইয়া একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, তথাপি তোমার বৃদ্ধ—মশায়কে লইয়া এতটা করা উচিত হয় নাই। বুড়ো মানুষ শাপ-শাপান্ত করিবে ভাল নয়। একটু বিনয় করিয়া বলিও যেন আর কিছু না মনে করেন। তিনি যখন কিছু সত্যই বলেন নাই, তখন এ কথা এই পর্য্যন্ত। আমার তোমাদের Ev. Clubএ সুখ্যাতি হইয়াছে শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। কাছে থাকিলেও দ্বিজবাবুকে প্রণাম করে পায়ের ধূলা লইয়া আসিতাম। এর বেশী কিছুই করিবার আমার বোধ করি ক্ষমতা থাকিত না। তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভাগলপুরে এবং এখানে একটা মতভেদ এই হয় যে, 'রামের সুমতি'র চেয়ে 'পথনির্দ্দেশ' ঢের ভাল। দ্বিজবাবুকে আমার প্রণাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়ো ত কোনটা শ্রেষ্ঠ। তাঁর কথাটাই final হবে এবং মতভেদও বন্ধ হবে। 'ভারতবর্ষ' যখন তোমার কাগজের মতই তখন এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য আমিই স্থির করব। এবিষয়ে মনের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই কথা, আমার বড় সময় কম। রাত্রে লিখিতে পারি না, সকালে ঘণ্টা দুই, তা হয়ত তাও সব দিন ঘটিয়া উঠে না। তোমাকে আমার একটা নিবেদন আমার 'যমুনা'কে একটু স্নেহ কোরো। 'ভারতবর্ষ' তোমার 'যমুনা' তেমনি আমার। যাতে ওর ক্ষতি না হয়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়, একটু সে দিকে নজর রেখো ভাই। ফণীকে আমি স্নেহ করি সত্য, কিন্তু তাই ব'লে যে তোমার অসম্মান ক'রে কিংবা তোমাকে উপেক্ষা ক'রে, তা সে ফণী কেন, কাহারো জন্যই সেটা আমি পারিব না সেই জন্যই 'চরিত্রহীন' পাঠাই। যদিও এই পাঠানো লইয়া অনেক কথা হইয়া গিয়াছে এবং হইবে তাহা জানিয়াও আমি পাঠাইয়াছি। যা হোক তোমাদের যখন ওটা পছন্দ হয় নাই, তখন আমাকে ফেরত পাঠাইয়ো। বিজ্ঞাপন যেমন দেওয়া হইয়াছে, সেই মত 'যমুনা'তেই ছাপা হইবে। তুমি বলিয়াছ একেবারে পুস্তকাকারে ছাপাইলে ভাল হয়। সত্য, কিন্তু এতটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, যদি নিজের স্বার্থের জন্য ফণীকে না দিই সে বড়ই দেখিতে মন্দ এবং লজ্জাকর হইবে। তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা আমিও জানিতাম। আমি জানিতাম ওটা তোমাদের পছন্দ হইবে না এবং সে কথা পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াওছিলাম। তবে এ-সম্বন্ধে আমার এই একটু বলিবার আছে যে, যে লোক জানিয়া শুনিয়া মেসের ঝি'কে আরম্ভতেই টানিয়া আনিবার সাহস করে সে জানিয়া শুনিয়াই করে। তোমরা ওকে, ওর শেষটা না জানিয়াই অর্থাৎ সাবিত্রীকে মেসের ঝি বলিয়াই দেখিয়াছ। প্রমথ, হীরাকে কাঁচ বলিয়া ভুল করিলে ভাই। অনেক বিশেষজ্ঞ ও বইটা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। ইহার উপসংহার জানিতে চাহিয়াছে। এ একটা Scientific

Psych : and Ethical Novel : আর কেউ এ রকম করিয়া বাঙ্গালায় লিখিয়াছে বলিয়া জানি না। এইতেই ভয় পেলে ভাই? কাউণ্ট টলস্টয়ের 'রিসরেকশন' পড়েছ কি? His Best Book একটা সাধারণ বেশ্যাকে লইয়া। তবে, আমাদের দেশে এখনো অতটা art বুঝিবার সময় হয় নাই সে কথা সত্য। যা হোক, ওটা যখন হইল না তখন এ লইয়া আলোচনা বৃথা। এবং আমারও তেমন মত ছিল না। তোমাদের ওটা নূতন কাগজ, ওতে এতটা সাহসের পরিচয় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে, আমারও অন্য উপায় নাই। আমি উলঙ্গ বলিয়া artকে ঘৃণা করিতে পারিব না, তবে যাতে এটা in striotest sense moral হয় তাই উপসংহার করিব। আমাকে Registry ক'রে পাঠিয়ে দিও, ফণীকে দিবার আবশ্যক নাই। তোমাদের প্রথম সংখ্যার (১৩২০ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' প্রথম বাহির হয়) জন্য কি দিব ভাই? কি রকম চাও একটু লিখে জানালে বড় ভাল হয়। আমার যথাসাধ্য করিব। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এর পূর্ব্বে আমাকে যদি কেহ এই বিষয়ে একটু সতর্ক করিত, অর্থাৎ বলিত—ঝি লইয়া শুরু করাটা ঠিক নয়, আমি হয়ত আলাদা পথ দিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম। তা সে কথা কেহই বলিয়া দেয় নাই। এখন too late, 'পাষাণ'টা কি ভাল মনে নেই। নিজের কাছেও নেই। তা ছাড়া ও ছেলেবেলার লেখা। না দেখে না সংশোধন করে কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। করলে হয়ত কাশীনাথের মত হয়ে দাঁড়াবে। আমার 'চন্দ্রনাথ' গল্পটা মনে আছে? সেটাকেও এখন সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালতে হয়েছে। সেটা যমুনায় বেরুচ্ছে। এটা শেষ হলে চরিত্রহীন বার করা হবে বলেই সকলে স্থির করেছেন। সমাজপতি ('সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি) মশাইকে দিবার কথা ছিল, এবং এ জন্য তিনি পত্রাদিও লিখেছিলেন, কিন্তু ফণীর কাগজ যে আমার কাগজ।

তুমি ফণীর উপরে রাগ করো না। লোকটা ভালই। কিন্তু সে কি ক'রে জানবে তুমি আমি কি, এবং ২০ বছরের কি ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। লোকে মনে করে বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব যে কাহাদের মধ্যে, কিরূপ বন্ধুত্ব তা সে বেচারা কি করে জানবে। তোমার আমার কথা তুমি আমি ছাড়া আর ত কেউ জানে না প্রমথ। যদি কোন দিন এ বিষয়ে তার সঙ্গে তোমার কথা হয় বোলো, বাইরের লোককে কি জানাব, শরৎ আমার কি এবং আমি শরতের কি। বরং না জানাই ভাল। তুমি আমাকে যা যা লিখেছ একটু ভেবে চিন্তে পরে তার জবাব দেব। তুমিও একটু শীঘ্র জবাব দিয়ো। হরিদাসবাবুকে এবং প্রাণধন ভয়াকে আমার কথা একটু মনে ক'রে দিও।—শরৎ *

---

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

(১২ই মে, ১৯১৩ ডাকমোহর)

প্রমথনাথ—তোমার পত্র পাইলাম। পূর্ব্ব পত্রের যথাসাধ্য উত্তর দিয়াছি, তথাপিও যে ইহার উত্তর লিখিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ আমি তোমাকে শুধু যে ভালবাসি তাহা নহে, শ্রদ্ধাও করি। অর্থাৎ মতামতের উচ্চ মূল্য দিই। আমার যাহা বলিবার বলি, তাহার পরেও যদি তোমার সেইরূপ ইচ্ছাই থাকে, যথাসাধ্য তোমার অভিরুচি পালন করিতে চেষ্টা করিব। লিখিয়াছ বিধবা ভিন্ন ছোট গল্প জমে না (ঠাট্টা করিয়া ?)। হয়ত তোমার কথাই সত্য, অত বড় বঙ্কিমবাবুও তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস দুটিতে (কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ) বাদ দিতে পারেন নাই। তুমি আমার 'পথনির্দ্দেশ'কেই কটাক্ষ করিয়া বোধ করি বলিয়াছ। বুঝিতেছি ওটা তোমার ভাল লাগে নাই। তাই যদি সত্য হয়, আমার উপদেশ এই, আর উপন্যাস গল্প প্রভৃতি লিখিতে চেষ্টা ত নিশ্চয়ই করিবে না, পড়াও উচিত হইবে না। এক একটি painter যেমন colour blinds থাকেন, তুমিও তাই। 'রামের সুমতি'তে আর্ট কম, তবুও যদি একেই এত ভাল লাগিয়া থাকে, যার কাছে তার পরেরটাও কিছুই নয় হয়, তাহা হইলে আমি সত্যই নিরুপায়। এ শুধু আমার মত নয়। কথাটা বিশ্বাস কর, এ প্রায় সকলেরই মত। তা ছাড়া, আমার উপর যদি তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমি নিজেও এই বলি। পরিশ্রমের হিসাবে, রুচি হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথনির্দ্দেশ'এর কাছে 'রামের সুমতি'র স্থান নীচে। অনেক নীচে। আমি একটা সম্পূর্ণ গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া 'রামের সুমতি'র মত একটা নমুনা লিখি—এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের সম্বন্ধ আছে সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক একটা গল্প লিখিয়া বইখানি সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে। যাক। 'চরিত্রহীন' ফিরিয়া (registry) পাঠাইয়ো। এ সম্বন্ধে ঋষি Tolstoy'র "Resurrection" (the greatest book) পড়িয়ো। অঙ্গবিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাইতে নাই জানি না। ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না। সমাজের যদি কেউ ডাক্তার থাকে, যার কাজ ক্ষত চিকিৎসা করা, সে কি শুনি? যাহা পচিয়া উঠে তাহাকে তুলা বাঁধিয়া রাখিলে পরের পক্ষে দেখিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত যে লোকটার গায়ে, তার পক্ষে বড় সুবিধা হয় না। শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা ছাড়াও উপন্যাস-লেখকের আরো একটা গভীর কাজ আছে। সে কাজটা যদি ক্ষত দেখিতেই চায়—তাই করিতে হইবে। Austin, Mary Corelli প্রভৃতি এবং Sara Grend সমাজের অনেক ক্ষত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আরোগ্য করিবার জন্য, লোককে শুধু শুধু দেখাইয়া ভয় দেখাইয়া আমোদ করিবার জন্য নয়। তা ছাড়া central figure করিতেছি কি করিয়া বুঝিলে? অবশ্য বদনাম যে হইবে তাহার নমুনা পাইতেছি,

কিন্তু জানই ত, ভয়ে চুপ ক'রে যাওয়া আমার স্বভাব নয়। তুমি বলিতেছ, প্রমথ, লোকে নিন্দা করিবে, হয়ত তাই, কিন্তু এই এক 'চরিত্রহীন' অবলম্বন করিয়া 'যমুনা'র কিরূপ উন্নতি হইবে না-হইবে, দেখাও আবশ্যক। মনে করিও না, যাহা ছোট, তাহা কিছুতেই বড় হইতে পারে না। ছোটও বড় হয়, বড়ও ছোট হয়। সে যাক। গল্প লিখিয়া তোমাদের মনোরঞ্জন করিতে পারিব, সে আশা আজ আমি সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলাম। তোমাদের কাগজের জন্য কিরূপ গল্প খাটিবে—এটা বুঝিতে পারাই আমার পক্ষে শক্ত হইবে। এ যদি সন্দেশ তৈরী হইত, না হয় একটু ছোট বড় করিয়া ছানা চিনির ভাগ কম করিয়া করিতাম—কিন্তু এ যে মনের 'সৃষ্টি'। সেই জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও, এবং সর্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করিলেও তোমার কাগজের জন্য কিছু করিতে পারিব তাহাও ভরসা করিতে পারিতেছি না। বাস্তবিকই যদি তোমার কাজে আসিতে পারি, তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে, কিন্তু আমার কাজ যে তোমাদের কাছে অকাজ বলিয়া ঠেকিবে। কিন্তু একটা কথা বলি ভাই রাগ করিও না—তোমাদের view এত narrowহইয়া গেল কিরূপে এই একটা কথা আমি কেবলই মনে করিতেছি। তুমি 'নারীর মূল্যের' সুখ্যাতি করিয়াছ—জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা (যমুনা) পড়িলে তুমি যে কত নিন্দাই করিবে আমি তাই ভাবিতেছি। তোমার 'অর্থের মূল্যে লেখা।' কি রকম লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছ, খুব ভাল। তবে বিদ্বানের সব দেশে পূজা হওয়া (বড়লোকের চেয়ে) উচিত নয়—কথাটা প্রমাণ করিবে কি করিয়া বলিতে পারি না। অবশ্য পূজা ত সে পায় না, কিন্তু পাওয়া উচিতও নয় সেইটাই প্রমাণ করা শক্ত হইবে বোধ হয়। তোমাদের কাগজের চারিদিকেই নাম হইয়াছে, সকলেই বলিতেছেন দুই এক মাস যমুনা দেখিয়া তবে গ্রাহক হওয়া উচিত কি না বিবেচনা করিব। সুতরাং প্রথম দুই এক সংখ্যা যা-তা হইলে কখনই চলিবে না। কেন না দাম ঢের বেশী—ঠিক এই পরিমাণে, লোকে আশা করিবে। অন্ততঃ এই ত বর্ম্মার view. প্রথমেই যেন লোকে prejudiced না হইয়া যায়। আশা করি ফিরত ডাকে 'চরিত্রহীন' পাঠাইবে। তোমাকে পূর্ব্ব পত্রেই জানাইয়াছি—ওটা যমুনাতেই বাহির হইবে—অবশ্য কাগজ বড় করিয়া। অবশ্য ফলাফল তার কপাল আর আমার চেষ্টা এবং ভগবানের হাত। নামে প্রকাশ করার কথা? এত কুরুচিপূর্ণ, তখন ত নিশ্চয়ই আমার নিজের নামে প্রকাশ করা চাই। যা শক্ত জিনিস সেই ভার সইতে পারে। আর এক কথা। 'চোখের বালি' তার নিন্দার কারণ বিনোদিনী ঘরের বৌ। তাকে নিয়ে এতখানি করা ঠিক হয় নাই। এটা বাড়ির ভিতরের পবিত্রতার উপরে যেন আঘাত করিয়াছে। যেন পাঁচকড়ির 'উমা'। আমি ত এখনো কাহারো পবিত্রতায় আঘাত করি নাই; পরে কি করিব কি জানি! তুমি আমার উপর রাগ করিয়ো না প্রমথ। তোমাকেও যদি মন খুলিয়া না বলিতে পারি, তা হইলে আর

কাকে বলিব? তোমাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আমার খুবই প্রবল ছিল, কিন্তু আর সাহস নাই। 'বিধবা' ছাড়া গল্প জমে না, এই যখন তোমাদের negative standard—তখন আমার আর কিছুমাত্র উপায় নাই! তোমাদিগকেও একটা সামান্য উপদেশ আমার দিবার আছে, ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিয়ো, না হয় করিও না। তোমাদের পোষা লেখকগুলিকে যদি অমন ফরমাস্ দিয়া লেখাও, আর প্রতিপদে overseer-এর মত 'level' দড়ি হাতে মাপ-জোক করিতে যাও, সমস্ত লেখাই আড়ষ্ট হইবে। এ কাগজ ultimately failure হইবে। যারা সুলেখক, এবং যথার্থই যাহাদিগকে 'কবি' বলিয়া মনে কর, তাহাদের সমালোচনা কর, কিন্তু লেখাও প্রকাশ কর। লোককে ভাল মন্দ দুইই বলিবার সুযোগ দাও—গাল দাও কিন্তু প্রকাশ হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়ো না। পাদরিদের 'hymn' বা গীর্জার 'prayer' শুধু যদি নিজেদের কাগজটাকে ক'রে তোল সে টিকসই হবে কি? আমি অনেক কথা লিখিলাম—কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে পাছে মনে কর আমার এই লেখার মধ্যে একটু রাগ বা জ্বালা আছে। কিচ্ছুটি নেই। তুমি যে আমাকে সরলভাবে লিখেছ এতে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। এতে আমি বুঝতে পাচ্ছি, এমন অবস্থায় যিনি মিত্র ন'ন তিনি কি বলবেন। অবশ্য বইটাকে immoral বলায় একটু দুঃখিত যে না হয়েছি তা নয়, কিন্তু উপায় কি? ভিন্নরুচিহি লোকঃ। 'পথনির্দ্দেশ' গল্পটাই যখন 'immoral' ঠেকেছে (কারণ লিখেছ,—'এটা ঠাট্টা', কিন্তু কোন্‌টা ঠাট্টা বোঝা ভার) তখন 'চরিত্রহীন' এ ত স্পষ্টই নিশান এঁটে দিয়ে immoral করা হয়েছে। এও যাক। তোমার খবর কি? খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছ না? বাস্তবিক একটা মাসিক চালানো ভয়ঙ্কর শক্ত। কোন ক্রমশঃ উপন্যাস বার হচ্ছে কি? লেখক কে? কিন্তু জলধর সেন টেনের বিশুদাদা টাদা অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে গেছে। আমাদের এখানেও বড় কম বাঙ্গালী নেই এবং যারা আছে তারা একটু বেশ বোঝে-সোজেও, কিন্তু ওসব আর কেউ পড়িতে চায় না। এমন কিছু বার করবার চেষ্টা কর যা—উজ্জ্বল। পতঙ্গ যেমন আগুনের পাশ থেকে নড়তে পারে না, আশা করি তোমরা যা বার করবে আমরা তাতে সেইরূপ আকৃষ্ট হয়েই থাকব। তা যদি না পার, কাগজ চালিয়ো না। সেই খোড়—বড়ি—খাড়া আর খাড়া—বড়ি—খোড়ে আর আবশ্যক কি? আমার মনে আছে 'বঙ্গদর্শনে' যখন রবিবাবুর 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি' বার হয় লোকে যেন বঙ্গদর্শনের আশায় পথ চেয়ে থাকত। আসা মাত্রই কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। তোমরা যদি কিছু কর, যেন এমনি successful হয়। কারণ তোমাদের resource বিস্তর—হাতে বিস্তর লোক আছে। এবং সবচেয়ে বেশী (টাকা) জিনিসটাও আছে। শুনেছি, তোমাদের অনুষ্ঠান পত্র বার হয়েছে, খুব আশা করেছিলাম একটা পাব। বোধ করি পাঠাবার আর আবশ্যক বিবেচনা করনি। যাই হোক তাতে কি কি ছিল

একটু সংক্ষেপে যদি লিখে জানাতে পার হয় ভাল। আজ এই পর্য্যন্ত। কি জানি এত বড় দীর্ঘ-পত্র লিখিয়া তোমাকে ব্যথা দিলাম, কি,কি করিলাম। আমিও ব্যথা পাইয়াছি। তুমি যে লিখিয়াছ চরিত্রহীন অপরের নামে প্রকাশ করিতে, এইটাতেই সবচেয়ে বেশী আমি কি এতই হীন? যা আমার মন্দ জিনিস তাকে বেশী করেই আমার নামের আশ্রয় দেওয়া চাই। তা না করিয়া fictitious নামে (নিজের নাম বাঁচাইবার জন্য) চালাইব? ভাল মন্দ যাই হোক consequence আমার ভোগ করা চাই। নাম আবার কি? কে এর লোভ করে? সে লোভ থাকলে তারা, এতদিন চুপ করিয়া নষ্ট করিতাম না। আমার ভালবাসা জানিয়ো, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ো—শরৎ *

(ডাকমোহর ২৪ মে, ১৯১৩)

প্রমথ—দ্বিজুদার (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazette-এ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে খুব কম জানিতাম তাহা নহে; অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না। সত্যই তাঁহার স্থান অধিকার করিবার লোক মিলিবে না। কে যে কখন যাত্রা করেন তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী মাত্রেরই ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমাদের পাড়ার যে কিরূপ ক্ষতি হইল তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। তাঁহার ছেলে, বাড়ি, Evening Club প্রভৃতির আরো একটু বিস্তারিত সংবাদ শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম—এবার যখন পত্র লিখিবে একটু জানাইয়ো। তোমাদের 'ভারতবর্ষে'র সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত এ কাগজ আর বাহির হইবে না। বাহির হইলেও খুব সম্ভব ইহা টিকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি করিবেন? ** তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। Compiler-ও বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরানো ধরণের। তিনি খুব সম্ভব failure হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের মোড়ল (তদানীন্তন সভাপতি) হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক ন'ন মনে রাখিয়ো। অবশ্য তোমরা

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

** ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যার কিছু অংশ মাত্র সম্পাদনা করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। দ্বিজেন্দ্রলালকে সম্পাদক করিয়া 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতঃপর কথা উঠে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রকে ভারতবর্ষের সম্পাদক করা হইবে, কিন্তু সম্পাদক না করিয়া অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেনকে যুগ্মভাবে সম্পাদক করা হয়।

কলিকাতায় থাক, আমরা মফঃস্বলে থাকি ; এসব অভিমত আমি দিতে পারি না। দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধ করি তেমন গ্রাহ্য হইবে না—যাহা হোক, যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি তাহাই জানাইলাম। শেষে আমার কথা। তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য তাহা নিশ্চয়ই করিতাম, কিন্তু এখন তিনি আর নাই। তিনি সাহিত্যিক এবং বোদ্ধা ছিলেন, তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন—এবং না বুঝিলেও তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন, না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না, তাহাতে লজ্জার কোন কারণ ছিল না—অভিমানও হইত না, কিন্তু এখনও যে সে আমার দাম কষিবে, হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়—হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা file কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর। তুমি আমার কত বড় সুহৃৎ তাহা আমি জানি—সে কথাটা এক দিনের তরেও ভুলিব না। তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব। শুরু হইতেই তোমাকে বলিতেছি তোমাদের লেখকেরা সাগরতুল্য। যাহাদের রচনা এবার বাহির হইবে বলিয়া লিখিয়াছ, অনুরূপা (অনুরূপা দেবী), বিদ্যাবিনোদ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ), নগেনবাবু (নগেন্দ্রনাথ বসু) প্রভৃতি তাঁহাদের কাছে আমার লেখা যে গোষ্পদের মত দেখাইবে। আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই—এর বেশি আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা চরিত্রহীন আমার সুরেন মামা লিখিয়াছেন—হরিদাসবাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন, ওটা এতই immoral যে কোন কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে কারণ তোমরা আমার শত্রু নও যে, মিথ্যা দোষারোপ করিবে—আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব ওই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে। আমিও সেই কথা স্পষ্ট করিয়া এবং তোমার সমস্ত argument ফণীকে ('যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল) খুলিয়া লিখিয়াছিলাম, তৎসত্ত্বেও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে যমুনাতে ওটা বাহির করিতেই হইবে। তাহার বিশ্বাস আমি এমন লিখিতেই পারি না যাহা immoral, সেই জন্য বাধ্য হইয়া তোমার অনুরোধ ভাই রক্ষা করিতে বোধ হয় পারিলাম না। কারণ advertise করা হইয়াছে আর ফিরান যায় না। আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকের যা ইচ্ছে আমার সম্বন্ধে মনে করুক; কিন্তু সে যখন বিশ্বাস করে, চরিত্রহীনের দ্বারাই তাহার কাগজের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং immoral হোক moral হোক লোকে খুব আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে—তখন সে যাহা ভাল বোঝে

করুক। তবে একটা উপায় করিতে হইবে। 'রামের সুমতি'র মত সরল স্পষ্ট গল্প পাশাপাশি প্রকাশ করিয়া চরিত্রহীনের effect mild করিয়া আনিতে হইবে। ফণী লিখিয়াছে লোকে আমার গল্প পড়িবার জন্য উতলা হইয়া আছে। যাক এ কথা। 'কাল' আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দু-ই করিবে সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল। যাক। এই সময়টা যদি আমি কলকাতায় থাকতাম, তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য অনেক করিতে পারিতাম। কোন নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটা edit করিয়া দু-এক মাস চালাইয়া দিতে পারিতাম। আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি, এবং যেটা সম্পাদকের প্রধান কাজ, 'সমালোচনা' (অপর কাগজের লেখার উপর) সেটাও আমার বেশ আসে। তবে, যখন কলিকাতাতে নাই, এবং শীঘ্র থাকিব এ আশাও নাই—তখন এ সব কথার আলোচনায় লাভ নাই। এই দূর দেশে কম সময়ে আমার শুধু যমুনার জন্যই একটু আধটু লিখিতে পারি, এর বেশী সময় এবং স্বাস্থ্য দু-ই নাই। তুমি আমার উপর যেন একটুও দুঃখ করিও না এই আমার মিনতি। দ্বিজুবাবু আর নাই—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া। তা ছাড়া আমি একরকম প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ছোট্ট যমুনাকে বড় করিব। এজন্য আমার শিষ্যমণ্ডলীকেও* অনুরোধ করিতে হইবে বলিয়াও একটা কথা উঠিয়াছে। আমি জানি আমাকে তারা এমনি শ্রদ্ধা করে যে, আমি অনুরোধ করিলে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিবে না—শুধু এই জন্যই এখনো তাহাদিগকে অনুরোধ করি নাই। আশা আছে প্রথম, এদের সাহায্য লইলে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত হইবে। শুনিতেছি এর মধ্যে যমুনার বেশ আদর হইয়াছে। তাই প্রতি মাসে যদি এমনিই আদর অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই বড় হইবে আশা করা যায়। কাগজটা আগামী বৎসর হইতে ডবল সাইজে বাহির করিবার কথা আছে। তোমার কথা রাখিবার জন্য সমস্ত জানিয়াও এবার চরিত্রহীন পাঠাইয়াছিলাম। আবার যখন আবশ্যক হইবে, তোমার কথা রাখিবই। কিন্তু পরের জন্য আমাকে আর লজ্জা দিও না ভাই। হরিদাস তোমার বন্ধু, আমি কি তার চেয়ে কম? তোমাকে যত লোক যত ভালবাসিয়াছে, আমি কারুর চেয়ে কম বাসি নাই, সেই কথাটা যখন

---

* শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরের 'সাহিত্য সভা'র যাঁরা সভ্য-সভ্যা ছিলেন—বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

আমার উপর রাগ হইবে তখন স্মরণ করিয়ো। আর কি বলিব! আমি ওখানে লেখা দিয়া আর অপ্রতিভ হইতে ইচ্ছা করি না। ওখানে ঢের বড়লোক লেখক, আমার জন্য এতটুকু এক তিলও ফাঁক পড়িবে না। ফণীও তোমার নাম করিয়াছে। বিস্তর সুখ্যাতি করিতেছিল।

তোমার নিজের সংবাদ লিখিবে। আমার সংবাদ একই রকম। কখন ভাল, কখন মন্দ। রেঙ্গুন আর সহ্য হইতেছে না, প্রতি পদেই টের পাইতেছি। কিন্তু কোন উপায়ও দেখিতে পাইতেছি না। কি জানি এইখানের মাটি কেনা আছে কি না!—তোমার স্নেহের শরৎ।*

31. 5. 13.

Rangoon.

প্রমথনাথ—আজ তোমার পত্র পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার পূর্ব্বেকার পত্র তোমার হাতে যায় নাই। যদি এতদিনে গিয়া থাকে নিশ্চয়ই সমস্ত বুঝিয়াছ। এই ত ভাব। তার পরে আমার যাবার কথা। আগে চাকরির ব্যাপারটা বলি। আমাদের বড় সাহেব Newmarch, 'গোরা'তে রবিবাবু বলিয়াছেন "আমি মাধব চাটুয্যে নীলকরের গোমস্তা।" এর বেশী আর বলার আবশ্যক নাই। Newmarchও ঠিক তাই। ইনি এক বৎসর আসিয়া ৩৭ জন কেরাণীকে reduce করিয়াছেন। অপরাধ একজনের চিঠি despatch করিতে ৩ দিন দেরী হয়—আর একজনের একখানা ১৫ দিনের পুরান চিঠি বার হয় এই রকম। এঁর দৌরাত্ম্যে Deputy Acctt. General Chanter সাহেব, Dy. Acctt General শ্রীনিবাস আইয়ার, Asst. Acctt. General সুন্দরম, Asst. Acctt. General Mgset ১ মাসের মধ্যে medical certificate দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রত্যেকের কাজ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে আমাদের P. W. D. লোকদের নিজেদের অফিসে নিয়ে গেছে। আমাদের office hour, strictly with hardest labour from

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

10-30 to 6-30. নিয়ম এই যে যদি কারু কোন তরফ থেকে reminder আসে—৬ মাসের জন্য ১৲ হিসাবে (জরিমানা) reduction. এই ত সুখের চাকরি। তার উপর সে দিন Local Govt. কে এই বলে move করছেন যে অফিসের কেরাণী ঘুষ দিয়ে m. certificate দিয়ে পালায়, তাতে অফিসের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। সে জন্য অফিসের চিঠি না গেলে Civil Surgeon কাউকে যেন m. certificate না দেন। আমাদের এখন m. c. দেবার পথও বন্ধ হয়েছে। M. c. দিলেও বলে ওর Service book-এ নোট করে রাখ মিথ্যা m. c.। বর্মা বলেই এত জুলুম। চলে যাচ্ছে। দিন ৩।৪ পূর্ব্বের ঘটনা বলি। হঠাৎ আমার একটা reminder আসে। এত কাজ যে ছোটখাট কাজ আমি দেখতেই পারি না—এটি আমার Sub Auditor ভৌমিকবাবু ও Peria Swamyর দোষ, অবশ্য আমিই সমস্ত দোষ নিলাম। Explanation দিলাম আমারই oversight: ইত্যবসরে resignation লিখে রাখলাম। ঠিক জানি ১০৲ টাকা গেছেই। এ অপমান সহ করে যে চাকরি করে সে করে, আমি ত কিছুতেই পারব না, এই জেনেই লিখে রাখি। যা হোক কি জানি Newmarch দয়া ক'রে কোন কথাই বললেন না। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, আমার আর resignation দেওয়া হ'ল না। কিন্তু শরীরও আমার আর বয় না।

লেখা-টেখাও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতদিন চাকরি করছি ভাই, এমন ভয়ানক দুর্দ্দশায় কখন পড়িনি। সেদিন ঝোঁকের উপর লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে মিত্তির-মশায়কেও * চিঠি লিখি যে যা হোক একটা চাকরি কলকাতায় দাও, আমি resign দিয়ে চ'লে যাই। তার এখনো জবাব আসবার সময় হয়নি। তবে এও বুঝতে পারছি এই সাহেব (ডালকুত্তা) যদি না যায়, শীঘ্র যাবার বড় আশাও দেখিনে—তা হলে আমাকে অন্ততঃ ছাড়তেই হবে। শালা অন্য অফিসে application পর্য্যন্ত forward করে না। ঢের পাজি লোক দেখেছি, কিন্তু এমনটি শোনাও যায় না।

দেখি মিত্তিরমশাই কি লেখেন।

আমার 'ভারতবর্ষে' লেখার অনেক গোলমাল। সারদাবাবুকে জানি না—তিনি যে কি করবেন তিনিই জানেন। দ্বিজুবাবুই এই কাজ পারতেন—একি সারদাবাবুর দ্বারা হবে? ওঁর চেয়ে তোমার যোগ্যতা এতে বেশী। বিদ্যাপতি edit করা আর ভারতবর্ষ edit করা এক জিনিষ নয়। তা ছাড়া তার অনেক কাজ। এ selection

* রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে যে মণীন্দ্রকুমার মিত্র চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইনি তাঁহারই কেহ হইবেন।

একেবারেই ভাল হয়নি। সারদাবাবু সত্যরঞ্জন রায়ের 'অবগুণ্ঠিতা'র যে প্রশংসা করেছিলেন, তাতেই বোঝা গেছে উনি কি রসগ্রাহী। সত্যরঞ্জন এখানে ছিল, তার অনেক লেখাই পড়েছি। অবগুণ্ঠিতার চেয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ) 'অধঃপতন' ভাল।

Very bad selection—ভারতবর্ষ এক বৎসরের মধ্যে failure হবে।

এ যদি না হয়, মিথ্যাই এতদিন সাহিত্য সেবা করলাম।

দ্বিজুবাবুর মৃত্যুর পর রবিবাবু ছাড়া এত বড় কাগজ—এত বেশী আয়োজন, এত বেশী subscription—আর কেউ চালাতে পারবে না। হরিদাসবাবুর বোধ করি বন্ধ ক'রে দেওয়াই উচিত। এ কাগজ successful হবার হ'লে দ্বিজুবাবু অন্ততঃ ৬টা মাসও বাঁচতেন। এই আমার ধারণা। একে superstition বল আর যাই বল।

দ্বিজবাবু আবশ্যক হলে ও কাগজ প্রায় একাই ভরিয়ে দিতে পারতেন। প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে, কালিদাস ভবভূতির সমালোচনার মত সমালোচনায় যেমন ক'রে হোক আবশ্যক হ'লে চালিয়ে দিতে পারতেনই—এ কি আর কারো কাজ। তা ছাড়া কাগজ যে ছোট নয়—৬৲ টাকা চাঁদা—সেটাও বড় কম ভাবনার বস্তু নয়। প্রবাসী এতদিনের কাগজ—এতটা স্থায়িত্ব লাভ করেচে তবু তাকে অনুবাদ ক'রে, পাঁচটা খবরের কাগজের বাজে খবর তুলে ভরাতে হয়। ওর অর্দ্ধেকের ওপর ত অপাঠ্য। তবু ওর চাঁদা কম। তোমাদের সে excuseও নাই। তা ছাড়া, ভাই, অনেকেই বলে লিখবে, কিন্তু শেষকালে যারা নিতান্ত তোমার আমার মত লেখক তারাই লেখে। তা ছাড়া ভাল লেখক প্রায়ই লেখে না। দ্বিজুবাবুর সঙ্গে কি শুধু তিনিই গেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর অসাধারণ influence পর্য্যন্ত গেছে। এই ধর আমি। আর আমার সাহস নেই যে কিছু লিখে পাঠাই। অথচ দ্বিজুবাবু থাকলে তাঁর appreciation-এর লোভে লিখতাম। সারদাবাবুর ভাল মন্দ বলার দাম কি ? কে গ্রাহ্য করে ?—শরৎ।*

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

প্রমথনাথ—আজ তোমার পত্র পাইলাম। আজই একটা টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম আমার পূর্ব্ব পত্র রদ করিয়া, বোধ হয় পাইয়া ব্যাপারটা বুঝিয়াছ। তোমার কথাই সত্য। ঠিকানা ছিল S. Chatterjee, Asst. Acctt. General's post office. আমাদের বুদ্ধিমান asst. নগেন ভৌমিক আমার অবর্ত্তমানে V. P. P. গ্রহণ করিয়াছিল, আমি উপস্থিত থাকিলেও হয়ত লইতাম। সেইজন্যই দোষ আমার—তোমাদের নয়। তোমাদের দোষ নাই বলিয়াই টিকিটগুলো লইতে পারিলাম না—না হইলে তোমার মান রক্ষা করিয়া গ্রহণ করিতাম। Book Post পাই নাই এবং ভবিষ্যতে দিলেও পাইব না। ওসব আমার বাড়ির ঠিকানায় দিলেই পাই, অন্যথা পাই না।

S. Chatterjee. 14 Lower Pozoungdoung Street, Rangoon. এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার পত্রের একটা একটা করিয়া জবাব দিই। দুটি একটি প্রবন্ধ মন্দ হয় নাই। তাম্রশাসন, আমার মত বেরসিক লোকেই পড়ে। সার অসার কি আছে না আছে আমাদের জানা উচিত। 'কৌতূহল' ভাল।

১। Variety হিসাবে তোমার কথা হয়ত সত্য; কিন্তু variety মানে যদি ৩২॥০ ভাজা হয়, ত খেতে মন্দ লাগে না। তাতে বড়লোকের পেট ভরে, গরীবের ভরে না। Substantial জিনিস দুটোও ভাল, কিন্তু ৩২॥০ ভাজা ভাল নয়—আমি ওর পক্ষপাতী নই।

২। ছবির সম্বন্ধে—noted.

৩। নির্ভীক মতামত—ঠিক কথা। যত দিন ঐ রকমের দ্বিজবাবুর কাছাকাছি—ভাল মানুষ, সরল অথচ গোঁয়ার-গোছের লোক না পাও, ততদিন সমালোচনা বাহির না করাই বুদ্ধির কাজ। তবে, সাহিত্যের সমালোচনার মত সমালোচনা ভদ্রলোকের বাহির করা উচিত নয়। কেবল তীব্র ভাষা অথচ কেন তীব্র ভাষা তার কারণ দেখানো নাই। "তোমারটা ভাল নয়" "ওতে অনেক কথা বলার আছে" "এ রকম সবাই জানে" "এ রকম না লেখাই উচিত" এ সব সমালোচনা নয়। সমালোচনায় যেন তাহার চৈতন্য হয়, জ্ঞান হয়, শিক্ষা হয়। সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব, দাবাইয়া ধরিব, এ মতলব ভাল নয়। হাঁ কানকাটার সমালোচনার মত সমালোচনাই যথার্থ সমালোচনা। সবাই লিখতে পারে না তাও হয়ত সত্য। কিন্তু আমারও বড় অসংযত ভাষা হয়ে গেছে। ঐ যে তুমি লিখেছিলে সবাই আজকাল প্রত্নতত্ত্বের লেখক—তাতেই আমার রাগ এবং একটু দ্বেষ হয়েছিল। সবাই যদি এত সহজে লিখতে পারে, তবে

কেন মিছে আমরা এত খেটে মরছি? এই একটু রাগ—তাতেই কিছু অতিরিক্ত তীব্র হয়ে গেছে। তবে, তাঁরও জ্ঞান হবে যদি দয়া ক'রে পড়ে দেখেন—ভবিষ্যতে, আর অমন ওপর-চালাকি করতে ব্যস্ত হবেন না। সত্যিই এতে একটু solid পরিশ্রমের দরকার হয়।

৪। না, যমুনাতে একসঙ্গে অত বার হবে না। চন্দ্রনাথ* এখনো শেষ হয়নি। নারীর মূল্য ** এবার অসুস্থতার জন্য শেষ করিতে পারিনি। আলো-ছায়া কি আমার লেখা? তাইতেই মনে হয়েছিল বটে, কোন অপরিণত কাঁচা লেখক আমার লেখার style অনুকরণ করেছে। আমি গত পত্রে ঠিক এই কথা ফণীকে লিখেছি। বড অন্যায়! বড় অন্যায়! বিন্দুর ছেলে প'ড়ে দেখো! শুনলাম যমুনার ৩২ পাতা হয়েছে। আমার মনে হয়েছিল তোমাদের ভারতবর্ষে ওটা অশোভন হবে এবং ভালও হয় নি। তোমাদের ভাল লাগবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। একটুও প্রেমের কথা নেই, নিতান্তই বাঙালীর ঘরের কথা। অনেকটা মেয়েদের জন্য—তারা যেন একটু শিক্ষা লাভ করে—এই ইচ্ছায় লেখা। ঐ রামের সুমতির ধরণের তবে বেশী character আছে—তাহাদিগকে পরিস্ফুট করবার জন্যই একটু বেড়ে গেছে। যাক।

দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। সুরেনরা (মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) আমার সব লেখারই বস্তু তারিফ করে, তাদের ভাল বলার মূল্য আমার লেখা সম্বন্ধে নাই। ওটা ছাপা হয় তাও আমার ইচ্ছা নয়।

সত্যিই আজকাল কি গল্পই বার হয়! কেবল লোকের চেষ্টা কি ক'রে পাঠকের মনে কষ্ট দেয়! হয়, অমানুষিক অকৃতজ্ঞতা দেখিয়ে, না হয় খুনজখম করে—আরে বাবু রাস্তায় কুকুর ঠেঙ্গান দেখলেও ত কান্না পায়—সেইটাই কি তবে দেখাতে হবে? না সেটা সাহিত্য?

গল্প পারতপক্ষে tragedy করতে নেই। কুৎসিত ভাবগুলো দেখাতে নেই—ওসব সবাই জানে। দীনেন্দ্রবাবুর সাহিত্যে 'দাদা' পড়েছ? প'ড়ে বাস্তবিক অভক্তি হয়ে গেল। গল্প শেষ ক'রে যদি না পাঠকের মনে হয় 'আহা বেশ!' তবে আবার গল্প কি? আমি এই লাইনে চলছি। রামের সুমতি, পথনির্দ্দেশ, বিন্দুর ছেলে সব

* চন্দ্রনাথ ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ—আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় বাহির হয়।

** শ্রীঅনিলা দেবী এই ছদ্মনামে ১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ—আষাঢ় ও ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা 'যমুনা'য় প্রকাশিত হয়।

এই ছাঁচে ঢালা। শেষ করে একটা আনন্দ হয়—শেষ করে মনের মধ্যে gloomy ভাব আসে না। তোমাদের হরিদাসবাবুর মত যেন লোকে মন্তব্য প্রকাশ করে "রামের সুমতির নারায়ণীর মত একটি স্ত্রী পেতে ইচ্ছা করে"। এই সমালোচনাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। ভাল কথা—'ক্ষুদ্রের গৌরব' 'ছায়া' 'বিচার' ওসব কি? আমার ত একটুও মনে নেই।

তোমাদের সমাজপতির সম্বন্ধে ওসব কেচ্ছার ব্যাপারটা কি? তোমাদের ভারতবর্ষের জন্য আমি অভাজন কি করতে পারি ভাই? অত বড় বড় কৃতবিদ্য লোক রয়েছেন তার ওপরে আমি কি করব? তবে এক-আধটা প্রবন্ধ বা গল্প লিখে দিতে পারি; তাও সত্যি সত্যি ভয় হয় প্রমথ, হয়ত বা ফেরত আসবে। ঐ লজ্জাতেই আমার যেন হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। আচ্ছা বিন্দুর ছেলে প'ড়ে যদি এমন সাহস তুমি দাও যে ওটা তোমাদের ভারতবর্ষে পাঠালেও নিশ্চয় ছাপা হোতো, তা হলে নিজের ওজন বুঝে দেখবার চেষ্টা করব। এই কথা দিলাম। তবে আমি ভাই অশ্রদ্ধা করে, যা-তা লিখে দিতে পারব না। নিজের অন্ততঃ চলনসই মনে না হ'লে পাঠাইনে। তোমরা ফণীকে দেখতে গিয়েছিলে শুনে বড় সুখী হোলাম। এই ত বন্ধুর মত কাজ।

আমার কলিকাতা যাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে লিখেছি। তবে কি জানো ভাই 'সাহিত্য' অবলম্বন করতে আমার ভারী লজ্জা করে। ওটা যেন উঞ্ছবৃত্তির সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথাও একটা ৪০।৫০৲ টাকার চাকরি যোগাড় ক'রে দিতে পার ত যাই! আমার Govt. service ব'লে একটুও মায়া নাই। এ শালার অফিস রাস্তার কুলিগিরির অধম।

আমার ইচ্ছে করে, চাকরি ক'রে পেটের ভাতের যোগাড় ক'রে সাহিত্য সেবা করে যদি দু'পয়সা পাই ত বই কিনি। আমার বিস্তর বই পুড়ে যাবার পরে এই আকাঙ্ক্ষাটাই আমার বড় প্রবল।

আমার 'চরিত্রহীন' বোধ হয় modified হ'য়ে আশ্বিন কার্ত্তিক থেকে বেরুবে। ততদিনে চন্দ্রনাথ শেষ হবে।

হাঁ ভাল কথা। আমি কলিকাতা এবং আরো দু-এক জায়গা থেকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে মতামত পেয়েছি। সত্যি কেউ সন্তুষ্ট হয়নি। সকলেই লিখেছে—ওঁদের মধ্যে 'পছন্দ' ব'লে যে একটা জিনিস আছে তা নমুনা দেখে মনে হয় না। কিন্তু তাঁরা ত ভেতরের কথা জানেন না। দ্বিতীয় issue দেখে তাঁদের মত ফিরবে ব'লেই আশা করি। 'ভারতবর্ষে' প্রথমে বিপুল আয়োজন ক'রে, দ্বিজুবাবুর সম্পাদকতায় যার

হবে শুনে আমাকে অনেক সম্পাদকই লিখেছিলেন যে, "আমাদের সংহার করবার জন্য ভারতবর্ষের উদয় হচ্ছে।" তাদের শাপ-সম্পাতেই দ্বিজুদাদা মারা গেলেন— অত দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ তাঁর সইল না। এখন সম্পাদকেরাই খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। কি করবে কপাল! দ্বিজুদা একটা বছর বাঁচলেও ভারতবর্ষ অক্ষয় হয়ে যেত তা নিশ্চয়। এখন এর stability সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা হয়। পাছে লোকে ক্রমশঃ মনে করতে থাকে not worth paying Rs. 6, এই ভয়।

প্রমথ, আমিও একটা নাটক লিখব ব'লে ঠিক করেছি। যদি ভালো হয় (হবেই) কোন theatre-এ প্লে করিয়ে দিতে পার? আজ এই পর্য্যন্ত।—তোমার শরৎ।*

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon 17. 7. 13.

প্রমথ—তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুশী হইলাম। আগেকার পত্রে তোমার যেন একটা রাগের ভাবই আমার চোখে পড়িত, এবার দেখিতেছি সেটা গিয়াছে। তুমি শান্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইয়াছ। আমি মনে করিয়াছিলাম ভায়া আমার এবার ক্ষেপিয়া না গেলে বাঁচি। যাহোক ভালয় ভালয় যে সামলাইয়া গিয়াছ তাহা বড় সুখের কথা। আজ সুরেনকে দেবদাস পাঠাইবার জন্য চিঠি লিখিয়া দিলাম।

আচ্ছা আশ্বিনের জন্য আমি একটা গল্প দিব, নিশ্চিন্ত থাক। তবে, হয়ত একটু বড় হইবে। ২০।২৫ পাতার কম নয়। তবে, এমন গল্প এ বৎসর আর বাহির হয় নাই তেমনি করিয়া লিখিব। পূজার সংখ্যায় আমার জন্য ২০।২৫ পাতা ভারতবর্ষের খালি রাখিয়ো। তবে, tragedy লিখিব না। Tragedy ঢের লিখিয়াছি আর না। তা ছাড়া, ছেলে-ছোকরারা tragedy লিখুক, আমাদের এ বয়সে tragedy লেখা কালি কলমের অপব্যয়। আর ইংরাজির তর্জ্জমা করা লিলি-টিলি আমার আসে না। খাঁটি দিশি-দিশি জিনিস, একেবারে indigenous goods! চাই ত ব'লো। আর ইংরিজির ছাঁচে ঢালা তাও চাও ত লিখো। এ রকম ইংরিজি ধরণের গল্প লিখতে জানিনে যে তা নয়, তবে লজ্জা করে। যাক। সমালোচনা সম্বন্ধে যা

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

লিখেছ ঠিক তাই। সমাজপতির (সুরেশচন্দ্র সমাজপতির) মত স্পষ্টবাদীতার ভান করে গালিগালাজ করা সত্যিই ভাল নয়। তবে, তুমি যা বলছ গুণের কথাই বলব, দোষ দেখাব না এটাও ঠিক নয়। দোষ দেখাব, কিন্তু বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত। যেন সে নিজের দোষ দেখতে পায়। তা না ক'রে ঐ রকমের সমালোচনা—"অত্যন্ত কদর্য্য।" "কিছুই হয় নি" "পণ্ডশ্রম" "কালি কলমের অপব্যবহার" ইত্যাদিকে সমালোচনা বলে না। কোথায় দোষ করিয়াছি, কোথায় ভুল হইয়াছে যদি যথার্থ বলিয়া দিয়া লেখকের উপকার করিতে পার ত কর, না হইলে ও-রকম ওপর-চালাকিতে কাজ হয় না, শুধু শত্রু বাড়ে। পুস্তকের সমালোচনা এমন করিয়া করা উচিত, যেন সেই সমালোচনাটাই একটা সাহিত্যিক প্রবন্ধ হয়। যেন সেটাই একটা পড়বার জিনিস হয়।

তোমার চিঠিতে ফণীর অসুখের অবস্থা শুনে ভয় পেয়ে গেছি। সুরেনও ঠিক ঐ কথাই লিখেছে। বাস্তবিক ফণীর অসুখে যদি 'যমুনা' বন্ধ হয়ে যায় সে ত বড় দুর্ঘটনা। আমি ঐ কাগজখানিকে বড় করিবার জন্য যে কত আশা করিয়া আছি, তাহা আর কি বলিব যদি তাহার change-এ যাওয়াই উচিত হয় ত তাই পরামর্শ দাও না কেন? দুই-এক মাস ভাগলপুর কি মোজাফ্‌ফরপুরের মত জায়গায় গিয়ে থাকলে বোধ হয় দেহটা শুধরে যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কাজটা চালাবে কে? তবে তুমি যদি একটা কিছু উপায় ক'রে দাও ত হতে পারে বোধ হয়। বেচারী একা, অথচ, একটু কাগজের জন্য লোক রাখাও যায় না, সমস্তই একা করতে হয়, বড় মুস্কিল।

আমার চাকরির চেষ্টা কচ্চ শুনে খুশী হলাম। সাহিত্যচর্চ্চা করে পেট ভরে না ভাই। তা ছাড়া, ধর যদি এক মাস কিছু নাই লিখতে পারি, তা হলেই ত বিপদ। অত সংশয়ের পথে পা বাড়াতে ভাল বোধ হয় না। যাহোক মনে কচ্চি পূজোর পর দু-এক মাসের ছুটি নিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসব। সেই সময়ে মিত্তির মহাশয়ের সঙ্গেও দেখা করব। কিন্তু সেখানে চাকরি করতে আমি নারাজ। শুনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—মাইনে কম। কে ঐ কম মাইনের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটবে, আর তাতে সাহিত্যচর্চ্চাও বন্ধ হবে। সে আমি পারব না।

ভাল কথা। এবার 'সাহিত্যে' 'দাদা' বলে একটা গল্প পড়েছ? কি ভীষণ লেখা! সবাই জানে অকৃতজ্ঞতা বাজারে আছে, তাই ব'লে কি ঐ রকম ক'রে লেখে? ওতে কার কি উপকার হবে? সমস্তটা পড়ে একটা বিতৃষ্ণার ভাবই আসে, মন উঁচু হয় না। ওকে সাহিত্য বলা যায় না—ঐ গল্পই আবার সাহিত্যে বার হ'ল।

ওর চেয়ে তোমাদের আষাঢ়ের ঐ দর্পচূর্ণ গল্পটি ঢের ভাল। মনের মধ্যে শেষে একটা আহ্লাদ হয়, আমি ঠিক ঐ রকমই আজকাল ভালবাসি।

তোমার বায়স্কোপ দু-বার পড়েছি। অনেক জিনিস যা জানতাম না জানা গেল। আর ঐ যে ছোট পান্তুয়ার ইতিহাস প্রভৃতি ওগুলি সবচেয়ে ভাল। কত ছোটখাট দরকারী ঘরের কথা যে ওতে জানা যায় তা' বলে শেষ করা যায় না। ঐ রকম যেন প্রতি বারে থাকে।

আর না, মেল ক্লোজ হয় হয়—ভাল আছি।

—শরৎ

D. A. G.'s Office, Rangoon
22. 3. 12

প্রমথ—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি, এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে, তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এর বেশী জবাবদিহি করা বাহুল্য।

অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি। কেন না যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি ত করবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুদিয়া দিয়াছিলেন। আজ যদি আমি বুঝিতে পারিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম। তা হইবার নয়। আমাকে ইহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন, এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটাকাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতাম। এত কথা বলিতাম না যদি তুমি গত কথা না স্মরণ করাইয়া দিতে। আমি মরিয়া গিয়াছি—এই কথাটা যদি কোনো দিন কারো দেখা পাও—বলিয়ো।

তাই বলিয়া তুমি মনে যেন দুঃখ পাইয়ো না। তোমাকে আমি ভয় করি না। কেন না, তুমি বোধ হয় আমার বিচার করিবার গুরু ভার লইতে চাহিবে না। তাই তোমার কাছে আরো কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকিলেও ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে করি না। তুমি আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী। বিচারক হইয়া আমার মর্মান্তিক করিবে না এই আশাই তোমার কাছে করি।

আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ—তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাহিরের একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠের মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং দশ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও (শরৎচন্দ্রের একটি চায়ের দোকান ছিল) আছে। দিনগত পাপক্ষয়, কোনোমতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। কোনো মুহূর্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology and Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript—'নারীর ইতিহাস' প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম তা'ও গেছে। ইচ্ছা ছিল যা হৌক একটা এ বৎসর publish করিবে। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার শুরু করিব, এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল—সবই গেল।

তোমার ক্লাবের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম। কিরূপ হয় মাঝে মাঝে লিখিয়া জানাইও। নিজেও কিছু করা ভাল—হুজুগের মধ্যে এ কথাটা ভোলা উচিত নয়। তোমার যে রকম স্বভাব তাহাতে তুমি এতগুলি লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নয়।

আমাদের আগেকার 'সাহিত্য-সভা'র একটিমাত্র সভ্য 'নিরুপমা দেবী'ই সাহিত্যের চর্চ্চা রাখিয়াছেন—আর সকলেই ছাড়িয়াছে—এই না ?

আমার আগেকার কোন লেখা আমার কাছে নাই—কোথায় আছে, আছে কি না-আছে কিছুই জানি না—জানিতে ইচ্ছাও করি না।

আর একটা সংবাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর তিনেক আগে যখন Heart disease-এর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil painting শুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি।

(1) Novel, History, Painting.

কোন্‌টা ? কোনটা আবার শুরু করি বল ত ?*

তোমার স্নেহের শরৎ

---

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত। প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বাল্যবন্ধু। প্রমথবাবুর বন্ধু ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তদানীন্তন বিশিষ্ট ক্লাব 'ইভনিং ক্লাব' একটি মাসিক পত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত করিলে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় উহার ভার নেন এবং ক্লাবের সভাপতি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রমথবাবু ছিলেন ঐ ক্লাবের সম্পাদক এবং হরিদাসবাবু ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য। অনন্তর প্রমথবাবু রেঙ্গুন প্রবাসী শরৎচন্দ্রকে ভারতবর্ষে লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন প্রকাশের কথা হয়, কিন্তু তাহা লইয়া বহু বিতর্ক হইয়াছিল। 'সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি উহা ছাপিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষে পিছাইয়া যান। শেষে ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। এই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি একবার অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্র আবার উহা রচনা করিয়াছিলেন।

৪ এপ্রিল, ১৯১৩

প্রথম—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম, তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস—আমি এ-কথা অনেকদিন থেকেই ভাবি। আমি ত যোগ্য নই ভাই! আমার অনেক দোষ। তোমার সরল, স্নেহপূর্ণ বন্ধুত্ব আমাকে অনেক সময়ে সুখ দেয়—দুঃখ দিতেও ছাড়ে না। ভাবি আমার সম্বন্ধে এই লোকটা ইচ্ছা ক'রেই আত্মপ্রবঞ্চনা করছে—না সত্যি এত সরল সুহৃৎ আজকাল মেলে? তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই, এ কথা কেউ যদি না বিশ্বাস করে প্রথম তুমি করবেই। আমার অনেক দোষের সময়েও যখন বিশ্বাস করে এসেছো, তখন, এখন ত আমি ভাল ছেলের মধ্যেই। আজকাল প্রায়ই সত্য কথা বলি।

আমার অনেক কথা আছে। আমার 'কাশীনাথ'টা অতি ছেলেবেলার লেখা। যে সময়ে ওটা তোমার ভাল লাগত (মনে আছে বোধ হয় পাথুরেঘাটায়) আমারও ভাল লেগেছিল, লিখেওছিলাম। আজ তুমিও বড় হয়েছ, আমিও। তোমারও ভাল লাগেনি, আমারও অতি বিশ্রী লেগেছে। ধন্য সমাজপতি মহাশয় (সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)। এও প্রকাশ করেছেন।

অনিলা দেবী ও তার ভাই শরৎ অর্থাৎ শরৎ এবং অনিলা দেবী অর্থাৎ অনিলা দেবী এবং শরৎ 'যমুনা' কাগজে কথা দিয়ে নিজের হাত পা বেঁধেছেন। আমি অনেক অপরাধ অনেক গর্হিত কাজ আমার প্রথম বয়সে করেছি—আর করতে চাই নে ভাই। আমি কথা দিয়েছি—তুমি আমার বন্ধু—এতে প্রফুল্লমনে সম্মতি দাও। লোভের বশে বা তোমার মত বন্ধুর অনুরোধেও আর অসত্য সৃষ্টি না করি এই আশীর্ব্বাদ করে আমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভিক্ষা দাও। আমার মামারাও বিরূপ—তাঁদেরও অনেক অনুনয় করেছি। আমার লেখা (ছোট গল্পে যদিও তেমন মজবুত নই) ফাল্গুন থেকে যমুনায় বেরোচ্ছে এবং তোমার অনুমতি পেলে আরও কিছুকাল নিশ্চয়ই বেরোবে। আমার মত এবং গল্পের ধারা সম্বন্ধে বিচার করার জন্য দুই এক দিনের মধ্যেই যমুনা পাবে। যমুনা দেখে সমুদ্রের ধারণা তোমার না করতেও হয়ত হ'তে পারে। যমুনা দেখে যমুনার ধারণাই কোরো—তোমার স্বাধীন মত লিখে জানাইও। বৈশাখও প্রথম বৈশাখেই পাবে। তাতে নারীর মূল্য বলে ক্রমশঃ একটা প্রবন্ধ অনিলা দেবী লিখছেন। তার সম্বন্ধেও মত দেবে।

'চরিত্রহীন' তোমাকে পড়তে দিতে পারি (এই সময়ে শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' পুনরায় লিখিতেছিলেন) কিন্তু মুদ্রিত করবার জন্য নয়। এটা চরিত্রহীনের লেখা চরিত্রহীন—তোমাদের সুরুচির দলের মধ্যে গিয়ে হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়বে—তা

ছাড়া অত্যন্ত অশোভন দেখাবে। আমার সম্বন্ধে (অবশ্য আমার recent লেখা প্রভৃতি আলোচনার পরে) যদি ভাল opinion হয় এবং আমার লেখা চাও নিশ্চয়ই দেবো—কিন্তু এখন নয়। নিঃশব্দে গোপনে—ঢাক ঢোল পিটে ফটোগ্রাফ দিয়ে নয়। আমি এত অর্ব্বাচীন নই। আরও একটা কথা এই যে, চরিত্রহীন গল্প হিসাবে—তা সে প্রায় কিছুই নয়। অ্যানালিসিস্—Psychological—এই ইচ্ছা নিয়েই লিখি! সেটা পুড়ে যায়, তার পরে দুটো মিশিয়ে একরকম করে লিখেছি।

আজ ওই পর্য্যন্ত। বাড়ির খবর ভাল ত? আমার কথাটা বাড়ির মধ্যে একবার জানিয়ে দিয়ো। তোমার পিসিমাকে প্রণাম জানালাম।*

তোমার স্নেহের শরৎ

১৭ই এপ্রিল, ১৯১৩

রেঙ্গুন

প্রমথ—তোমার কাল পত্র পাইয়াছি, আজ জবাব দিতেছি। সময় নাই কাজের কথা বলি। বৈশাখের যমুনায় ইহারা বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে চরিত্রহীন শ্রাবণ হইতে তাহারাই বাহির করিবে। এ অবস্থায় আমার আর কি বলিবার আছে জানি না। কেন যে তুমি আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া হরিদাসবাবুকে এ প্রস্তাব করিয়াছিলে (প্রমথবাবুই চরিত্রহীন ছাপিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন) তাহা নিশ্চয়ই বুঝি। তুমি জানিতে অসাধ্য না হইলে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই থাকিতে পারে না। এখন এই বিভ্রাট যে কিরূপে উত্তীর্ণ হইব স্থির করা যথার্থই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যে আমার জন্য লজ্জা পাইবে, false position-এ পড়িবে, এইটাই আমাকে দ্বিধায় ফেলিয়াছে—না হইলে আমি কোন কথাই মনে করিতাম না। যমুনায় ছাপা উচিত কি না এ কথাই উঠিতে পারিত না। এখন তোমার সম্মান অসম্মানের কথা—এইটাই আসল কথা। জলধরবাবু প্রভৃতি নামজাদা লেখক—তাহাদের জোর

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

করিয়া পয়সার লোভে লেখা উপন্যাস অবশ্য ভাল হইতেই পারে না, কিন্তু তবু নাম আছে—সেগুলো ফিরাইয়া দিয়া ভাল কর নাই। অথচ আমারটা যে তোমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে এরই বা স্থির কি? যাই হোক তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীনে'র যতটা লিখিয়াছিলাম—(আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু আর কোনরূপ বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন—* কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে। তোমাদের জলধর সেন প্রভৃতির লেখাই বেশ হইবে, আমার এ সব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভার কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে। তবে, তোমার উপর আমার এই শপথ রহিল যদি বাস্তবিকই আর দ্বিতীয় উপায় না থাকে তা হলে আর কি বলিব, অন্যথা আমাকে ছাড়িয়া দিয়ো—'যমুনা'র কলেবরই ইহাতে বৃদ্ধি করিব। তার চেয়েও আর একটা বড় কথা আছে। তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ছাপার উপযুক্ত তা হলে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হলে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলের দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয়, এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) মত করবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না, উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে, একটা কথা বলি—শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়া চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethics-এর student—সত্য student. Ethics বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করিও না। যাই হোক পড়িয়া ফিরিয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো, তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়। রাঁড়ের বাড়ির গল্পও নয়। যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো

* ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কলিকাতা আসেন। তাহার সঙ্গে চরিত্রহীনের পাণ্ডু লিপিটি ছিল। সমাজপতি মহাশয় উহা পড়িবার জন্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে উহা প্রকাশ করিতে অসম্মত হন।

আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানাই—আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের 'যমুনা' কেমন লাগল ? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারবে কি ? শীঘ্র জবাব দিয়ো।—শরৎ*

মে ১৯১৩ (?)

প্রমথ—তুমি যতক্ষণ না আমার লেখা পড়, ততক্ষণ আমার লেখা যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এটা সম্ভবতঃ ছেলেবেলার অভ্যাস। এই জন্যই 'যমুনা' যাতে তোমার কাছে যায়, সে ব্যবস্থা আমাকে নিজেই করতে হয়েছে। আমার স্বভাব জানই ত। যারা আপনার লোক তারা যে আমাকে ঠিক জানতে পারে, অথচ, পরে আমার কিছুই না জানে এই যে আমার স্বাভাবিক ব্যাধি—এর অনুরোধেই তোমাকে 'যমুনা' পাঠানো এবং এর জন্যই তোমার কাছে 'চরিত্রহীন' পাঠালাম। আশা করি এত দিনে পেয়েছ। কি জানি আমার মনে একটা ভয় হয়েছে এই বইটা ভাল লাগবার সাহস তোমার নাই। Intellectually এ একেবারে নির্দ্দোষ না হলেও নেহাৎ নীচু নয়—কিন্তু 'রুচি'র কথা তুললে গোড়াটায় এর দোষ কিছু বেশী। অথচ সব বুঝেও আমি এর এক ছত্রও বাদ দিইনি—দিবও না। যাক এ কথা। তোমাকে পড়তে দিয়েছি তোমার honest opinion দিয়ে ফিরিয়ে দেবে আশা করি—অনুরোধ করি। তোমরা reject কর—আমার এই (ঈশ্বরের কাছে) আন্তরিক প্রার্থনা। কারণ তোমাকে তা হলে আর false position-এ পড়তে হবে না। সহজেই বলতে পারবে —এ পছন্দ হয় নি। একবার মনে করেছিলাম, প্রমথ, তোমাদের কাগজের জন্য কিছু ছোট গল্প সাধ্যমত ভাল ক'রে লিখব—কেন না, তুমি এ কাগজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু হঠাৎ সে আশাও ছাড়লাম। এর সঙ্গে যে চিঠি পাঠালাম (ফণীবাবুর যমুনা-সম্পাদকের) তা থেকেই সব বুঝবে—এবং হরিদাসবাবুর আপনার লোক যখন এর মধ্যে আমার নামে এত মিথ্যা আমারি বন্ধুদের কাছে বলেছে, তখন ভবিষ্যতে (যদি তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি) আরো যে কত মিথ্যা কুৎসা রটবে তা ত তুমিই বুঝতে পাচ্ছ। আমার নিন্দায় আমার চেয়ে তুমি নিজে বেশী কষ্ট পাবে তা' আমি

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

বেশ জানি, কিন্তু পাছে হরিদাসের প্রতি স্নেহ তোমাকে আমার দিকে অন্ধ ক'রে ফেলে তাই এত কথা লিখলাম—না হ'লে শুধু ফণীর চিঠিটা পাঠিয়েই তোমার সৎ বিবেচনার উপর বরাত দিয়েই চুপ করে থাকতাম। যা আমি সবচেয়ে ঘৃণা করি (বড় লোকের নির্লজ্জ খোসামোদ) তাই কি প্রকারান্তরে আমার ভাগ্যে ঘটবে, যদি তোমাদের সঙ্গে 'সাহিত্যিক' সম্বন্ধ রাখি ? তোমরা টাকা দেবে, তোমাদের influence ছোট সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রচুর—কিন্তু আমি ছোট সাহিত্যসেবীও নয় এবং টাকার কাঙালও নয়। অন্ততঃ আত্মসম্ভ্রম বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। একা তুমি এবং তোমার ভালবাসা ছাড়া আমাকে কিনতে পারে, এত টাকা তোমাদের কলকাতাতেও নেই, ত তোমাদের পাড়াটি ত ছোট। কি দুঃখ হয় বল ত ? হরিদাসবাবুর manager সু—তাকে আমিও চিনি—আমার সম্বন্ধে এত মিথ্যা রটাতে তার একটু সঙ্কোচ বোধও হল না ? তারা মনে করে আমি তাদের মত হীন, নীচ, ব্যবসাদার সাহিত্যসেবীর মুখ ভ্যাংচানি –না ? প্রমথ, বেশী গর্ব্ব করা ভাল নয়, আমি কি তা আমি জানি। আমি যে কোন কাগজকে আশ্রয় দিয়েই তাকে বড় করতে পারি—এ যদি তোমার মিথ্যা বলে মনে হয়, বেশী দিন নয়—একটা বৎসর দেখো—তার পরে বলবে শরৎ কেবল জাঁকই করে না। যাক এসব আমাদের আপোষের কথা, এ নিয়ে কারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—কিন্তু, যদি তোমার ওদের ওপর এতটুকুও influence থাকে আর যদি আমি তোমার শত্রু না হই, ত এ সব মিথ্যা যাতে আর না রটে তা করো ভাই। আমি ঝুড়ি ঝুড়ি লিখতেও পারিনে—লিখলেও ছাপাবার জন্যে ভদ্রলোককে চিঠি লিখে লিখে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলি নে। ফণী আমাকে কিছুতেই একটি কথাও মিথ্যা বলবে না, এ আমি নিশ্চয়ই জানি। তা ছাড়া, আমিও ঐ হতভাগা বা—কে জানি অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে শুনেছি। তাই এত দুঃখ হয়েছে যে, তোমাকেও এ সব রূঢ় কথা লিখতে বাধ্য হ'তে হ'ল।

প্রমথ, আমি 'যমুনা'কে ভালবাসি সে কথা তোমার অগোচরে নাই, তবুও পাছে তোমাকে অমর্য্যাদা করা হয়, এই ভয়েই তোমাকে 'চরিত্রহীন' পাঠিয়েছি। (তুমি ভাল-মন্দ কি বল, না-বল সেটাও আর একটা কথা) যদি একেবারেই না পাঠাই, তোমাদের দলের লোকের মনে হ'তে পারে, আমি তোমাকে ঠিক অত বেশী ভালবাসি না। কিন্তু ভাল যে বাসি এইটা সপ্রমাণ করবার জন্যই তোমাকে পাঠান। তুমি পড়বে এবং reject করবে। ক্ষতি নাই, তবু তোমার মান থাকবে এবং আমার ওপরে যে তোমার জোর আছে সেটাও জানা যাবে। তোমার চিঠি পেলে আমি ফণী পালকে লিখে দেব। সে তোমার কাছ থেকে ওটা নিয়ে আসবে।

আর একটা কথা বলি প্রমথ, টাকার গর্ব্বটাই তোমাদের দলের লোকের মনে যেন খুব বেশী না থাকে। টাকা সবাইকে কিনতে পারে না। একটু সৎ, একটু honest হওয়া চাই। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। এখন কাগজের অনুষ্ঠান-পত্র বার হ'ল না, এর মধ্যেই এত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা গ্লানি? তোমরা পরে যে কি করবে আমি তাই ভাবছি। সমাজের যাতে ভাল হয়, লোকে যাতে সৎ শিক্ষা পায়, মাসিক কাগজের সে একটা প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া চাই। অথচ, এমন তোমাদের manager যে—তার কথা বেশী তুলতেও রাগ হচ্ছে। টাকা খরচ ক'রে মাইনে দিয়ে কি এই লোক রাখে? এই সব নমুনা যাতে বেশী প্রশ্রয় না পায়, হরিদাসবাবুকে আমার সবিনয় অনুরোধ জানিয়ে বলবে। বলবে আমার পেশা চাকরি, তাতে—দুমুঠো খেতে পাই। আমি সন্ন্যাসী—আমার নামের ওপর টাকার ওপর আত্ম-সম্মানের চেয়ে বেশী লোভ নেই। তা ছাড়া, আমি ত হরিদাসবাবুর কোন অন্যায় করি নি যে, তাঁর 'ডান হাত' আমার 'ডান হাত'টা কাটবার চেষ্টা করে বেড়াবে। আমার অভিমান বড় কম নয়। কিছু কম হ'লে আর এমন নির্ব্বাসনে এত অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারতাম না।

যাই হোক—তুমি আমার বন্ধু। বন্ধু বললে যা মনে হয় তাই। তার এক তিল কম নয়। যা উচিত তুমি করবে।

'পথনির্দ্দেশ' পড়েছ? কেমন লাগল? কিছু মনে পড়ে ভাই—বহুদিনের একটা গোপন কথা? না পড়লেও ক্ষতি নেই—কিন্তু, কেমন লাগল—লিখো; শুনতে পাই এটা সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। (যদিও একটু শক্ত-গোছের এবং একটু মন দিয়ে পড়া দরকার)

আজ ক'দিন যেন একটু জরোভাব টের পাচ্ছি। জ্বর না হলে বাঁচি! তোমার ছেলে কেমন আছে? আশীর্ব্বাদ করি যেন শীঘ্র আরোগ্য হয়ে ওঠে.........

—শরৎ।*

প্রমথনাথ—আমার গত পত্রে আশা করি সব কথা জানিয়াছি। গল্পটা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গেল, তাহারও সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিয়াছি। একে ত এত বড়, তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তার পর তোমার অভয় পাইয়া পাঠাইলাম। গল্পটা একটু মন দিয়ে পড়িয়ো এবং immoral ইত্যাদি ছুতা করিয়া reject করিও না। তাও যদি কর, কাহাকে reejct করার কারণ দর্শাইয়ো না। আমার "চরিত্রহীন" তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে

---

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে "Charitrahin creating alarming sensation" আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্রঘরের মেয়ে যে-কোন কারণেই হৌক, বাসার ঝি-বৃত্তি করিতেছে—(character unquestionable নয়) আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্য্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না। অথচ রবিবাবুর 'চোখের বালি' ভদ্রঘরের বিধবা নিজের ঘরের মধ্যে এমন কি অনাত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে নষ্ট হইতেছে—কেহ কথাটি বলে নাই! (কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীকে মনে পড়ে?) 'মানসী'তে প্রভাতবাবু এক ভদ্র যুবার মুখে আর এক ভদ্র বিধবার সতীত্ব হরণের মতলব আঁটিতেছেন! সোনার হরিণ কত কি কীর্ত্তিই শুরু করিয়া দিয়াছে। (অবশ্য এটা বটতলার উপযুক্ত! Detective story ছাড়া তিনি কিছুই প্রায় লিখিতে পারেন না। 'ডাকাতে ঠান্‌দি'-গোছের বই। যেমন নবীন সন্ন্যাসীর 'গদাই পাল' আর সেই মাগীটা তেমনি এও)। কোন দোষ নাই, কেন না নাম 'রত্নদীপ' (এবং লেখক প্রভাতবাবু)!' আর আমার 'চরিত্রহীন' যত অপরাধে অপরাধী? যারা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ কিংবা জার্ম্মান নভেল পড়িয়াছে তাহারা অবশ্য বুঝিবে ইহা সত্যই immoral কিনা। কিন্তু তোমরাও ভুল বুঝিয়াছ বলিয়াই আমার যত দুঃখ। তোমাদের 'স্বরজ কওর' সম্বন্ধে কেহ কথাটি বলিল না। টলস্টয়ের Resurrection বেস্ট বই! যাই হৌক আমি এখনও স্বীকার করি না এবং বুঝি না বলিয়াই করি না যে 'চরিত্রহীনে' এক বর্ণও immorality আছে। কুরুচি থাকতে পারে, কিন্তু যা পাঁচজনে বলিতেছে তা নাই। তবুও নাম দিয়াছি 'চরিত্রহীন', এর মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী জাগাইয়া তুলিব অবশ্য এ আশা করিতেই পারি না। যাহার ইচ্ছা হয় পড়িবে, যাহার নামটা দেখিয়া ভয় হইবে, সে পড়িবে না। রত্নদীপ নাম দিয়া—বাড়ির কেচ্ছা শুরু করি নাই। যাই হৌক, তোমাকে আমি একটু ভয় করি বলিয়াই 'বিরাজ বৌ' সম্বন্ধে এইটুকু আবেদন করিলাম। এবং তোমার চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত আমার ভয় ঘুচিবে না, এ গল্পটা তোমাদের কাছে immoral বলিয়া মনে হইয়াছে কি না। যদি হয়, আর কাহাকেও না দেখাইয়া চুপি চুপি registered ফিরিয়া পাঠাইবে। কাহাকেও জানিতে দিবে না, তোমাকে কোন কিছু পাঠাইয়াছিলাম কি না। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তোমার বাড়িতে অনেকটা ভাল খবর পাইয়া খুব সুখী হইলাম। হাঁ change-এ পাঠাও! আমার যাওয়ার সম্বন্ধে—শরীর বেশ করিয়া না সারিলে এক পা নড়িব না। যেমন আছি, তেমনি থাকিলে X'mas নাগাদ দেখা যাইবে।

মূল্য শুরু করিয়াছি। 'ভগবানের মূল্য' 'বিধবার মূল্য' পূর্ণ তেজে অগ্রসর

হইতেছে। ভাল কথা তোমার সেই কানাকড়ির মূল্যের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম—আজ তাহাকে হঠাৎ পাইয়াছি। দুই-চারি দিনে তাহাকেও ঠিক ঠাক করিব।

আমার 'রামের সুমতি' প্রভৃতির কপি শীঘ্রই পাঠাইব। একটু ভাল করিয়া ছাপাইলে ভাল হয় - অবশ্য যা বুঝিবে তাই করিবে।

এইবার কাজে মন দিই—শরৎ*

Rangoon, 13. 3. 14.

প্রমথ—পরশু সন্ধ্যায় ফিরিয়াছি। রক্ত আমাশা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। বেশ রোগটি, না? তোমার কেমন? শুনলাম, আমি নাই, এই মর্ম্মে হরিদাসবাবুকে জানাইবার জন্য টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। বুদ্ধির কাজ করা হইয়াছিল। কিন্তু, তুমি বুদ্ধিমান হরিদাসবাবুকে সে সংবাদ দাও নি কেন? তা হ'লে তিনি ত আমার চিঠি না পাওয়ার দরুণ, লেখা না পাওয়ার দরুণ দুঃখ করতেন না। আজ ২০০৲ পেলাম। ভাল। ছোটগুলাও পাঠাচ্ছি। লোভে পড়েছি না কি, তাও আবার ভাবছি। শুনি সাহিত্যিকের মৃত্যু ইহাতেই ঘটে। হরিদাসবাবুকে বলিয়ো তিনটা ছোট গল্প যেন না ছাপান। এইবারের ছোট গল্পটা (সম্ভব ভালই হবে) এক ক'রে চারটা গল্প চতুষ্পদ নাম দিয়ে ছাপালে বেশ হবে, কি বল? বিরাজ বৌ লিখে অনেকটা জ্ঞান জন্মেছে। ভায়া, এবারে আর ফাঁদে পা শীগ্‌গির দিচ্ছি না। এমন ক'রে এবার থেকে আট ঘাট বেঁধে লিখব যেন, প্রভাতবাবুও দোষ খুঁজে না পান। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে—ঐগুলোর ত আর দোষ বার করা যায় না। 'হরিনাম' যেই করুক, লজ্জার খাতিরেও ভাল বলতে হবে। আমি 'হরিনাম' গাইব। দেখি

---

* প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

এতে কি হয়। বৈশাখের জন্য হরিদাসবাবুকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লো। আমি কথা দিচ্ছি। একটা বড় উপন্যাস 'গৃহদাহ' নাম দিয়ে খানিকটা লিখেছি—এতেও ঐ শিক্ষা কাজে লাগবে। ফাঁদে পা দেব না। 'বিরাজ বৌ' নিয়ে মানুষ ঐটুকু খুঁত পেয়েই হৈ চৈ ক'রে নিন্দে করবার সুযোগ পেলে—ও সুযোগ আর সাধ্যমত দিচ্ছি না।

কেমন আছ? ছেলে মেয়ে কেমন? গৃ—কেমন? ভায়া, পিসিমা—সব ভাল ত? সম্ভব 20th April Start ক'রব।—তোমার শরৎ।

কি খাটুনি বাপ্‌রে! রক্ত আমাশা হয়ে শাপে বর হয়েছে—আর যাচ্ছি না।*

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত।

গ্রন্থ-পরিচয়

শেষের পরিচয়

প্রথম প্রকাশ—একটি অসমাপ্ত উপন্যাস। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে—১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা; ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা; ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্ত্তিক ও ফাল্গুন সংখ্যা; এবং ১৩৪২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহে'র বর্ত্তমান সম্ভারে (১২শ সম্ভার) ভ্রমবশতঃ দেখান হইয়াছে যে, শরৎচন্দ্র ১৮শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী অংশ শ্রীমতী রাধারাণী দেবী লিখিয়া শেষ করেন। এই ত্রুটি মার্জ্জনীয়। প্রকৃত পক্ষে শরৎচন্দ্র ১৫শ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন—অর্থাৎ যেখানে "রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।" এই পর্য্যন্ত। ইহার পর হইতেই শ্রীমতী রাধারাণী দেবী রচনা করিয়াছিলেন।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—৭ই জুন, ১৯৩৯ খ্রীঃ (আষাঢ় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী-লিখিত অবশিষ্টাংশ সমেত।

ছবি

প্রথম প্রকাশ—গল্প-গ্রন্থ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী 'আগমনী'তে প্রকাশিত।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—মাঘ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (১৬ই জানুয়ারী ১৯২০ খ্রীঃ) অপর দুইটি গল্প 'বিলাসী' ও 'মামলার ফল' এর সহিত একত্র প্রকাশিত।

বছর-পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী

প্রথম প্রকাশ—গল্প-গ্রন্থ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্ত্তিক 'পাঠশালা' নামক ছেলেদের মাসিক পত্রিকায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (এপ্রিল ১৯৩৮খ্রীঃ) 'ছেলেবেলার গল্প' পুস্তকে অপর কয়েকটি গল্পের সহিত সন্নিবেশিত।

লালু

প্রথম ও পুস্তকাকারে প্রকাশ—'বছর-পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী'র সহিত প্রকাশিত 'ছেলেবেলার গল্প' পুস্তকের গল্প-সমষ্টির অন্যতম। 'লালু' কাহিনী তিনটি লালুর জীবনের তিনটি বিশেষ ঘটনায় রূপায়িত হয়েছে।

সমাপ্ত